বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

গুপ্তবিদ্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

সায়েম সোলায়মান



মাসুদ রানা

গুপ্তবিদ্যা

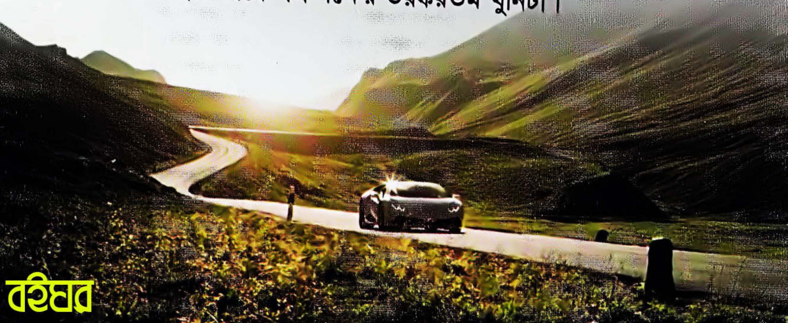
কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: সায়েম সোলায়মান

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের

করুণ আকুতি জানালেন ধনকুবের পিয়েরে উইনিং:
মরতে বসেছে তাঁর নাতনি, ব্যর্থ হয়েছে আধুনিক
চিকিৎসাবিজ্ঞান, এখন কেবল একটা মিথ...
অ্যালকেমির পুরনো এক পাণ্ডুলিপিই হয়তো পারে
মিনতিকে বাঁচাতে। চমকে গেল রানা মেয়েটির নাম শুনে!

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে রানা বুঝল, অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছে।
ওই পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ তো আছেই,
ঝামেলা হিসেবে সঙ্গে জুটে গেছে কানাডিয়ান এক একরোখা সুন্দরী।
কোনও এক গুপ্তসংঘও নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে
চায় ওটার সাহায্যে...যে-কোনও মূল্যে।
একাধিকবার মরণফাঁদ পাতল তারা রানা-সেলেনার জন্যে।
উপযুক্ত জবাব দিল রানাও।
কিন্তু ও জানত না, সব শেষ হয়ে গেছে ভেবে যখন
সতর্কতায় ঢিল দিয়েছে একটু, তখনই চুপিসারে
হাজির হয়ে যাবে শত্রুপক্ষের ভয়ঙ্করতম খুনিটা।



মাসুদ রানা ৪৫৭

গুপ্তবিদ্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

সায়েম সোলায়মান



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7457-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮

রচনা: বিদেশি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে কোলাজ
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-457
GUPTOBIDYA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Sayem Solaiman

একশ' একচল্লিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆

কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হাণ্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউণ্টি হাণ্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির ◆ কালো কুয়াশা ◆ ধর্মগুরু ◆ নরপশু ◆ দুরাত্মা ◆ টপ টেরর ◆ গুপ্তবিদ্যা।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

শুরু

মুষলধারার বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য হ্যাট টেনেটুনে ঠিক করলেন ফাদার লুকাস ম্যাকগিল, তুলে দিলেন কোটের কলার। ঝড়ো হাওয়ায় খুলে গেছে তাঁর হেন-হাউসের দরজা, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মুরগিগুলো, ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। হাতের লাঠিটা কাজে লাগিয়ে ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে জায়গামতো ঢোকানোর চেষ্টা করছেন ফাদার। কোনও মুরগি হারিয়ে গেল কি না জানার জন্য মনে মনে গুনছেন ওগুলো। বিড়বিড় করে বললেন, 'কী একখানা রাত!'

বিদ্যুৎ চমকে উঠল আকাশে। উদ্ভাসিত হলো হেন-হাউসের আশপাশের উঠান আর দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রত্যন্ত এক পল্লী। ফাদারের কটেজ-গার্ডেনের নিচু পাথুরে-দেয়ালের পেছনে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে দশম শতাব্দীর নিদর্শন সেইন্ট বারনাবাস চার্চ। সেটার পাশে মামুলি একটা কবরস্থান। ধসে পড়েছে বেশিরভাগ সমাধিফলক, আইভিলতার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে জায়গাটা।

আরও একবার চমকে উঠল বিদ্যুৎ, বাজ পড়ল দূরে কোথাও। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। ইতিমধ্যে সবগুলো মুরগি হেন-হাউসে ঢুকিয়ে ফেলেছেন ফাদার। দরজার হুড়কো তুলে দিয়ে ওটা শক্ত করে আটকে দিলেন তিনি। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে মুরগিগুলো।

ঘুরলেন ফাদার, কটেজের দিকে ছুট লাগানোর ইচ্ছে।

অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুচ্চমকে আরেকবার চিরে গেল আকাশ, অভাবনীয় কিছু একটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। দম আটকে যাওয়ার মতো অনুভূতি হলো তাঁর।

পাথুরে দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা আর কৃশকায় একটা ছায়ামূর্তি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফাদারের দিকে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই গায়েব হয়ে গেল লোকটা।

ভেজা হাত দিয়ে চোখ রগড়ালেন ফাদার। ভুল দেখেছেন নাকি?

আবার বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। ফেকাসে আলোয় ফাদার দেখতে পেলেন, ছুট লাগিয়েছে সেই ছায়ামূর্তি, দৌড়াচ্ছে অনতিদূরের জঙ্গলের দিকে।

'দাঁড়াও!' বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচালেন ফাদার।

তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছে, অপরিচিত ওই লোকের সাহায্য দরকার। মনে হচ্ছে, লোকটা সাহায্য পাওয়ার জন্যই এসেছিল তাঁর কাছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে পালাচ্ছে এখন।

ছুট লাগালেন ফাদার, বেরিয়ে এলেন কটেজ-হাউসের দরজা দিয়ে। তাঁর বয়স প্রায় সত্তর, এক পায়ে ব্যথা পেয়েছেন কিছুদিন আগে, তাই জোরে দৌড়াতে পারছেন না। বাড়ির পাশের সরু একটা গলি ধরে এগিয়ে চলেছেন জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলে ঢোকার মুখেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাঁকে। হাঁপাচ্ছেন।

কাঁটাগাছের কিছু ঝোপের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে লোকটা। উপুড় হয়ে আছে।

তার শরীরটা কাঁপছে মৃগীরোগীর মতো, খামচি দেয়ার

ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে আঙুলগুলো। শতচ্ছিন্ন পরনের কাপড়।

'ঈশ্বর!' করুণা জেগে উঠল ফাদারের মনে। কোট খুলে ফেললেন তিনি, ওটা জড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা রহস্যময় আগন্তুকের গায়ে। 'কী হয়েছে, বন্ধু? আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

জবাব পাওয়া গেল না আগন্তুকের কাছ থেকে।

বিড়বিড় করছে সে—মনে হলো, নিজের সঙ্গেই কথা বলছে। অথবা ফোঁপাচ্ছে। কাঁপছে ওর দুই কাঁধ।

এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকের গায়ে কোটটা বিছিয়ে দিলেন ফাদার। কোমল গলায় বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে, আমার বাড়িতে নিয়ে যাই তোমাকে। সেখানে আগুন আছে, খাবার আছে, বিছানা আছে। দরকার হলে একজন ডাক্তার ডেকে আনবো তোমার জন্য। ...হাঁটতে পারবে?' হাত বাড়িয়ে দুই কাঁধ ধরলেন লোকটার, চিৎ করার চেষ্টা করলেন লোকটাকে।

আরও একবার বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে।

আরও একবার চমকে উঠলেন ফাদার।

রক্তাক্ত হয়ে আছে আগন্তুকের ছিন্নভিন্ন শার্ট। দীর্ঘ ও গভীর কতগুলো জখম দেখা যাচ্ছে তার সারা শরীরে। দেখা যাচ্ছে শুকিয়ে আসা কিছু ক্ষতচিহ্নও। কোনও কোনও ক্ষতস্থান নতুনভাবে চিরে তৈরি করা হয়েছে নতুন ক্ষত।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ফাদার। যা দেখছেন তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। আগন্তুকের গায়ের ক্ষতচিহ্নগুলো নিছক চিহ্ন না, বরং বিশেষ কোনও নকশা অথবা বিশেষ কোনওকিছুর প্রতীক। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় ব্যাপারটা। রক্তে লাল হয়ে আছে প্রায় প্রতিটা নকশা আর প্রতীক।

'এই ভয়ঙ্কর কষ্টটা কে দিয়েছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার, তাকিয়ে আছেন আগন্তুকের মুখের দিকে।

ব্যথা অথবা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, কুঁচকে

রয়েছে আগন্তুকের চেহারা, পৈশাচিক লাগছে দেখতে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে।

আরেকদফা আশ্চর্য হওয়ার পালা ফাদারের। তাঁর সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলছে আগন্তুক!

'কী বললে?' বুঝতে পারেননি তিনি। 'পানি? পানি খেতে চাও?'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না আগন্তুক। তাকিয়ে আছে ফাদারের দিকে, হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরেছে তাঁর শার্টের হাতা। এখনও বিড়বিড় করছে।

ভ্রূ কোঁচকালেন ফাদার। পরিত্রাণ বা পাপমোচন নিয়ে কিছু বলছে আগন্তুক? মাথা নাড়লেন তিনি। নাহ্...বাজে বকছে লোকটা আসলে। খুব সম্ভব চিত্তবৈকল্য ঘটেছে তার।

আরও একবার বিদ্যুৎ চমকাল। আবার চমকে উঠলেন ফাদার—আলোর ঝলকানির কারণে নয়, বরং অপ্রত্যাশিত কিছু-একটা দেখতে পেয়েছেন রহস্যময় আগন্তুকের হাতে।

একহাতে একটা ছুরির বাঁট আঁকড়ে ধরে রেখেছে লোকটা।

ও-রকম ছুরি আগে কখনও দেখেননি ফাদার। জিনিসটা ক্রুশাকৃতির। কারুকার্যখচিত সোনার হাতলে ঝিকমিক করছে কিছু রত্নপাথর। দীর্ঘ আর সরু ফলার এখানে-সেখানে লেগে আছে রক্তের দাগ।

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন ফাদার, কী করেছে আগন্তুক। ছুরি দিয়ে নকশা কেটেছে নিজের শরীরের বিভিন্ন জায়গায়।

'এসব কী করেছ?' ঘাবড়ে গেছেন ফাদার।

তাঁর চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে আগন্তুক। আবারও বিদ্যুৎ চমকাল, উদ্ভাসিত হলো লোকটার কর্দমাক্ত চেহারা। শূন্য দৃষ্টি ফুটে আছে তার চোখে। যেন আত্মচিন্তায় হারিয়ে গেছে—শরীরটা এখানে আছে বটে, কিন্তু মন হারিয়ে গেছে দূরে কোথাও। শত্রুর বুকে ছুরি গেঁথে

দেয়ার কায়দায় বাঁটটা আঁকড়ে ধরল সে।

আরেকবার দম আটকে গেল ফাদারের। একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো তাঁর, আগন্তুক খুন করবে তাঁকে। ভয়ে পিছিয়ে গেলেন দুই কদম। 'ঈশ্বর,' বিড়বিড় করলেন, 'রক্ষা করো!'

পাগলাটে ওই আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতেধরা ছুরিটা খেপাটে দৃষ্টিতে দেখল একনজর, তারপর তাকাল ফাদারের দিকে। চাপা গলায় হেসে উঠল। অনুচ্চ কণ্ঠে কী যেন বলছে ল্যাটিন ভাষায়। জোর বাড়ল ওর গলার, একই কথা চেঁচিয়ে বলছে বার বার।

বড় বড় হয়ে গেছে ফাদারের চোখ, মৃত্যুভয় ভুলে গেছেন তিনি। এখন নিখাদ আতঙ্ক ভর করেছে তাঁর মনে।

ছুরিটা এবার নিজের গলায় আর ঘাড়ে চালাচ্ছে আগন্তুক।

এক

ঘুম ভেঙে গেল রানার।

আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনে রানা এজেন্সির দোতলায় ঘুমাচ্ছিল সুখে। বার দুয়েক চোখ পিটপিট করল সে, ডান হাতটা যন্ত্রচালিতের মতো চলে গেছে বালিশের নিচে। বাঁ হাত চলে এসেছে চোখের সামনে। হাতঘড়ির ওপর নজর বুলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল, কেন ভাঙল ঘুমটা।

বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা ল্যাণ্ডফোন বাজছে।

ঘুম-জড়ানো চোখে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতে গেল রানা। হাত লেগে উল্টে পড়ল টেলিফোনের পাশে-রাখা একটা গ্লাস, মেঝের সঙ্গে সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গেল। গ্লাসের তলানিতে থাকা তরলে ভিজে গেল কার্পেটের একাংশ।

মেজাজ বিগড়ে গেল রানার। আবার রিং হতেই লাফিয়ে উঠে বসল বিছানায়। গতরাতে পানের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। মাথাটা কেমন দপদপ করছে। থাবা মেরে তুলল রিসিভারটা। 'হ্যালো?'

নিজের কণ্ঠ নিজের কানেই কর্কশ শোনাল ওর।

'সরি, কিছু মনে করবেন না,' ও-প্রান্তের লোকটার কণ্ঠ মসৃণ, তার ইংরেজি উচ্চারণ চর্চিত। 'আমি কি ঠিক নম্বরে ফোন করেছি?'

'কাকে চাইছেন?'

'মিস্টার মাসুদ রানাকে।'

খুক করে কাশল রানা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছল চোখ-মুখ। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে দু'চোখ, জোর করে খুলে রাখল। 'বলছি।'

'মিস্টার রানা, আমার নাম অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো। আমি আসলে আপনাকে ফোন করেছি মিস্টার পিয়েরে উইনিং-এর হয়ে। আমাকে বলতে বলা হয়েছে, আপনার এজেন্সির সেবা নিতে চাইছেন মিস্টার উইনিং।'

'কোত্থেকে বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধরে নিন লণ্ডন।'

'আপনি আমাদের লণ্ডন শাখার সহায়তা নিতে পারেন। অফিসের নম্বরটা বলছি, লিখে নিন।'

'আমি বোধহয় বুঝিয়ে বলতে পারিনি। মিস্টার উইনিং যতটা না রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির সাহায্য চান, তারচেয়ে বেশি চান আপনার সাহায্য।'

'কেন?'

'কারণ তিনি জানেন, এজেন্সির যে-কোনও অফিসারের সঙ্গে আপনার পার্থক্যটা কী। ...আমি কি আপনার জন্য অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যবস্থা করতে পারি? যদি রাজি থাকেন, গাড়ি পাঠিয়ে আপনাকে তুলে নেয়া হবে। এবং এই কষ্টের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হবে আপনাকে।'

ঘুম চলে গেছে রানার। এটা কি কোনও ফাঁদ? পুরনো কোনও শত্রু মামুলি কায়দায় আটকাতে চাইছে ওকে? মনে হয় না। যদি কেউ ফাঁদে ফেলতে চাইত, আরও হাজারটা সহজ কৌশল অবলম্বন করতে পারত।

পিঠ খাড়া করল রানা। 'টাকাটা আসল কথা না। যে-কোনও ধরনের ইনভেস্টিগেশন করার জন্য এজেন্সি খুলেছি আমরা, বেতন দিয়ে যোগ্য লোক রেখেছি, তাই কোনও কাজের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হওয়াটা...'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সমস্যাটা যদি খুবই ব্যতিক্রমী

এবং গুরুতর না হতো, আপনাকে আমরা বিরক্ত করতাম না। এটাকে আপনি জীবন-মরণ সমস্যা বলতে পারেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে, একমাত্র আপনিই পারেন এই সমস্যার সমাধান করতে। ...কষ্ট করে হলেও অন্তত একবারের জন্য আসুন, প্লিয, কথা বলে যান মিস্টার উইনিং-এর সঙ্গে।'

কিছু বলল না রানা, দ্বিধা করছে।

'আমাদের ধারণা, মিস্টার উইনিং-এর সঙ্গে যখন কথা বলবেন আপনি, তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে রাজি না হয়ে পারবেন না।'

তবুও কিছু বলল না রানা।

রানার মৌনতা ওর সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিল অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো। 'ঠিক দু'ঘণ্টা পর একটা গাড়ি হাজির হবে আপনার ঠিকানায়।'

'আমার ঠিকানায়?'

'হ্যাঁ, মিস্টার রানা। আমরা আপনার এজেন্সিতে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি। আপনি কবে আসবেন লণ্ডনে, জেনে নিয়েছি। এমনকী আপনার ঠিকানাও জানা আছে আমাদের। ...গুডবাই।' লাইন কেটে দিল অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো।

রিসিভার কান থেকে নামিয়ে ওটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। ভাবছে, আমার ব্যাপারে আর কী-কী জেনে নিয়েছে ওরা?

লিমাযিনটা রানাকে পৌঁছে দিল এয়ারপোর্টে। একটা প্রাইভেট জেট অপেক্ষা করছিল সেখানে। ওটা রানাকে নিয়ে উড়াল দিল আইরিশ সাগরের ওপর দিয়ে। সোজা দক্ষিণ দিকে চলেছে। সাসেক্সের উপকূল কাছিয়ে আসছে। জেটের চাকাগুলো যখন এয়ারফিল্ডের রানওয়ে স্পর্শ করল, ঝাঁকুনি টের পেল রানা। শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারটার

অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করল। যে-কোনও জরুরি মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় আছে ওর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী।

কুচকুচে কালো আর ঝকঝকে মসৃণ আরেকটা লিমাযিন অপেক্ষা করছে এয়ারফিল্ডের বাইরে। অপেক্ষা করছে ধূসর স্যুট পরিহিত কয়েকজন বডিবিল্ডারও। গাড়ির পেছনদিকের একটা দরজা খুলে ধরল ওদের একজন রানার জন্য। লিমাযিনে উঠে বসল রানা। উঠে বসল ধূসর স্যুটওয়ালারাও।

এরা লণ্ডনের সেই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সঙ্গ দিচ্ছে রানাকে। এদের প্রত্যেকের নিখুঁতভাবে কামানো গাল, চেহারায় স্পষ্ট বেপরোয়া ছাপ আছে।

খেজুরে আলাপ কখনোই করে না রানা, আগ বাড়িয়ে কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও অভ্যাস নেই, তারপরও কাদের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে জানার জন্য আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছিল ওই লোকগুলোর সঙ্গে। চুপ থেকে ওরা প্রত্যেকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ঠোঁট সেলাই করে রাখার হুকুম আছে ওদের ওপর।

লিমাযিনটা রওনা হওয়ামাত্র ওটার রিয়ারভিউমিররে নজর বুলাল রানা।

একটা কালো জাগুয়ার পিছু নিয়েছে লিমাযিনের। অর্থাৎ বাকবিমুখ এই লোকগুলোর আরও সঙ্গী আছে।

আতঙ্কিত হওয়ার কিছু আছে কি?

এই লোকগুলো রানার সঙ্গে কথা বলছে না, কিন্তু দেখা হওয়ার পর থেকে সামান্য দুর্ব্যবহারও করেনি। পাথরের মূর্তি সেজে থাকার চেষ্টা করছে তারা, অথচ ওদের হাবভাব দেখে নিজেকে বন্দি বলে মনে হচ্ছে না রানার। বরং পিয়েরে উইনিং-এর অভিসন্ধি কী হতে পারে, ভাবছে। কী এমন ব্যতিক্রমী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে লোকটার যে, রানাকে ছাড়া চলছে না?

দুধসাদা চামড়া দিয়ে মোড়ানো হয়েছে লিমাযিনের

ব্যাকসিট আর ইন্টেরিয়র। ককটেইল কেবিনেট আছে। ওটা খুলল রানা। এক রাউণ্ড উইস্কি বানিয়ে নিল নিজের জন্য, বরফ মেশাল ড্রিঙ্কে। রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকাল আবার। ওদিকেই তাকিয়ে আছে ড্রাইভারের-পাশের-সিটে-বসা এক প্রস্তরমানব, একদৃষ্টে দেখছে রানাকে।

তারিয়ে তারিয়ে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে রানা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কোন্ পথে কোথায় চলেছে, মনে রাখার চেষ্টা করছে। একের পর এক রোড-সাইন ছাড়িয়ে আসছে ওরা। দক্ষিণ সাসেক্সের এই কান্ট্রি-রোডকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে পাথুরে ডিভাইডার। খাঁ-খাঁ করছে পুরো রাস্তা, তাই লিমাযিনের স্পিডোমিটারের কাঁটা আশি-পঁচাশির ঘর ছুঁয়েছে। দূর থেকে দেখা গেল একটা গ্রাম, কিন্তু ওটার ওপর নজর বুলানোর সময় পেল না রানা—সাঁই করে উধাও হয়ে গেল। লাকড়ি-বোঝাই একটা ট্রাকও দেখা দিয়ে গায়েব হয়ে গেল চোখের পলকে।

টানা চল্লিশ মিনিটের পঙ্খিরাজ-যাত্রার পর সুনসান এক কান্ট্রি লেনে হাজির হলো লিমাযিন আর জাগুয়ার।

উঁচু একটা পাথরের দেয়ালের সঙ্গে আর্চওয়ে দেখা যাচ্ছে। সেটার নিচে লোহার অটোমেটিক দরজা। খুলে গেল ওটা, গাড়ি দুটো ভেতরে ঢোকার পর বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি। সর্পিলাকার পথ ধরে এখন ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে লিমাযিন। দু'পাশে দেখা যাচ্ছে কিছু এস্টেট-কটেজ। একধারে সাদা-রঙের তক্তা দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছে আধ-একরের মতো জায়গা, সেখানে ছোটাছুটি করছে তাগড়া একপাল ঘোড়া।

রিয়ারভিউমিররের দিকে তৃতীয়বার তাকাল রানা। কখন যেন গায়েব হয়ে গেছে জাগুয়ারটা।

পথের দু'ধারে এখন সুদৃশ্য বাগান। কাছিয়ে আসছে সাইপ্রেস গাছের একটা বিস্তৃত বীথি। ওটা ছাড়ানোমাত্র দেখা

গেল একটা জর্জিয়ান ম্যানশন হাউস। ক্ল্যাসিকাল ধাঁচের কয়েকটা কলাম দেখা যাচ্ছে, পাথরে-বানানো কয়েক ধাপ সিঁড়িও আছে।

জীবিকার জন্য পিয়েরে উইনিং ঠিক কী করেন, ভাবছে রানা। সন্দেহ নেই, লোকটা পয়সাওয়ালা। এই পুরো এস্টেটের দাম কম করেও হবে দশ মিলিয়ন পাউণ্ড। ওই লোকের খুব ঘনিষ্ঠ কাউকে কি কিডন্যাপ করা হয়েছে? শেষ-উপায় হিসেবে বেছে নিতে চাইছেন রানাকে, কারণ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না?

জাঁকালো একটা ফোয়ারাকে পাশ কাটাল লিমাযিন, থামল পাথরের ওই ধাপগুলোর কাছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল একটা লোক, নেমে এগিয়ে এল। ধূসর স্যুট-পরিহিত পাথরমানবরা ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে, দু'দিকের খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গেছে সুশৃঙ্খলভাবে।

নামল রানা। ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেকের জন্য ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা লোকটা। 'আমি অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো, ফোনে কথা বলেছি আপনার সঙ্গে। মিস্টার উইনিং-এর পিএ হিসেবে কাজ করছি।'

কিছু না-বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। ক্যাটেলোকে দেখছে।

লোকটার বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। পাতলা হয়ে এসেছে চুল, কোনও কোনও জায়গায় ধূসর ছাপ লেগেছে। ছাই রঙা প্যাণ্ট, সাদা শার্ট আর নেভি ব্লু ব্লেযার পরে আছে। ওকে দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে কলেজের কোনও ল্যাব-ডেমোন্সট্রেটরের কথা।

'আপনি এসেছেন...খুব খুশি হয়েছি,' বলছে ক্যাটেলো। 'ওপরতলায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন মিস্টার উইনিং। চলুন।'

একটা এণ্ট্র্যান্স হল ধরে এগিয়ে চলল ওরা। হলের

মেঝেটা মার্বেল পাথরে তৈরি। এ-রকম ম্যানশনের এণ্ট্র্যান্স হল সাধারণত সরু হয়, কিন্তু এই হল এত চওড়া যে, ছোটখাটো একটা এয়ারক্র্যাফট এঁটে যাবে অনায়াসে। অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে চওড়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপর কাঠের প্যানেলিং-করা করিডোর। দামি পেইন্টিং ঝুলছে দেয়ালে-দেয়ালে, কাচের কয়েকটা ডিসপ্লে কেবিনেটও আছে।

প্রাথমিক সম্ভাষণের পর ক্যাটেলোর মুখে আর কোনও কথা নেই। করিডোর ধরে হেঁটে একটা বন্ধ দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল সে। টোকা দিল দরজায়।

'ভেতরে এসো।'

চমৎকারভাবে সাজানো একটা স্টাডিরুমে ঢুকল রানা।

ঘরের দু'দিকে দুটো বড় জানালা আছে, দামি ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে দুটোতেই, তবে সরিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো, রোদ খেলা করছে সারা ঘরে। ফার্নিচার পলিশের গন্ধ যেন স্থির হয়ে আছে ঘরের বাতাসে।

চওড়া একটা ডেস্কের একধারে বসে ছিলেন একজন লোক, রানাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বেশ লম্বা, হালকাপাতলা। পরনে কালচে স্যুট। বয়স অনেক। চাঁদি প্রায় খালি হয়ে গেছে, শুধু কয়েকগাছি উসখুসু চুল লেপ্টে আছে কাছাকাছি।

লোকটার বয়স অনুমান করার চেষ্টা করল রানা। আশির কাছাকাছি হবে। তারপরও পিঠ খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এবং তাঁকে দেখতে যথেষ্ট শক্তসমর্থ মনে হচ্ছে।

রানার পরিচয় জানিয়ে বিদায় নিল ক্যাটেলো, বেরিয়ে যাওয়ার সময় আটকে দিল ভারী দরজাটা।

রানার দিকে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ, ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধূসর দুই চোখে গভীর, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'মিস্টার রানা, আমি পিয়েরে উইনিং। কষ্ট

করে এতদূর আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে আসলেই কষ্ট দিয়েছি।'

উইনিং-এর সঙ্গে হাত মেলাল রানা।

'প্লিয, বসুন,' বলছেন উইনিং। 'ড্রিঙ্ক নেবেন?' কাছেই একটা কেবিনেট আছে, ওটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তুলে নিলেন স্ফটিকের একটা বোতল। দুটো আলাদা গ্লাসে দুই রাউণ্ড স্কচ-সোডা বানালেন।

যে-চেয়ারে বসে ছিলেন উইনিং, সেটার মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে ইতিমধ্যে বসে পড়েছে রানা। ওর হাতে স্কচ-সোডার একটা গ্লাস ধরিয়ে দিলেন উইনিং।

রানা খেয়াল করল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছেন বৃদ্ধ।

আগের জায়গায় বসে পড়লেন উইনিং। 'সরাসরি কাজের কথায় চলে যেতে পারি?'

'সেটাই ভালো।'

চেয়ারে হেলান দিলেন উইনিং। মন্তব্যের সুরে বললেন, 'আপনার একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরে সেটার শাখা আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন উইনিং, কী যেন ভাবছেন। যা বলবেন তা মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছেন সম্ভবত। 'আমার কোনওকিছু খোয়া যায়নি। আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়নি। আমার ঘনিষ্ঠজনদের কাউকে কিডন্যাপ করা হয়নি। এমনকী, পুলিশ মীমাংসা করতে পারেনি এমন কোনও রহস্যের ব্যাপারেও সাহায্য চাইছি না আমি আপনার কাছে।'

অপেক্ষা করছে রানা।

'আমি চাই, আমার হয়ে বিশেষ একটা লোককে খুঁজে বের করবেন আপনি, মিস্টার রানা। আপনার মতো একজন স্পেশালিস্টের জন্য আমার পক্ষ থেকে এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট।'

‘আপনার কেন ধারণা হলো কাজটা পারবো আমি?’

‘আমরা আপনার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। যা তথ্য পেয়েছি, তা খুবই সন্তোষজনক।’

‘আপনি কাকে খুঁজছেন?’

‘লোকটার নাম হেনরিখ প্যানাসেলসাস। নামটা কি পরিচিত মনে হচ্ছে আপনার কাছে?’

‘না। তাঁর পরিচয় জানতে পারি? তাঁকে কেন খুঁজছেন? তিনি যদি আপনার পরিচিত কেউ হন এবং হারিয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে কেসটা পুলিশের।’

‘কেসটা পুলিশের হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম না, মিস্টার রানা। এবং হেনরিখ প্যানাসেলসাসকে খুঁজে বের করে তাঁর কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যও নেই আমার। বরং আমার বিশেষ একটা প্রয়োজনে যত জলদি সম্ভব খুঁজে বের করা দরকার তাঁকে।’

‘শেষ কবে এবং কোথায় দেখা গেছে প্যানাসেলসাসকে?’

‘অনেকদিন আগে, প্যারিসে...যতদূর জানি আমি।’

‘অনেকদিন মানে? দুই বছর?’

‘না, আরও বেশি।’

‘পাঁচ? দশ?’

রানার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উইনিং। কিছুক্ষণ পর বললেন, ‘প্যানাসেলসাসকে শেষ দেখা গেছে উনিশ শ’ ছাব্বিশ সালে।’

এবার তাকিয়ে থাকার পালা রানার।

চট করে একটা হিসেব কষে ফেলল ও মনে মনে। উনিশ শ’ ছাব্বিশ মানে আজ থেকে নব্বই বছরেরও বেশি আগে...

একটুখানি হাসি দেখা দিয়েছে উইনিং-এর ঠোঁটের কোনায়। ‘যে-সময়ের কথা বলেছি, তখন প্যানাসেলসাসের বয়স ছিল আশির ঘরে। মনে করুন আমার মতো। একদিন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যান তিনি।’

চোখ সরু করল রানা। 'আপনি কি কৌতুক করার জন্য ডেকে এনেছেন আমাকে?'

'আমার আয়োজন দেখে আপনার কী করে মনে হলো, ঠাট্টা করছি? ঠাট্টা করার মতো বয়স বা পরিস্থিতি কোনওটাই নেই আমার। আবারও বলছি, আমি চাই, আমার হয়ে হেনরিখ প্যানাসেলসাসকে খুঁজে বের করবেন আপনি।'

'আপনি চাওয়ামাত্র কাজটা করে দেবো আমি—এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া, আজ থেকে নব্বই বছর আগে যে-লোকের বয়স ছিল আশি, আজ তাঁর বয়স হওয়ার কথা এক শ' সত্তর। মৃত কোনও লোককে খুঁজে বের করার মতো অতিলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই, মিস্টার উইনিং। আপনি বরং কোনও প্যারাসাইকোলজি ইন্সটিটিউটে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।' উঠে দাঁড়াল রানা।

রাগ করলেন না উইনিং, বরং আবারও একচিলতে হাসলেন। 'প্লিয বসুন, মিস্টার রানা। আমি জানি, আপনি খুবই বাস্তববাদী একজন মানুষ।'

ভদ্রতার খাতিরে বসল রানা, কিন্তু বিরক্তি বোধ করছে। এখানে আসাটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না ওর কাছে।

'আমার পুরো কথা যদি শোনেন, মিস্টার রানা, হয়তো আমার মতো আপনিও বিশ্বাস করবেন, আজও বেঁচে আছেন প্যানাসেলসাস। আসলে...আমি আমার প্রয়োজনের কথাটা ঠিকমতো বলতে পারিনি আপনাকে, তাই আপনি বিরক্ত হয়েছেন। ...প্যানাসেলসাসকে যতটা প্রয়োজন আমার, তারচেয়ে বেশি দরকার তাঁর বিশেষ একটা জিনিস। মানে, বিশেষ একটা তথ্য।'

'যেমন?'

'একটা ডকুমেন্ট ছিল হেনরিখের, পাণ্ডুলিপি বললে মানায় বেশি। ওটা খুবই মূল্যবান...আমি চাই, ওই পাণ্ডুলিপি খুঁজে

বের করবেন আপনি, তারপর নিয়ে আসবেন আমার কাছে।'

'কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। আপনার পিএ অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো বলেছেন, আপনি নাকি জীবন-মরণ সমস্যায় পড়েছেন। কিন্তু একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে...'

'ঠিকই বলেছে সে।'

'মানে?'

'আমার একটা নাতনি আছে। ওর নাম মিনতি।'

বুকের ভেতরে হালকা একটা ধাক্কা অনুভব করল রানা।

মনে পড়ে যাচ্ছে জেনেটিক্স বিজ্ঞানী ডক্টর আহসান মোবারককে। মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর বড় মেয়ে মোনার করুণ মৃত্যুর কথা। মনে পড়ে যাচ্ছে, মিনতিকে বলা ওর শেষ কথা, "তোমার আপু চেয়েছিল তুমি ভালো থাকো।"

মনে পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ সেই ওষুধ ইনজেক্ট করেও শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায়নি মিনতিকে। অথচ রানা ভেবেছিল, বেঁচে গেল বুঝি মেয়েটা।

'আপনার মাতৃভূমি,' বলছেন উইনিং, 'অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে একটা ছেলে পড়তে এসেছিল আমাদের দেশে। ছেলেটা...যদি কিছু মনে না করেন...ছিল যেমন গরিব তেমনই নির্বোধ। কোনওদিক দিয়েই আমার মেয়ের যোগ্য ছিল না সে। তারপরও...কপালের লিখন...কিছুই করার নেই কারও; ওরা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলে। যা-হোক, বিয়ের পর একটা মেয়ে হয় ওদের, ওর নাম মিনতি রাখে ওর বাবা।' দুঃখের হাসি দেখা দিয়েছে তাঁর ঠোঁটের কোনায়। 'কাহিনী কি এখন কিছুটা ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আপনার কাছে?'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না রানা।

'মিনতির বয়স যখন তিন, তখন একদিন ওকে আমার কাছে রেখে লং ড্রাইভে গেল ওর বাবা-মা।' চেহারায় মেঘ

জমেছে মিস্টার উইনিং-এর। 'সে-রাতের কথা কোনওদিন ভুলবো না। কেন যেন কু-ডাক দিচ্ছিল আমার মনের ভেতরে, অন্তত সে-রাতে কোথাও যেতে নিষেধ করছিলাম আমার মেয়েকে। কিন্তু জেদি মেয়েটা আমার কথা শুনল না, বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য জামাইকে নিয়ে চলে গেল লং ড্রাইভে।' মাথা নিচু করলেন তিনি। 'আর কখনও ফিরে এল না ওরা। রুট এইটি টু'র পাশের এক খাদে ওদের দোমড়ানো-মোচড়ানো গাড়িটা খুঁজে পেয়ে আমাকে ফোন করে পুলিশ। মেয়ে আর মেয়েজামাইকে শনাক্ত করার কাজটা আমাকেই করতে হয়েছে, মিস্টার রানা।' মুখ তুললেন তিনি, ছলছল করছে চোখ।

'দুঃখিত।'

'লোকে আমার সম্পত্তি আর টাকাপয়সা দেখে শুধু, ভাগ্য যে আমার সঙ্গে কত বড় প্রতারণাটা করেছে, তা দেখে না। যা-হোক, একমাত্র সন্তান হারানোর কষ্ট যদি বয়ে বেড়াতে হতো আমাকে বাকি জীবন, অতটা খারাপ লাগত না—মিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে কাজটা করতে পারতাম। কিন্তু ইদানীং আর তাকানো যায় না ওর দিকে।'

'কেন?'

'এখন ওর বয়স নয়...আমার আশঙ্কা, জীবনের দশম জন্মদিন পালন করতে পারবে না ও। মস্তিষ্কের দুরারোগ্য একটা অসুখে আক্রান্ত হয়েছে বেচারি। কী না করেছি আমি ওর জন্যে! দেশি-বিদেশি নামীদামি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। তাঁদের সবাই জবাব দিয়ে দিয়েছেন। দিন দিন আমার চোখের সামনে অসুস্থ থেকে আরও-অসুস্থ হচ্ছে মেয়েটা। আমার চোখের সামনে একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছে ওর আয়ু। অথচ নানা হয়ে, এত টাকাপয়সার মালিক হয়ে কিছুই করতে পারছি না আমি ওর জন্য...'

কাঁপা কাঁপা হাতে ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুললেন উইনিং,

সোনার ফ্রেমে বাঁধাই-করা একটা ফটোগ্রাফ বের করলেন। দেখালেন রানাকে।

কালো চুলের এক খুকিকে দেখা যাচ্ছে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ওই মেয়ের বাবা অথবা মা'র যে-কোনও একজন দক্ষিণ এশীয়। দুই পা দু'দিকে ঝুলিয়ে একটা পনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছে মেয়েটা, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওর বুকের ভেতরে কোথাও হু-হু করে উঠল আরেক মিনতির কথা মনে পড়ে।

'বলা বাহুল্য,' রানার দিকে তাকিয়ে আছেন উইনিং, 'এই ফটো যখন তোলা হয়েছিল, তখন মিনতির বয়স আরও কম। অসুখটা তখনও ধরা পড়েনি। অথচ এখন...লণ্ডনের একটা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সে।'

'শুনে খারাপ লাগল। কিন্তু...আমি এখনও বুঝতে পারিনি মিনতির সঙ্গে প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির সম্পর্ক কী।'

সামনের দিকে ঝুঁকলেন উইনিং। 'প্রাচীন এক বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন প্যানাসেলসাস। তাঁর সেই পাণ্ডুলিপি যদি উদ্ধার করা যায়, আশা করছি, সে-বিদ্যা কাজে লাগিয়ে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো মিনতিকে।'

'প্রাচীন বিদ্যা?'

মাথা ঝাঁকালেন উইনিং। 'প্যানাসেলসাস একজন বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট ছিলেন।'

চুপ করে থাকল রানা। কোথাকার জল কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে, বুঝবার চেষ্টা করছে।

ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উইনিং।

কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, জীবন রক্ষাকারী কোনও একটা ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন প্যানাসেলসাস? যে-ওষুধ, যে-কোনও প্রাণঘাতী অসুখের বিরুদ্ধে কার্যকরী?'

মাথা ঝাঁকালেন উইনিং। 'আমার জানায় যদি ভুল না-হয়, অনেকটা তা-ই। অ্যালকেমির ভাষায় ওই ওষুধকে বলা হয় অমৃতসুধা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'মিস্টার উইনিং, আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। আপনার জন্য খারাপও লাগছে আমার। এবং এ-ও স্বীকার করছি, আপনি যেমনটা বলছেন সে-রকম কোনও মহৌষধ থাকতে পারে। তারপরও...আজ বাদে কাল যখন মঙ্গল গ্রহে বাড়ি বানাতে যাচ্ছে মানুষ, তখন অ্যালকেমি নিয়ে আলোচনা করা আর লোকের হাসির পাত্রে পরিণত হওয়া সমান কথা। আপনার উচিত, প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপির বদলে বিশ্ববিখ্যাত কোনও নিউরোলজিস্টের খোঁজ করা।'

মাথা নাড়লেন উইনিং। 'আপনাকে বোঝাতে পারিনি আমি। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল, ইতিমধ্যে তার সব করে ফেলেছি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করেছি আমার নাতনির জন্য। কিছুই হয়নি।'

চুপ করে আছে রানা। তর্ক করতে ইচ্ছা করছে না ওর।

'মিস্টার রানা, আপনি হয়তো আমাকে নির্বোধ ভাবছেন। তবু আবারও বলছি, সম্ভাব্য সব উপায়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি বলেই সাহায্য চাইছি আপনার কাছে। আমি এখন অনন্যোপায়। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে যা রূপকথা, শেষ উপায় হিসেবে সেটাই হস্তগত করতে চাইছি।'

তবুও কিছু বলল না রানা।

'আমার নাতনির মুখের দিকে চেয়ে সাহায্য করুন আমাকে। ভেবে দেখুন, আপনি যদি ওই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে না-ও পারেন, হারানোর কিছু নেই আপনার। কিন্তু মিনতিকে যদি হারাই আমি, তা হলে সবই হারিয়ে যাবে আমার। একটাবার ভেবে দেখুন, প্লিয।'

দ্বিধা করছে রানা।

'আপনার কোনও পরিবার নেই, সন্তান নেই। আজ যদি আমার জায়গায় থাকতেন, একমাত্র উত্তরাধিকারীকে চোখের সামনে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখলে বুঝতেন, কত খারাপ লাগে। এটা সহ্য করা যায় না, মিস্টার রানা। তাই বিজ্ঞানের পক্ষে যা সম্ভব নয়, তা করার জন্য মিথের সাহায্য নিতে চাইছি।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না রানা।

ওর দিকে তাকিয়ে আছেন উইনিং, দৃষ্টিতে নির্ভেজাল আকুতি। 'পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করুন, মিস্টার রানা। আমার বিশ্বাস, একমাত্র আপনিই পারবেন কাজটা করতে। এক মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং দেবো আমি আপনাকে। অর্ধেক টাকা পাবেন অগ্রিম হিসেবে। আমার হাতে পাণ্ডুলিপিটা তুলে দেয়ার পর পাবেন বাকি টাকা।' ড্রয়ার থেকে চেকবই বের করলেন তিনি, একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে টাকার অঙ্ক লিখলেন। সই করে ওটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে।

চেকটা হাতে নিল রানা। অগ্রিম হিসেবে ওকে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দিচ্ছেন পিয়েরে উইনিং।

'এ-রকম কোনও কাজ কখনও করিনি আমি,' বলল রানা।

'এবার করুন। অন্তত মিনতির খাতিরে।'

'কিন্তু...কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনি যা করতে বলছেন আমাকে, তা শেষপর্যন্ত পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু হবে না। প্যানাসেলসাসের ওই পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না, সন্দেহ আছে আমার।'

'যদি সত্যিই তা হয়, ভাগ্যের উপহাস আরেকবার মেনে নিতে রাজি আছি।'

পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের চেকটা হাতে ধরে রেখেছে রানা, কিন্তু ওটা মূল্যহীন মনে হচ্ছে ওর কাছে। আড়চোখে তাকিয়ে

আছে মিনতির ফটোর দিকে। হাসছে মেয়েটা। কী নিষ্পাপ হাসি! ছবিটা যখন তোলা হয়েছিল, তখনও মৃত্যুর ছায়া পড়েনি ওর ওপর। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আরেকবার হার মেনে নিয়েছে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কাছে।

আজ একজন অসহায় লোক রানাকে ডেকে নিয়ে এসে মিনতি জানাচ্ছেন...

উঠে দাঁড়াল রানা। চেকটা ফিরিয়ে দিল উইনিং-এর হাতে।

চেহারা কালো হয়ে গেল উইনিং-এর। 'আমি কি ধরে নেবো, আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন আপনি?'

'কাজটা নিচ্ছি আমি, তবে টাকা নেবো না। ঠিক আছে?'

স্থির হয়ে গেছেন উইনিং, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

'আপনার ড্রাইভারকে বলুন, আমাকে যাতে এয়ারফিল্ডে পৌঁছে দেয়। আর, পাহারা দেয়ার জন্য একদল সশস্ত্র লোককে আমার সঙ্গে দেয়ার দরকার নেই। আমি পালাবো না।'

দুই

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জন ব্রিকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে রানা।

বছর পাঁচেক আগে প্রফেসরের সঙ্গে পরিচয় হয় রানার। ব্যক্তিগত একটা সমস্যায় রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির

লণ্ডন শাখার দ্বারস্থ হন প্রফেসর। রানা তখন লণ্ডনেই ছিল। প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনার মাধ্যমে নিজের লোকদের দিয়ে সমাধান করিয়ে দেয় ও প্রফেসরের সমস্যার। সেই থেকে রানার ওপর অগাধ আস্থা প্রফেসরের।

তবে এখানে আসার আগে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা, বুঝিয়ে বলেছে পরিস্থিতি। বাড়তি কয়েকদিনের ছুটি আদায় করে নিয়েছে নিজের জন্য। সোহেল কথা দিয়েছে, মেজর জেনারেলকে ম্যানেজ করবে সে। কোনও সাহায্যের দরকার হলে জানাতে বলেছে।

কেমব্রিজ ইউনিয়ন সোসাইটির পুরনো লাইব্রেরিতে ঢুকল রানা। পাঁচ বছরে কোনও পরিবর্তনই হয়নি এই জায়গার। কাঠের কালো প্যানেলিংগুলো আগের মতোই আছে। বদলানো হয়নি কোনও রিডিং টেবিল এবং চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা বইয়ের গ্যালারি। ফ্রেস্কো-করা ছাদের নকশাও অপরিবর্তিত আছে।

'রানা!'

ডাক শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

এগিয়ে আসছেন প্রফেসর ব্রিকার। এই পাঁচ বছরে বয়সের ছাপ পড়েছে তাঁর চেহারায়। দেহকাঠামো শক্তপোক্ত ছিল, এখন কিছুটা নুয়ে হাঁটছেন। টাক আরও প্রসারিত হয়েছে, অল্প কয়েকগাছি চুলের সবই পেকে সাদা হয়ে গেছে।

রানার সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করলেন প্রফেসর।

'কেমন আছেন, প্রফেসর?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'অনেকদিন পর দেখা হলো।'

জবাবে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। রানাকে দেখে খুশি হয়েছেন। পুরনো একটা আর্মচেয়ারে বসলেন তিনি। মুখোমুখি আরেকটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন রানাকে।

টুকটাক কথার পর প্রফেসর বললেন, 'হঠাৎ দেখা করতে চেয়েছেন আমার সঙ্গে, কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছি।'

দেখা করতে চাওয়ার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে গুছিয়ে বলল রানা।

শুনে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'আপনাকে নিরাশ করতে হচ্ছে...দুঃখিত। প্যানাসেলসাস সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা নেই আমার।'

হতাশ হলো রানা। ও ধরেই নিয়েছিল, প্যানাসেলসাসের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবে প্রফেসরের কাছ থেকে। বলল, 'অ্যালকেমির ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'অ্যালকেমি। মানে অপরসায়ন। বেশিরভাগ লোকের মতো আমারও ধারণা: ওটা একটা ভেলকিবাজি ছাড়া আর কিছু না।'

'কেন?'

'দেশে-দেশে সময়ে-সময়ে ধর্মের সঙ্গে অ্যালকেমিকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গুপ্তসংঘ। প্রাচীন মিশর বলুন অথবা চীন, অন্ধকার মধ্যযুগ বলুন অথবা রেনেসাঁ—প্রকাশ্যে বা গোপনে চলেছে অ্যালকেমির চর্চা, আজও চলছে।' চেয়ারে হেলান দিলেন প্রফেসর। 'সেই চর্চার মর্মার্থ কখনও বুঝতে পারিনি আমি। আজও বুঝি না, কী করে একদল লোক দাবি করতে পারে, অ্যালকেমির গুণে সীসাকে সোনা বানিয়ে ফেলা সম্ভব। কেউ কেউ বলে, অ্যালকেমি নাকি এমন এক মহৌষধের সন্ধান দিয়ে গেছে, যা খেলে মৃত্যু কাছে আসবে না...অর্থাৎ অমর হওয়া যাবে।'

'কখনও কি এ-রকম কিছু শুনেছেন: মরণব্যাধিতে আক্রান্ত কেউ ওই মহৌষধ খেয়ে সুস্থ হয়ে গেছে?'

ভ্রূ কোঁচকালেন প্রফেসর। 'দেখুন, একসময় প্লেগ, পক্স, কলেরা বা টাইফাসের মতো রোগ মরণব্যাধি হিসেবে পরিচিত ছিল। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কারণে অনেক দেশ থেকেই নির্মূল হয়ে গেছে ওসব। কেউ যদি আজ থেকে তিন-চার শ' বছর আগে এমন কোনও ওষুধ আবিষ্কার করে দাবি

করত, আমি কলেরার মহৌষধ বানিয়ে ফেলেছি, কী বলার থাকত? আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যদি ক্যান্সার ঠেকানোর ওষুধ বানিয়ে ফেলে, আপনি নিশ্চয়ই সেটা তেলেসমাতি কাণ্ড বলবেন না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'সমস্যাটা হচ্ছে,' বলছেন প্রফেসর, 'অ্যালকেমির পুরো ব্যাপারটাই অনুমাননির্ভর। অ্যালকেমিস্টরা কী আবিষ্কার করেছিল, অথবা আসলেই কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছিল কি না, ইতিহাস কিন্তু সে-ব্যাপারে মোটেও নিশ্চিত না। তবে ইতিহাস জানে, অ্যালকেমি রহস্যময় কিছু-একটা—অ্যালকেমি মানে গোপন কিছু ভ্রাতৃসঙ্ঘ, কোমরে খঞ্জর-গোঁজা আলখাল্লা-পরা কিছু লোক, একগাদা ধাঁধা আর কোড এবং রসায়ন ও জাদুটোনার মাঝামাঝি কোনও গুপ্তবিদ্যা। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওসবের মধ্যে মানুষের জন্য উপকারী কিছু থাকতে পারে না।'

'অস্পষ্টতা,' মন্তব্য করল রানা।

প্রফেসরের কাছে আসার আগে ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করেছে রানা। "এইনশেন্ট নলেজ" ও "সিক্রেটস অভ অ্যালকেমি" জাতীয় কিছু টার্ম লিখে সার্চ দিয়েছে গুগলে। ঘেঁটেছে অনেকগুলো ওয়েবসাইট। খুঁজে পেয়েছে বেশকিছু অ্যালকেমিকাল প্রবন্ধ—সেগুলোর কোনওটা সাম্প্রতিক সময়ের, কোনওটা আবার সেই চোদ্দ শতকের। একটা ব্যাপার খেয়াল করে আশ্চর্য হয়েছে: অ্যালকেমির সবকিছুই রহস্যে ঢাকা। সবকিছুতেই একটা গোপন গোপন ভাব। তাই অ্যালকেমির কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল, বিস্তর সময় নিয়ে গবেষণা না-করলে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু অত সময় নেই রানার হাতে।

'হুঁ, অস্পষ্টতা,' রানার সঙ্গে একমত হলেন প্রফেসর। 'তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট—শত্রুর অভাব ছিল না

অ্যালকেমিস্টদের। হয়তো সে-কারণেই যা নিয়ে গবেষণা করতেন তাঁরা, অথবা যা আবিষ্কার করতেন, তা গোপন রাখার চেষ্টা করতেন।'

'যেমন?' জানা থাকার পরও জিজ্ঞেস করল রানা।

'মনে করুন, কোনও এক অ্যালকেমিস্ট আবিষ্কার করে ফেলেছেন কীভাবে লোহা বা সীসাকে সোনা বানাতে হয়। ব্যাপারটা জানাজানি হলে, স্বাভাবিকভাবেই, লোকের নজর পড়বে তাঁর ওপর। ওই গুপ্তবিদ্যার কারণে কিডন্যাপও হয়ে যেতে পারেন তিনি। তাঁর সেই বিদ্যা জানাজানি হলে তিনি হয়ে যাবেন মূল্যহীন। আর যদি তিনি প্রমাণ করতে না পারেন তাঁর সেই বিদ্যা খাঁটি, তাঁকে হত্যা করে লোক দেখানোর জন্য ঝুলিয়ে দেয়া হবে গাছের ডালে।'

রানা কিছু বলল না।

'তবে অ্যালকেমিস্টদের একনম্বর শত্রু ছিল চার্চ, বিশেষ করে ইউরোপে। মধ্যযুগে যদি ইউরোপের কোথাও শোনা যেত কেউ অ্যালকেমির চর্চা করছে, অমনি তাকে ধরেবেঁধে হাজির করা হতো ধর্মবিচারসভায়, জাদুকর বা ডাইনি হিসেবে আখ্যা দেয়া হতো, ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি হিসেবে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো। ...পোপ ইনোসেন্ট তিন-এর হুকুমে ফ্রান্সের ক্যাথার সম্প্রদায়ের ওপর যে-বর্বরতা চালানো হয়েছিল মধ্যযুগে, তা এককথায় নারকীয়-হত্যাযজ্ঞ ছাড়া আর কিছু না।'

'ফ্রান্সের ঠিক কোথায় ঘটেছিল ঘটনাটা?'

চশমা খুললেন প্রফেসর, পকেট থেকে রুমাল বের করে কাচ ঘষলেন। 'দক্ষিণ ফ্রান্সে। যতদূর মনে পড়ে, জায়গাটার নাম ল্যাঙ্গুডক।'

'ক্যাথাররা কি অ্যালকেমিস্ট ছিল?'

'সেটা এখন আর নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। তবে বিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান চর্চার নামে যা করছিল ওরা, সেটা

সেদিকেই ইঙ্গিত করে।'

'অ্যালকেমি তা হলে ঝুঁকিপূর্ণ একটা বিষয় ছিল।'

'এখনও আছে।'

'মানে?'

'প্যারিসের এক ইউনিভার্সিটিতে বছরখানেক আগে এক কানাডিয়ান বায়োলজিস্ট একটা রিসার্চ করতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছিল।'

'রিসার্চটা কি অ্যালকেমি-সংক্রান্ত কিছু ছিল?'

'বলা যায়। ওই বায়োলজিস্ট যে-ভুল করেছিল তা হচ্ছে, নিজের রিসার্চ নিয়ে কয়েকটা আর্টিকেল ছেপেছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ব্যস, সাংঘাতিক খেপে গিয়েছিল কিছু লোক, মারমুখী হয়ে উঠেছিল।'

'কী নাম ওই বায়োলজিস্টের?'

'উঁ...কী যেন...মনে পড়েছে...ডক্টর বার্নহার্ট।'

'পুরো ঘটনাটা মনে আছে আপনার?'

'মোটামুটি। ...অ্যাকাডেমিক জগতে হইচই পড়ে গিয়েছিল ডক্টর বার্নহার্টের সেই আর্টিকেলগুলো নিয়ে। এমনকী ফরাসি মিডিয়াও কিছুদিন প্রচার করেছে খবরটা। ডক্টরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদ জানিয়ে ইউনিভার্সিটি ট্রাইবুনালে ধর্না দিয়েছিল ডক্টর। কাজ হয়নি।'

'ডক্টর বার্নহার্ট,' বিড়বিড় করে বলল রানা, নামটা গেঁথে রাখল মনে।

'আমাদের কমনরুমে পড়ে-থাকা *দ্য সাইন্স* নামের বিজ্ঞান-সাময়িকীতে ওই ব্যাপার নিয়ে বড় একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল, পড়েছিলাম। কমনরুমে যদি যাই আবার, খুঁজে দেখবো সাময়িকীটা আছে কি না। সেখানে ডক্টর বার্নহার্টের কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকতে পারে।'

'ধন্যবাদ।'

'আরেকটা কথা। প্যারিসে যদি যান, এবং যদি সময় করতে পারেন, চ্যাভিস লরেম নামের একজনের সঙ্গে দেখা করবেন। সে একজন বই-প্রকাশক। অ্যালকেমিসহ বিভিন্ন আজব বিষয়ে আগ্রহ আছে তার। আমার ভালো বন্ধু।' খুঁজতে খুঁজতে পকেট থেকে লরেমের কার্ড বের করলেন প্রফেসর, দিলেন রানাকে। 'রাখুন এটা। ওর সঙ্গে দেখা হলে আমার পক্ষ থেকে হ্যালো বলবেন।'

কার্ডটা নিল রানা, উল্টেপাল্টে দেখে পকেটে রেখে দিল। 'ডক্টর বার্নহার্টের নম্বরটা পেলে আমাকে জানাবেন, প্লিয।' উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসরও, উষ্ণ করমর্দন করলেন রানার সঙ্গে।

লাইব্রেরি রুম থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

অনেকদূরে কোথাও, টেলিফোনের দু'প্রান্তে কথা বলছে দু'জন লোক।

ফিসফিসে গলায় একজন বলল, 'ওর নাম মাসুদ রানা।'

'চিন্তার কিছু নেই,' বলল অন্য লোকটা। 'বাকিদের যে-হাল করেছি, এরও তা-ই করবো।'

'মাসুদ রানা কিন্তু বাকিদের মতো না।'

'কত যদুরাম-মধুরাম শুয়ে পড়ল, আর মাসুদ রানা তো...। তুমি শুধু সময়ে-সময়ে খবর দিতে থাকবে ঠিকমতো, বাকিটা সামলানোর দায়িত্ব আমার।'

লম্বা-চওড়া লোকটা এখন অবস্থান করছে ইটালির রোমে, নিজের স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে। ওর হাতে *দ্য সাইন্স*-এর একটা কপি। ডক্টর সেলেনা বার্নহার্টের আর্টিকেলটা পড়ছে। ওটা আগেও পড়েছে সে। গত কয়েকদিনে কিছু খবর এসেছে ওর কাছে, যার কারণে আজ আবার হাতে নিতে হয়েছে

বিজ্ঞান-সাময়িকীটা।

ওই আর্টিকেল প্রকাশিত হওয়ার পর বিশেষ একদল লোক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, এবং তাতে খুশিই হয়েছিল সে। কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক বলতে গেলে ধুয়ে ফেলেছিল সেলেনাকে, পাগল আখ্যা দিয়েছিল মেয়েটাকে। তাতে খুশি আরও বেড়েছিল তার। বিশেষ সেই আর্টিকেলে সেলেনা বলেছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের উচিত, অ্যালকেমিকাল গবেষণাকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। এবং ও-ধরনের গবেষণায় আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা। তার ফলে নাকি বৈপ্লবিক কোনও পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে—অ্যালকেমি একদিন পদার্থবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের সমমর্যাদা পেতে পারে।

'ছাগলী,' বিড়বিড় করে বলল সে।

ওই আর্টিকেল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সেলেনার ক্যারিয়ার এবং গতিবিধির ওপর নজর রাখছে লোকটা। চাকরি চলে গেছে মেয়েটার, ভালো লেগেছে লোকটার। ওই মেয়ের ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান-জগৎ, বলতে গেলে একঘরে করে দিয়েছে ওকে, ভালো লেগেছে লোকটার।

কিন্তু এখন আর ভালো লাগছে না তার। এখন সাংঘাতিক খেপে আছে সে। এবং উৎকণ্ঠায় ভুগছে।

চাকরি হারিয়ে এবং আধুনিক বিজ্ঞানসমাজ থেকে একঘরে হয়ে গিয়ে রোখ চেপে গেছে হতচ্ছাড়া ওই মেয়ের। সারা দুনিয়ার এত উপহাস আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য সত্ত্বেও এবং টাকার অভাবে ধুঁকতে থাকার পরও নিজের ব্যক্তিগত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে সে। লোকটার রাগের কারণ, খবর পাওয়া গেছে, সেলেনা বার্নহার্ট তার গবেষণায় কী নাকি এক সাফল্য পেয়েছে। সাফল্যটা যদিও বড় কিছু নয়, তারপরও রাগ আর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারছে না সে।

সেলেনা মেয়েটা আসলে খুবই একগুঁয়ে। হয়তো বিপজ্জনকও। নিজের সামান্য সম্বল নিয়ে যা করে দেখিয়েছে সে, একদল গবেষককে মোটা বেতনে পুষেও তা করতে পারেনি সে নিজে।

এভাবে চলতে দেয়া যায় না। সেলেনাকে বেশিদূর এগোতে দিলে সত্যিই হয়তো বৈপ্লবিক কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।

কাজেই থামাতে হবে ওই মেয়েকে।

প্যারিসের একটা হোটেলে উঠেছে রানা।

অনুরোধে ঢেঁকি অনেকবার গিলতে হয়েছে ওকে, আরও একবার গিলতে হলো। পিয়েরে উইনিং যেভাবে বললেন, তাঁকে মুখের ওপর মানা করতে পারেনি ও। ডক্টর আহসান মোবারকের মেয়ে মিনতির করুণ পরিণতি সাংঘাতিক নাড়া দিয়েছিল ওকে। বুকের ভেতরে একটা ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছিল, উইনিং-এর নাতনির বর্ণনা শুনে সেই চোট এখন পরিণত হয়েছে মানবিক দায়ে। তা না হলে আজগুবি অ্যালকেমি, কোথাকার কোন্ হেনরিখ প্যানাসেলসাস, আর গাঁজাখুরি এক পাণ্ডুলিপির পেছনে দৌড়ানোর কোনও দরকার ছিল ওর?

ওই পাণ্ডুলিপির আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে কি না, উইনিং যে-মহৌষধের কথা বলেছেন তা কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না—ইত্যাদি নিয়ে সন্দেহ আছে রানার। তারপরও, যেহেতু এবারের ছুটিটা কয়েকদিন বাড়িয়ে নেয়া গেছে, সেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজে দেখবে। হয়তো কিছুই হবে না শেষপর্যন্ত, হয়তো একদিন খবর পাওয়া যাবে মারা গেছে উইনিং-এর নাতনি, তারপরও... চেষ্টা করে দেখলে ওই দায় এড়ানো যাবে অন্তত।

নিজেকে এ-ই বলে সান্ত্বনা দিতে পারবে রানা, মিনতির জন্য অন্তত চেষ্টা করেছিল ও।

প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপি খুঁজতে গিয়ে ওয়ালথারটা দরকার হবে কি না, সে-ব্যাপারেও সন্দেহ আছে রানার। তাই পিস্তলটা হোটেলরুমেই রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

প্যারিসের রাস্তায় বেরিয়ে এল ও, হাঁটছে। শেষবিকেলে আকাশের পটভূমিতে অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে নটরডেম ক্যাথেড্রাল। ওদিকে এগিয়ে গেল রানা। একদল ভ্রমণপিপাসু আমেরিকানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একজন ট্যুর-গাইড, ক্যাথেড্রালের মুখস্থ-করা ইতিহাস শোনাচ্ছে তাদেরকে।

গির্জার পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। আশপাশের পরিবেশ জমকালো। ওর ঠিক মুখোমুখি আছে গির্জার মূল অংশটা—যেখানে লোকজন বসে। গির্জার কয়েকটা স্তম্ভে লুটোপুটি খাচ্ছে খোলা জানালা দিয়ে ঢোকা অস্তগামী সূর্যের আলো।

রানার হাতে একটা বই আছে। প্যারিসে এসেই চ্যাভিস লরেমের সঙ্গে দেখা করেছে ও, প্রফেসর ব্রিকারের রেফারেন্স দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়েছে। লরেম তখন বিশেষ একটা বইয়ের ইংরেজি-অনুবাদ ধরিয়ে দিয়েছেন রানার হাতে।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, বইটা লিখেছেন প্যানাসেলসাস নিজে, উনিশ শ' বাইশ সালে। বইয়ের নাম: *ক্যাথেড্রালের রহস্য*।

ওটা পাওয়ার পর রানা ভেবেছিল, বইটা ঘাঁটলে হয়তো প্যানাসেলসাসের কোনও ছবি পাওয়া যাবে। তাঁর আসল নাম অথবা পারিবারিক ইতিহাসের বর্ণনাও পাওয়া যেতে পারে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, বিশেষ সেই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কিছু-না-কিছু জানা যাবে। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে ওকে। *ক্যাথেড্রালের রহস্যে* নিজেকে পর্দার আড়ালেই রেখে দিয়েছেন প্যানাসেলসাস।

অ্যালকেমিকাল প্রতীক আর সঙ্কেতলিপির বিশদ বর্ণনা ওই বই। প্যানাসেলসাস দাবি করেছেন, ও-রকম প্রতীক আর

সঙ্কেতলিপি ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ক্যাথেড্রালে। নিজের মুখোমুখি দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। দেখছে: প্যানাসেলসাসের দাবি ভুল নয়।

পাথুরে দেয়ালে খোদাই করে দ্বাদশ শতাব্দীর স্থাপত্যরীতিতে বানানো হয়েছে খিলানে-ঢাকা পথ *পোর্চ অভ জাজমেন্ট*। তার নিচে একসারিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন যাজককে। সঙ্গে কয়েকজন সাধারণ মানুষ আর কিছু প্রতীক। প্যানাসেলসাসের বই বলছে, এ-ধরনের খোদাইকর্মের নিগূঢ় অর্থ আছে। এমন অর্থ, যার মানে বোঝা সম্ভব শুধু *বিশেষ-জ্ঞানে* জ্ঞানী কারও পক্ষে।

আমি বিশেষ-জ্ঞানে জ্ঞানী নই, মনে মনে বলল রানা।

পোর্চ অভ জাজমেন্টে যিশুখ্রিস্টের আদলও খোদাই করা আছে। সেটার পায়ের কাছে ছোট আরেকটা অবয়ব আছে—দুই হাতে দুটো বই ধরে সিংহাসনে বসে আছে এক নারী, একটা খোলা অন্যটা বন্ধ। প্যানাসেলসাসের দাবি, খোলা বইটা উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চা এবং বন্ধ বইটা গুপ্তবিদ্যার প্রতীক। খিলানে ঢাকা ওই পথে আরও দেখা যাচ্ছে একটা স্যালামাণ্ডার। দেখা যাচ্ছে একহাতে-তলোয়ার এবং অন্যহাতে সিংহের-মাথাওয়ালা ঢালের এক মধ্যযুগীয় নাইটকে। সর্পিলাকৃতির একটা প্রতীকও দেখা যাচ্ছে, যেটার মাথায় বসে আছে একটা দাঁড়কাক।

প্রতীকীবিদ্যার মানে বের করতে পারা আসলে দুরূহ একটা কাজ। কারণ প্রতীক ব্যবহার করে কেউ যখন কিছু বোঝাতে চায়, তখন যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তা ধরতে না পারলে প্রতীকের কোনও মানেই থাকে না। যেমন ওই দাঁড়কাক। কী মানে ওটার?

হয়তো কিছুই না। আবার হয়তো বিশেষ কিছু।

পোর্চ অভ জাজমেন্ট থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। প্যানাসেলসাসের বইটা খুলল।

বইয়ের সূচনাপত্র লিখেছেন প্যানাসেলসাসের এক অনুসারী। তাতে বলা হচ্ছে, উনিশ শ' ছাব্বিশ সাল নাগাদ ওই ঘনিষ্ঠ অনুচরকে কিছু একটা দিয়ে যান প্যানাসেলসাস—সেটা কী, তা জানে না কেউই; তারপরই যেন বাতাসে মিলিয়ে যান তিনি। তাঁকে খুঁজেছে অনেকেই, এমনকী একটা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিও। কিন্তু কোথাও কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি তাঁর।

ইন্টারনেট ঘেঁটে একই তথ্য জানতে পেরেছে রানা। এমনকী, পরস্পরবিরোধী কিছু তথ্যও পাওয়া গেছে। যেমন, একটা ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, হেনরিখ প্যানাসেলসাস নামের কেউ ছিলেন না কোনওদিন। আবার কোথাও বলা হয়েছে, প্যানাসেলসাস একটা কল্পিত চরিত্র—একটা গুপ্তসংঘ তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সমর্থকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল বানোয়াট মতবাদ।

তবে অ্যালকেমি বিষয়ক বেশিরভাগ ওয়েবসাইটের দাবি, প্যানাসেলসাস নামের কেউ একজন আসলেই ছিলেন। একজায়গায় তাঁকে মাস্টার অ্যালকেমিস্ট আখ্যা দেয়া হয়েছে। আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, রহস্যময় অন্তর্ধানের কয়েক দশক পর তাঁকে একবার নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে—তখন তাঁর বয়স এক শ'রও বেশি।

এসব কথার কোনওটাই বিশ্বাস করেনি রানা, আবার উড়িয়েও দেয়নি। যা প্রমাণিত সত্য নয়, তা বিশ্বাস করা অনুচিত, আবার পুরোপুরি বাতিল করে দেয়াও ঠিক না। রানা শুধু তথ্যগুলো গেঁথে রেখেছে মনে। তবে ওর কাছে যা আশ্চর্য লেগেছে তা হচ্ছে, এতগুলো ওয়েবসাইটের কোনওটাতেই প্যানাসেলসাসের সেই পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে একটা কথাও বলা হয়নি।

হঠাৎ টের পেল রানা, কেউ একজন ফলো করছে ওকে।

এবং কাজটা যে করছে, সে আসলে ওই কাজে আনাড়ি।

রানার নজরে যাতে না পড়ে যায়, সেজন্য নিজেকে লুকিয়ে রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করছে লোকটা। সেই অতিচেষ্টা ওর অস্তিত্ব ফাঁস করে দিয়েছে রানার কাছে। কখনও লোকটা দ্রুত পায়ে হেঁটে ছাড়িয়ে যাচ্ছে রানাকে, গির্জার কোনও এক কোনায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকছে রানার দিকে। কখনও আবার বসে পড়ছে কোনও বেঞ্চে, চোখের সামনে ধর্মগ্রন্থ মেলে ধরে আড়ালে রাখার চেষ্টা করছে নিজের চেহারা।

কে লোকটা? মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা। *এবং কেন এই লুকোচুরি?*

প্যানাসেলসাসের তথাকথিত পাণ্ডুলিপির যে-খোঁজ চালাচ্ছে, তাতে বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনাও আশা করেনি ও। ভাবেনি, কাজ শুরু করতে-না-করতেই কারও দৃষ্টি আকর্ষিত হবে ওর ওপর, ওর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করবে কেউ। তাই সিদ্ধান্ত নিল, মুখোমুখি হবে অচেনা ওই লোকের। তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে, কেন সে পিছু নিয়েছে রানার।

এখন প্রথম যে-কাজ করতে হবে রানাকে তা হলো, নিরালা কোনও জায়গায় নিয়ে যেতে হবে অনুসরণকারী লোকটাকে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পালাতে না পারে ওই লোক। তারপর তাকে চেপে ধরবে রানা। লোকটা যদি আসলেই অ্যামেচার হয়ে থাকে, ও আশা করছে, তার পেট থেকে খবর বের করাটা কষ্টকর হবে না।

গির্জার আরও ভেতরের দিকে, বেদির কাছাকাছি সরে এল রানা। এখান থেকে আঁকাবাঁকা একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের একটা টাওয়ার অভিমুখে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। অর্ধেক পথ যাওয়ামাত্র টের পেল, নড়ে উঠেছে ওই লোক, এগিয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। পা চালাল রানা। দ্রুত হাজির হলো দ্বিতীয় গ্যালারিতে। তারপর সেখান থেকে চলে

এল একটা পাথুরে ওয়াকওয়েতে, খোলা আকাশের নিচে।

ক্যাথেড্রালের উঁচু দুটো টাওয়ারের মাঝখানে যেন সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে এই ওয়াকওয়ে। এটার দুই কিনারায় জাফরি-কাটা পাথরের নাতিদীর্ঘ রেলিং আছে, উচ্চতায় রানার কোমর পর্যন্তও আসতে পারেনি। এখান থেকে কেউ যদি পড়ে যায়, সোজা দু'শ' ফুট নিচের জমিনে আছড়ে পড়বে সে।

বিশালকায় কয়েকটা পিশাচ আর অপদেবতার পাথুরে মূর্তি আছে রানার আশপাশে। একটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ও, অনুসরণকারীর জন্য অপেক্ষা করছে।

মিনিট দুয়েক বাদে প্যারাপেটে হাজির হলো লোকটা, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। যেখানে আছে রানা, সে-জায়গা ছাড়িয়ে যখন কিছুদূর গেল লোকটা, তখন আড়াল ছেড়ে বের হলো ও। নিজের উপস্থিতি জানান দেয়ার জন্য কাশল।

পাঁই করে ঘুরল লোকটা।

'হ্যালো,' বলল রানা।

নগ্ন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ওই লোকের চোখে, চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এদিকওদিক।

দ্রুত পায়ে আগে বাড়ল রানা, পালানোর পথ বন্ধ করে দিতে চায় অচেনা লোকটার। 'কেন অনুসরণ করছ আমাকে?'

এ-রকম অবস্থায়, রানা জানে, একেক লোক একেক রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। কেউ কুঁকড়ে যায়, কেউ পালানোর চেষ্টা করে, কেউ আবার হামলা করে বসে। যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে রানা।

লোকটা হামলা করল।

অস্তগামী সূর্যের আলো হঠাৎ প্রতিফলিত হলো ওই লোকের ডান হাতে—ছুরির হাতলে চাপ দিতেই বেরিয়ে এসেছে ওটার ফলা। অস্ত্রটা মিলিটারি স্টাইলের, হাতলের দু'দিকে দুটো ক্ষুরধার ফলা আছে।

একটুও দ্বিধা না করে রানার ওপর ছুরি চালাল লোকটা।

বিদ্যুৎগতিতে নড়ে উঠল রানা, বাঁ হাতে প্রচণ্ড এক কোপ মেরেছে প্রতিপক্ষের ডান কব্জির নিচে। অকস্মাৎ ওই সংঘর্ষ সামাল দিতে পারল না লোকটা, মিলিটারি নাইফ আলগা হয়ে গেল ওর হাত থেকে। একটা মুহূর্ত নষ্ট করল না রানা, ডান পায়ে জোরালো এক লাথি হাঁকাল প্রতিপক্ষের বাঁ হাঁটুর ওপর, ব্যালেন্স নষ্ট করে দিল লোকটার। পরমুহূর্তেই দু'হাত দিয়ে ধরল প্রতিপক্ষের ডান হাত, বিশেষ এক লকে আটকে ফেলল হাতটা। ওটা মুচড়ে নিয়ে এল প্রতিপক্ষের পিঠের ওপরে, একইসঙ্গে নিজেও সরে এসেছে লোকটার পেছনে।

'কেন অনুসরণ করছ আমাকে?' আবারও জিজ্ঞেস করল ও। জানে, প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে এখন ওর প্রতিপক্ষ। 'জবাব দাও, ছেড়ে দেবো, সুবোধ বালকের মতো বাড়ি যেতে পারবে। তোমাকে মেরে হাত গন্ধ করার ইচ্ছে নেই আমার।'

জবাবে লোকটা যা করল, তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না রানা।

যে-লকে আটকেছিল ও লোকটাকে, মোচড়ামোচড়ি করতে গিয়ে কব্জি ভেঙে ফেলা ছাড়া অন্য কোনও কায়দায় মুক্তি পাওয়া সম্ভব না সেটা থেকে। সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ ওই কাজ করবে না। কিন্তু অচেনা লোকটা তা-ই করল। পাল্টা মোচড় দিয়ে ছুটিয়ে নিতে চাইল সে নিজের হাত, মট করে একটা আওয়াজ হলো, ভেঙে গেল ওর কব্জির হাড়।

একটা মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল রানা, সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ নিল লোকটা। বাঁ হাতে একটা থাবড়া চালাল সে রানার নাকেমুখে। একটা মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল রানার চারপাশ, পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো সে। নিজেকে সামলে নিয়ে যতক্ষণে তাকাল সামনের দিকে, ততক্ষণে ওয়াকওয়ের একদিকের রেলিং-এর ওপর চড়ে বসেছে লোকটা।

রানার চোখে চোখে শেষবারের মতো তাকাল সে, তারপরই ঝাঁপ দিল।

দু'শ' ফুট নিচে আছড়ে পড়তে মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড লাগল তার।

রেলিং-এর কাছে সরে এসেছে রানা, ওটা আঁকড়ে ধরে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। দেখল, নিচে পড়ামাত্র মারা গেছে লোকটা, হতবিহ্বল দৃষ্টিতে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকজন ট্যুরিস্ট। ওদের কেউ ওপরে তাকালেই দেখতে পাবে রানাকে...

চট করে সরে এল ও। যেখান দিয়ে ঢুকেছিল এই ওয়াকওয়েতে, দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরেছে সেদিকে। গ্যালারিতে মাত্র পা দিয়েছে, এমন সময় শুনতে পেল, কে যেন চিৎকার করছে রাস্তায়।

পুলিশের গাড়ি যতক্ষণে হাজির হলো ঘটনাস্থলে, ততক্ষণে ক্যাথেড্রাল থেকে বেরিয়ে অনেকদূরে চলে এসেছে রানা।

তিন

ল্যাবরেটরি শব্দটা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আধুনিক, সুপ্রশস্ত, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা কোনও জায়গা। কিন্তু মধ্য প্যারিসের একটা পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠছে রানা, তখন কিছুটা আশ্চর্যই হলো ও। এ-বাড়িতে লিফট

নেই। প্যাঁচানো সিঁড়ির ধাতব রেলিং-এ মরিচা পড়ে গেছে। তৃতীয় তলার ল্যাণ্ডিং-এ হাজির হয়ে থামল ও; দু'পাশ এত সরু যে, তিন ফুট করে জায়গাও আছে কি না, সন্দেহ। দু'দিকে দুটো আলাদা অ্যাপার্টমেন্টের সদর-দরজা দেখা যাচ্ছে। বাতাসে কেমন একটা ছাতাপড়া গন্ধ। বুক ভরে দম নিলে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধের আভাস পাওয়া যায়।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় ক্যাথেড্রালের ঘটনাটা ভাবছিল রানা। ওর চোখের সামনে অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল অচেনা লোকটা। কেন? কাদের হয়ে নজরদারি করছিল সে রানার ওপর? ওরা কি এতই ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর যে, দায়িত্বে ব্যর্থতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু জেনে অচেনা ওই লোক নিজেই নিজেকে শেষ করে দিয়েছে?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির...যদি সে-রকম কিছুর অস্তিত্ব আসলেই থেকে থাকে...খোঁজ করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

এখানে আসার পথে যথেষ্ট সতর্ক থেকেছে রানা। পথিমধ্যে বার বার থেমেছে, এদিকওদিক তাকিয়েছে। আশপাশের লোকগুলোকে খেয়াল করেছে। নিশ্চিত হতে চেয়েছে, কেউ ওকে অনুসরণ করছে না।

নতুন কোনও অনুসরণকারী নজরে পড়েনি ওর।

মুখোমুখি একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজার গায়ে আটকানো নম্বর চেক করল ও, তারপর চাপ দিল ডোরবেলে। কোঁকড়া কালো চুলের হালকাপাতলা এক যুরক খুলে দিল দরজাটা। কেমন রক্তশূন্য দেখাচ্ছে যুবককে। আপাদমস্তক দেখল সে রানাকে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ওর পিছু নেয়ার ইশারা করল।

ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল রানা।

একদিকের একটা বন্ধ দরজায় ইংরেজিতে *ল্যাব* শব্দটা

লেখা আছে, ওটার গায়ে টোকা দিল যুবক। তারপর রানাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ল্যাবটা আসলে রূপান্তরিত কোনও বেডরুমের চেয়ে বেশি কিছু না। কয়েকটা কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে এখানে-সেখানে। বই আর ফোল্ডারের অগোছালো স্তূপ দেখে মনে হচ্ছে, যে-কোনও সময় ধস নামবে যে-কোনও স্তূপে। ঘরের একদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। আরেকদিকের একটা র‍্যাকে দেখা যাচ্ছে কিছু টেস্টটিউব। জায়গার বড় অভাব এই ঘরে, তারপরও এককোনায় যেন জোর করে ঠেসে দেয়া হয়েছে একটা ডেস্ক। সেটার ওপর একটা মাইক্রোস্কোপ দেখা যাচ্ছে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সী ল্যাবকোট-পরিহিতা সুন্দরী এক মেয়েকে দেখা যাচ্ছে ওই ডেস্কের পাশে। খোঁপা করে বেঁধে রেখেছে সে তার গাঢ় লাল চুল। একটুও মেকআপ করেনি, তারপরও যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে তাকে। দুই কানে মুক্তোর দুল পরেছে।

'এক্সকিউয মি,' বলল রানা, 'ডক্টর বার্নহার্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমিই বার্নহার্ট,' বলল মেয়েটা, উচ্চারণে কানাডিয়ান টান স্পষ্ট। 'সেলেনা বার্নহার্ট।'

একটু আশ্চর্য হলো রানা। প্রফেসর জন ব্রিকার যেহেতু ডক্টর বার্নহার্টের পুরো নাম বলেননি, ও ভেবেছিল, বার্নহার্ট কোনও পুরুষমানুষের নাম।

'আমাকে সেলেনা বলে ডাকবেন, প্লিয,' বলছে মেয়েটা। 'বন্ধুরা তা-ই বলে।' এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করল রানার সঙ্গে।

'আর আমিও চাই না আমাকে আপনি করে বলো তুমি,' বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা।'

'বসো,' ডেস্কের একধারে দুটো চেয়ার আছে, সেদিকে ইঙ্গিত করল সেলেনা।

বসল রানা। সেলেনা বসল ওর মুখোমুখি।

'তুমিই তা হলে ফোন করেছিলে আমাকে,' বলল মেয়েটা। 'দেখা করতে চেয়েছিলে আমার সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বিশেষ একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার আমার। তবে তার আগে ধন্যবাদ দিতে চাই—আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছ বলে।'

'আমার অ্যাসিসটেন্ট জে ফক্স বলল, তুমি নাকি একটা পত্রিকায় কাজ করো।'

কথাটা মিথ্যা, তারপরও মাথা ঝাঁকাল রানা। সেলেনার অ্যাসিসটেন্টের কাছে সে-পরিচয়ই দিয়েছে নিজের। বলল, 'আমাদের একটা সাময়িকীর জন্য কাজ করছি আমি আসলে।'

'ও আচ্ছা। ...কফি খাবে? আমার আবার ঘন ঘন কফি খাওয়ার অভ্যাস। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কফি বানাতাম নিজের জন্য।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কালো কফি, চিনি ছাড়া।'

অ্যাসিসটেন্টের দিকে তাকাল সেলেনা। 'তুমি খাবে?'

'না। আমি এখন একটু বাইরে যাবো। আমার বিড়ালটার জন্যে মাছ কেনা দরকার।'

হেসে ফেলল সেলেনা। 'তোমার বিড়ালটা দিন দিন একটা রাক্ষসে পরিণত হচ্ছে। সারাদিনে আমি যতটা না খাই, ওটা খায় তার দ্বিগুণ।'

হাসল জে ফক্সও, বাইরে চলে গেল।

দু'কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এসে রানার সামনে বসল সেলেনা।

'এখানে কতদিন ধরে আছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল সেলেনা। 'বছর তিনেক হতে চলল।' চুমুক দিল কফির কাপে। 'কাজের কথায় চলে যাই। কীভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

নিজের কাপে চুমুক দিল রানাও। 'অ্যালকেমির ব্যাপারে জানতে চাই আমি।'

'তা-ই ভেবেছিলাম। ...আমার খবর পেলে কোথায়?'

'কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। তাঁর কাছ থেকে শুনেছি তোমার নাম। তোমার গবেষণার ব্যাপারটা জানা আছে তাঁর; বললেন, তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারবে আমাকে।'

'পত্রিকার সেই আর্টিকেল? ওটার ব্যাপারে কিছু জানতে চেয়ো না, প্লিয। ওই ব্যাপারে আমি যারপরনাই বিরক্ত।'

আরেক চুমুক কফি খেল রানা। 'না, ওই আর্টিকেলের ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি। আসলে...একটা পাণ্ডুলিপির খোঁজ করছি আমি।'

'পাণ্ডুলিপি?'

'হেনরিখ প্যানাসেলসাস নামে একজন অ্যালকেমিস্ট ছিলেন। বিশেষ এক মহৌষধের ব্যাপারে তাঁর নাকি একটা পাণ্ডুলিপি ছিল।'

'তুমি তা হলে ওই পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে জানতে এসেছ?'

'শুধু ওটাই না, অ্যালকেমি আসলে কী, কারা জড়িত ছিলেন ওই বিদ্যার সঙ্গে, কী আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তাঁরা...সব জানতে চাই।'

কৌতূহল দেখা দিয়েছে সেলেনার চোখেমুখে। 'অ্যালকেমির ব্যাপারে কতখানি জানো তুমি?'

'বলতে গেলে কিছুই না।'

'তা হলে শুরুতেই একটা কথা বলে রাখি তোমাকে। অ্যালকেমি মানে কিন্তু যে-কোনও ধাতুকে সোনা বানানোর বিদ্যা নয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, সঙ্গে করে আনা নোটবুক খুলল। 'নোট নেয়া যাবে?'

'হুঁ। ...অ্যালকেমির থিওরি বলে, যে-কোনও ধাতুকে

সোনা বানানো অসম্ভব নয়। রসায়ন সম্বন্ধে কতটুকু জানো তুমি, জানি না। থিওরিটিকালি, যদি কোনও পদার্থের ইলেক্ট্রন-বিন্যাসে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং সজ্জা বদল করা যায়, তা হলে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তিত করে ফেলা সম্ভব।'

'কিন্তু তোমার কাছে অ্যালকেমি মানে নিশ্চয়ই ধাতুর ইলেক্ট্রন-বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটানো নয়?'

'ঠিক। আমার ধারণা, যুগে যুগে অ্যালকেমিস্টদের বিভিন্ন গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল একটাই: এমন কোনও বিশ্বজনীন উপাদান আবিষ্কার করা, যার ফলে শুধু ধাতু না, যে-কোনও পদার্থের শুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব। এবং যে-কোনও পদার্থে শক্তি সঞ্চয় করা অথবা সেটা থেকে শক্তি বের করে আনা সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, নোট নিচ্ছে।

'মনে করো, সে-রকম কোনও প্রযুক্তি পেয়ে গেছ তুমি। এবার ভেবে দেখো, ওটার বদৌলতে কী করা সম্ভব। আণবিক বোমার ঠিক উল্টো কাজটা করতে পারবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অণু ভেঙে সেটা থেকে শক্তি বের করে আনার বদলে শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারবে সেখানে।'

'ওই প্রযুক্তি যদি ব্যবহার করা যায় বায়োলজিতে, তা হলে কী হবে?'

'ঠিক ওই কথাই বলতে চেয়েছিলাম আমার আর্টিকেলে, কেউ বোঝেনি। তুমি বুঝে গেছ। ...বায়োলজি বলে, নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর যে-কোনও জীবকোষ শক্তি হারাতে শুরু করে, মানুষের বেলায় যা বুড়িয়ে-যাওয়া হিসেবে পরিচিত। যদি সেই শক্তি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়, লোকে আর বুড়ো হবে না।'

'চিকিৎসাবিজ্ঞান কি অতদূর যেতে পারবে কখনও?'

'জানি না। তবে এটা জানি, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অতদূর

নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অ্যালকেমিস্টরা।'

'আর সে-কারণেই তাঁরা পরিণত হয়েছিলেন চার্চের শত্রুতে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেলেনা, মাথা ঝাঁকাল। 'চলো, একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।'

'কী?'

'মাছি। ওসবে গা ঘিনঘিন করে না তো তোমার?'

'না।'

উঠল সেলেনা, এগিয়ে যাচ্ছে একটা ডাবল ডোরের দিকে। ওর পিছু নিল রানা।

দরজাটা খুলল মেয়েটা। দেখা যাচ্ছে একটা ওয়াক-ইন কাবার্ড। এককালে মনে হয় ওয়ার্ডরোব ছিল ওটা। দুটো কাচের ট্যাঙ্ক রাখার জন্য পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে ওটাতে। কিন্তু ওসব ট্যাঙ্কে মাছ নেই, আছে মাছি। হাজার হাজার মাছি। কালচে, লোমশ। প্রতিটা ট্যাঙ্কের কাচদেয়ালের গায়ে যেন গিজগিজ করছে ওগুলো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেলেনার দিকে তাকাল রানা।

'আমার গবেষণা। দেখো, একটা ট্যাঙ্কের গায়ে লেখা আছে "এ", অন্যটাতে "বি"। বি ট্যাঙ্কের মাছিগুলো সাধারণ। মানে, যথেষ্ট যত্ন নেয়া হচ্ছে ওগুলোর, কিন্তু এখনও আমার গবেষণার কাজে লাগাইনি ওগুলোর কোনওটাকে। গবেষণা করা হচ্ছে "এ" ট্যাঙ্কের মাছিগুলো নিয়ে।'

'কীসের গবেষণা?'

'পুরনো একটা অ্যালকেমিকাল পাণ্ডুলিপি পড়ে জানতে পেরেছিলাম ওই গবেষণার ব্যাপারে। ওটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'সাধারণ একটা পূর্ণবয়স্ক মাছি যদি ঠিকমতো খেতে

পায়, সপ্তাহ ছয়েক বেঁচে থাকে। অর্থাৎ "বি" ট্যাঙ্কের মাছিগুলোর বেলায় সেটাই ঘটছে। কিন্তু ওই অ্যালকেমিকাল পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে "এ" ট্যাঙ্কের মাছিদের খাবারে বিশেষ একজাতের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি আমি। ফলে আট সপ্তাহের আগে মারা যাচ্ছে না কোনও মাছিই।'

'অর্থাৎ অ্যালকেমির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মাছির জীবনকাল ত্রিশ শতাংশ বাড়াতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সেলেনা। 'আমার মাছিদের তিন প্রজন্মের ওপর গবেষণাটা চালিয়েছি। ফলাফলে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি কখনও।'

'তারমানে একটা ব্রেকথ্রু পেয়ে গেছ? দারুণ তো!'

'হুঁ। তারপরও বলবো, এখনও গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে আছি। কারণ ওষুধটা কীভাবে কাজ করছে জানি না, ওটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কি না তা-ও জানি না। শেষপর্যন্ত কী হয়, দেখার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।'

রানার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

'সরি,' পকেট থেকে ফোনটা বের করল রানা। 'হ্যালো?'

'চ্যাভিস লরেম বলছি,' বলল ও-প্রান্তের লোকটা।

'মিস্টার লরেম?' আশ্চর্য হয়েছে রানা।

'আজ রাতে দেখা করতে পারবেন?'

'কেন?'

'জরুরি কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

কেমন যেন খটকা লাগছে রানার, কিন্তু মানা করল না ও। 'কোথায় আসবো?'

'আমার বাসায়। প্যারিসের উপকণ্ঠে *কোর্ট দ্য ব্রিগন্যান* নামে একটা গ্রাম আছে, সেখানে। আমার বাড়ির নাম *ভিলা গ্যামস্ক*। তেমন একটা কষ্ট করতে হবে না আপনাকে, কারণ আপনি রাজি থাকলে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো, ড্রাইভারই

জায়গামতো নিয়ে আসবে।'

'কোর্ট দ্য ব্রিগন্যান। ভিলা গ্যামক্স। ঠিক আছে। আজ রাত পৌনে ন'টায় দেখা হবে তা হলে। পরে ফোন করবো আপনাকে, কোত্থেকে তুলে নিতে হবে আমাকে তা জানিয়ে দেবো। গুডবাই।' লাইন কেটে দিল রানা, আর কেউ যাতে ফোন করে বিরক্ত করতে না-পারে সেজন্য বন্ধ করে দিল মোবাইল। তাকাল সেলেনার দিকে। 'তুমি বোধহয় বিরক্ত হয়েছ।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'অ্যালকেমিকাল ফর্মুলাটার ব্যাপারে আরও কিছু বলো,' বলল রানা। 'ওটা কি অন্য কোনও প্রজাতি, যেমন মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছ কখনও?'

'না। আগে আমার মাছি-গবেষণা শেষ হোক। তবে আমার ধারণা, সুস্থ-সবল লোকদের ওপর যদি ওই ফর্মুলা প্রয়োগ করা হয়, মানুষের গড় আয়ু আশি বছর থেকে বেড়ে এক শ' আট হয়ে যাবে। আরও বেশিও হতে পারে।'

'মনে করো, *বি* ট্যাঙ্কের কোনও মাছি অসুস্থ বা মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। তোমার ওই ফর্মুলা প্রয়োগ করে ওটাকে কি সুস্থ করে তোলা সম্ভব?'

'জানি না। *বি* ট্যাঙ্কের কয়েকটা মুমূর্ষু মাছির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল ফর্মুলাটা। বাঁচানো যায়নি একটাকেও।'

'তারমানে যেসব মাছি সুস্থ, শুধু সেগুলোর ওপরই কাজ করছে ওই ফর্মুলা?'

'আপাতত। তবে গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে আছি এখনও। শেষপর্যন্ত কী হয়, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। যে-ফর্মুলা সুস্থ মাছির আয়ু বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেটা নিয়ে আরও গবেষণা করলে হয়তো এমন কিছু আবিষ্কার করা যাবে, যা মুমূর্ষু মাছিকে বাঁচাতে পারবে।'

'প্যানাসেলসাসের সেই মহৌষধ?'

'হ্যাঁ-না কিছু বলার সময় হয়নি এখনও। তবে যুগান্তকারী কিছু-একটা শুরু করতে পেরেছি। আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা: টাকার অভাব। আরেকটা সমস্যা: প্যানাসেলসাসের মতো কোনও মহৌষধ আবিষ্কার করতে হলে যুগের-পর-যুগ গবেষণা করতে হবে আমাকে। অত সময় পাবো না।'

'মেডিকেল কোম্পানিগুলো তোমার গবেষণায় টাকা বিনিয়োগ করছে না কেন?'

তেতো হাসি হাসল সেলেনা। 'কারণ আমার গবেষণার গায়ে অ্যালকেমির সিল পড়ে গেছে। এখনও অনেক মানুষের ধারণা, অ্যালকেমি মানে জাদুটোনা অথবা ভুডু।' ইশারায় দেখাল নিজের চারপাশ। 'একটা বেডরুমকে ল্যাবরেটরিতে রূপান্তরিত করেছি কি সাধে? আমার গবেষণা সিরিয়াসলি নেয়নি কেউই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমার ফর্মুলার কোনও নমুনা আছে এখানে? দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'না, নেই। ও-রকম কোনও ফর্মুলা লিখে রাখার মতো বোকা নই আমি।' তর্জনী দিয়ে নিজের মাথায় টোকা দিল সেলেনা। 'আর কিছু জানার আছে তোমার?'

'আপাতত না। যদি আবারও কোনও ব্রেকথ্রু পাও, ফোন করে জানাবে আমাকে?'

রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সেলেনা, তারপর হেসে ফেলল। 'এই অ্যালকেমিকাল প্রজেক্টের বর্ণনা শুনে এটা হয়তো উত্তেজনাকর মনে হচ্ছে তোমার। আসলে কিন্তু তা নয়। পরের ব্রেকথ্রু পেতে কম-করে-হলেও বছর তিনেক সময় লাগবে।'

এবার হাসল রানাও। 'তা হলে তখনই না হয় ফোন কোরো আমাকে? আমি অপেক্ষায় থাকবো।'

'ঠিক আছে। তোমার ফোন নম্বর দাও।'

রানা চলে গেছে। জে ফক্স এখনও ফেরেনি। হাতঘড়ি দেখল সেলেনা। বছরখানেক প্রায় হয়ে গেল মার্শাল আর্ট শিখছে সে, প্রতি সপ্তাহে তিনটে করে সেশন। আজ ক্লাস আছে।

জে ফক্সের জন্য আর অপেক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নিল সে। খোঁপা খুলে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দিল চুল। ল্যাবকোট খুলে ফেলে একটা ডেনিম জ্যাকেট পরল। স্পোর্টস হোল্ডঅল বের করল নিজের। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা লক করে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ভিড়ভাড় এড়িয়ে যখন এগিয়ে চলেছে ওর ভাড়া-করা ট্যাক্সি, তখন পেছনের সিটে বসে খেয়াল করল, মাসুদ রানার সঙ্গে আজকের ইন্টারভিউ'র কথাগুলো মনে পড়ছে নিজের অজান্তেই।

সেলেনা বরাবরই একটু জেদি। জানে, অন্যায় কিছু করছে না। পারমাণবিক বোমা আর নিত্যনতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার করে অনেক বিজ্ঞানীই দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পাচ্ছেন, সে-পথে পা বাড়ায়নি সে। এমনকী সুপার-পাওয়ার কয়েকটি দেশ বায়োলজিকাল ওয়েপনে সমৃদ্ধ করছে নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার, তাতেও আগ্রহ নেই ওর। সে সবসময় চেয়েছে, মানবতার কল্যাণে কিছু করতে—বিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান যেটার সাহায্যেই হোক না কেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ওকে শুধু চ্যালেঞ্জই করেনি, ওর মুখে চুনকালিও মেখে দিয়েছে। তাই কিছু-একটা করে দেখিয়ে দেয়ার জেদ চেপে বসেছে ওর মনে।

তারপরও নিজেকে নিয়ে কতখানি শঙ্কিত সেলেনা, সে ছাড়া আর কেউ জানে না, দুর্ভাবনায় কখনও কখনও নির্ঘুম কেটে যায় ওর রাত। জে ফক্সও না। ইউনিভার্সিটির চাকরিটা যেদিন চলে গেল, সেদিন ইচ্ছা করলেই ব্যাগ গুছিয়ে কানাডার ফ্লাইট ধরতে পারত সে। কিন্তু কাজটা করেনি। আজ, মাসুদ রানাকে ইন্টারভিউ দেয়ার পর থেকে, বার বার

মনে হচ্ছে, চলে গেলে বোধহয় ভালো হতো। ওর এই আত্মত্যাগের কোনও মানে নেই সম্ভবত।

সেলেনার জমানো টাকা ফুরিয়ে যেতে আর বেশিদিন বাকি নেই। তারপর?

নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চায় না মেয়েটা। কারণ ভবিষ্যৎ সবসময়ই অনিশ্চিত—একজন সম্রাটেরও, একজন ভিখিরিরও। তারপরও, ও জানে, পেট চালানোর তাগিদে অন্যকিছু করতে হবে ওকে। বাচ্চাদের কোনও স্কুলে বিজ্ঞান-শিক্ষিকা হয়ে যাবে হয়তো। বেতনের সামান্য টাকায় কাউকে অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে রাখা যাবে না আর, হয়তো গবেষণাটাও বন্ধ করে দিতে হবে শেষপর্যন্ত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মেয়েটা।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল সেলেনা।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় টের পেল, পা দুটো কেমন ভারী ভারী ঠেকছে। আজকের সেশনটা ক্লান্ত বানিয়ে দিয়েছে ওকে। ফেরার পথে রাশ-আওয়ারের জ্যামের কারণে বিগড়ে গেছে মেজাজ।

পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার লক খোলার সময় টের পেল, ওটা আসলে লক করা নয়।

বার কয়েক চোখ পিটপিট করল সেলেনা। স্পষ্ট মনে আছে ওর, দরজা লক করে বাইরে গিয়েছিল।

জে ফক্স কি ফিরে এসেছিল? স্পেয়ার-কি ব্যবহার করে ঢুকেছিল ভেতরে? এখনও কি ভেতরেই আছে নাকি চলে গেছে? কিন্তু...

আলতো ঠেলা মেরে পাল্লা ফাঁক করল সেলেনা, পা রাখল অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর। তাকিয়ে আছে ল্যাব-রুমের দিকে। ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে ওটার দরজা।

‘জে ফক্স?’ হাঁক ছাড়ল মেয়েটা।

জবাব নেই।

জে ফক্সের কোনও পাত্তাও নেই।

ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকল সেলেনা।

‘ঈশ্বর!’ শব্দটা আপনাআপনি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে।

লণ্ডভণ্ড করে ফেলা হয়েছে সেলেনার বেডরুম-কাম-ল্যাবরেটরি।

ভেঙে ফেলা হয়েছে কাবার্ড, চুরমার করে দেয়া হয়েছে কাচের ট্যাঙ্ক দুটো। হাজার হাজার মাছি এখন ভনভন করছে মেঝেতে, ঘরের দেয়ালে, বন্ধ জানালার কাচে। যেখানে যত ড্রয়ার ছিল সব খুলে ফেলে দেয়া হয়েছে মেঝেতে, ভেতরের জিনিস তন্নতন্ন করে ঘাঁটা হয়েছে।

কিন্তু ঘরের এই বেহাল দশা দেখার জন্য মাত্র একটা মুহূর্ত সময় পেল সেলেনা। তারপরই ওকে মনোযোগ দিতে হলো কালো-হুড-পরা লোকটার ওপর। যে-ভঙ্গিতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে অপরিচিত ওই লোক, তা দেখে নিজের করণীয় স্থির করতে দেরি হলো না ওর।

সেলেনার নাগালের মধ্যে হাজির হলো ওই লোক, মেয়েটাকে সহজ শিকার ধরে নিয়ে প্রথমেই বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি চালাল সে। চোখের পলকে নিচু হলো সেলেনা, এড়িয়ে গেল ঘুসিটা। সোজা হয়ে দাঁড়ানোমাত্র টের পেল, ইতিমধ্যে ব্যালেন্স ফিরে পেয়েছে আগন্তুক। আবারও ঘুসি চালাল লোকটা। মার্শাল আর্টের কায়দায় একটা হাত তুলে ওটা ঠেকাল সেলেনা, অন্য হাত দিয়ে জোরে আঘাত করল ওই লোকের হাতে। আশ্চর্য হলো লোকটা, দ্বিধায় পড়ে গেছে। সুযোগটা নিল সেলেনা, ঝেড়ে একটা লাথি বসিয়ে দিল প্রতিপক্ষের হাঁটুর ওপর। লাথিটা যদি ঠিকমতো লাগত, সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেত এই লড়াই; কিন্তু শেষমুহূর্তে পা

সরিয়ে নিল লোকটা। সেলেনার জুতোর তলাটা তাই শুধু ঘষা খেল লোকটার হাঁটুর সঙ্গে।

ঠিকমতো না লাগলেও বেমক্কা আঘাত—ব্যথায় মৃদু আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, হাঁটু চেপে ধরতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। পতনের ভারী আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল সেলেনা—ছুট লাগাবে সদর-দরজার উদ্দেশে। পারল না—হাত বাড়িয়ে ওর একটা পা চেপে ধরেছে লোকটা। হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল মেয়েটা। তবে তার আগে একদিকের দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে গেছে ওর মাথা, চোখের সামনে হাজারটা তারা দেখতে পাচ্ছে।

যতক্ষণে উঠে দাঁড়াল সে এবং পরিষ্কার হলো ওর ঝাপসা দৃষ্টি, ততক্ষণে একটা ছুরি বের করে ফেলেছে আগন্তুক। সেলেনা দেখল, ছুরি-হাতে সাত কি আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, ডানে-বাঁয়ে দোলাচ্ছে ওটা।

হঠাৎ ছুরিটা উঁচু করে ধরল লোকটা, দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে সেলেনার দিকে। ছুরিটা আমূল গেঁথে দেবে মেয়েটার শরীরে।

বুকের ভেতরে কাঁপন অনুভব করল সেলেনা। মার্শাল আর্ট ক্লাবে রাবারের নকল ছুরি দিয়ে প্র্যাকটিস করেছে ওরা, তা-ও আবার কখনোই জোরে ঘাই মারেনি ওর ক্লাসমেট।

অল্প আলোতেও ঝিলিক দিয়ে উঠল আগন্তুকের ছুরির ধাতব ফলা, জোরে চালিয়েছে সে ছুরিটা। কিন্তু ওর চেয়েও দ্রুত রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখাল সেলেনা। একহাতে চেপে ধরল সে ওই লোকের ছুরিধরা হাতের কব্জি, মুচড়ে দিল; অন্য হাতে জোরে ঠেলা মারল লোকটার একই হাতের কনুইয়ে। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে হাঁটু দিয়ে জোরে গুঁতো মারল লোকটার কুঁচকিতে।

ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে লোকটা।

কাজ হয়েছে। লোকটার কব্জি যেদিকে মুচড়ে দিয়েছে সেলেনা, তার কনুই ধরে টান মেরেছে তার বিপরীতে; কাঁধের হাড় মচকে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল স্পষ্ট। চাপা আর্তনাদ করে উঠল আগন্তুক। মুখোশ পরে আছে লোকটা, তারপরও দুই চোখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্যথার ছাপ। ছুরিটা ছুটে গেছে তার হাত থেকে, বাঁটটা আগে বাড়ি খেল মেঝেতে, ফলাটা তখনও উল্লম্ব ভঙ্গিতে সিধে হয়ে আছে। ওই অবস্থায় ছুরির ওপর পড়ে গেল সে। তার বুক আর পেটের সংযোগস্থলে ঢুকে গেল ছুরি।

আরেকবার আর্তনাদ করে উঠল আগন্তুক।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে সেলেনা, দু'চোখে নগ্ন আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। চিৎ হলো লোকটা, ওর সোলার প্লেক্সাসে আমূল গেঁথে গেছে ছুরিটা। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল সেলেনার দিকে, তারপর দেখল ছুরিটা। এক হাত দিয়ে ধরল ওটার হাতল, টেনে বের করার চেষ্টা করছে ফলাটা। অবর্ণনীয় ব্যথায় কুঁচকে গেছে ওর চোখ-মুখ। কাজটা শেষপর্যন্ত করতে পারল না সে...ব্যথা সহ্য করতে পারছে না সম্ভবত। ছেড়ে দিল ছুরির বাঁট, চিৎ হয়ে পড়ে রইল। তার শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মেঝের টাইলসে।

চোখ বন্ধ করে ফেলল সেলেনা, টের পেল ওর হাঁটু কাঁপছে। কিছুক্ষণ পর যখন চোখ খুলল সে, ততক্ষণে মারা গেছে আগন্তুক। রক্তের একটা ছোটখাটো পুকুর তৈরি হয়েছে মৃতদেহটার একপাশে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লাশটা সেলেনার দিকে, হাঁ হয়ে আছে মুখ।

সেলেনার ভেতর থেকে কেউ একজন যেন চিৎকার করে পালাতে বলছে ওকে। ঘুরে ছুট লাগাতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু জোর খাটিয়ে নিজেকে সংযত করে রেখেছে সে। দুরুদুরু বুকে হাজির হলো লাশটার আরও কাছে, কাঁপা কাঁপা

একটা হাত ঢুকিয়ে দিল আগন্তুকের জ্যাকেটের ভেতরে, হাতড়াচ্ছে। থরথরিয়ে কম্পমান আঙুলগুলো স্পর্শ করল কিছু একটা, ওটা বের করে আনল সে। ছোট একটা ডায়েরি, রক্তে আধভেজা হয়ে আছে। খুলল ওটা, নাম অথবা অন্য কোনও ক্লু'র আশায় পাতা উল্টাচ্ছে। মৃত লোকটার রক্ত যতবার লাগছে ওর আঙুলে, ততবারই শিউরে উঠছে ওর শরীর।

ডায়েরির শেষপাতায় পেন্সিলে-লেখা দুটো ঠিকানা ছাড়া আর তেমন কিছু নেই ওটাতে। একটা ঠিকানা সেলেনার। অন্যটা জে ফক্সের।

মানে?

সেলেনাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার পর জে ফক্সকেও খুন করার দায়িত্ব ছিল আগন্তুকের ওপর? নাকি ফক্সকে শেষ করে দিয়ে সেলেনার মৃত্যু নিশ্চিত করতে এসেছিল লোকটা?

নিজের পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোন বের করল সেলেনা, কণ্ট্যাক্ট লিস্ট ঘেঁটে বের করল ফক্সের ল্যাণ্ডফোন নম্বর। মোবাইল নেই ফক্সের। কল দিল। রিং হচ্ছে, কিন্তু রিসিভ করছে না ফক্স। লাইন কেটে যাওয়ার আগমুহূর্তে শোনা গেল ফক্সের অ্যান্সারিং মেশিনের আওয়াজ।

এখন তা হলে কী করা উচিত সেলেনার?

পুলিশকে ফোন করবে? না, অত সময় নেই হাতে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা, হাঁটছে সদর-দরজার উদ্দেশে। ল্যাণ্ডিং-এ বেরিয়ে এসে দ্বিধা করল দু'সেকেণ্ড, দরজাটা লক করবে কি না ভাবছে। শেষপর্যন্ত লক করে দিল ওটা।

তারপর দ্রুত পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে।

চার

ফক্সের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর বাইরে ব্রেক কষল সেলেনার ট্যাক্সির ড্রাইভার। ভাড়া চুকিয়ে তাড়াহুড়ো করে নামল মেয়েটা গাড়ি থেকে, ছুট লাগিয়েছে বিল্ডিং-এ ঢোকার প্রবেশমুখের উদ্দেশে।

ইন্টারকম প্যানেলের যে-বাটনের পাশে লেখা আছে ফক্সের নাম, সেটাতে পর পর কয়েকবার চাপ দিল সে। টেনশনে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

ফক্সের তরফ থেকে কোনও জবাব নেই।

দু'-তিন মিনিট পর এক কপোত-কপোতী জড়াজড়ি অবস্থায় বেরিয়ে এল বিল্ডিং-এর বাইরে। অটো লক সিস্টেমের দরজা যখন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সেলেনা।

পাথুরে আর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা করিডোরে হাজির হলো সে। গার্ডরুমের দরজা ছাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে করিডোরটা। সিঁড়ির অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে সেণ্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড।

ফক্সের অ্যাপার্টমেন্টটা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। ওর সদর-দরজায় কয়েকবার কিল মারল সেলেনা।

কোনও সাড়া নেই।

গার্ডরুমেও দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

দারোয়ান কোথায়? বাথরুমে গেছে নাকি?

ঘুরল সেলেনা, করিডোর ধরে ছুট লাগাল, হাজির হলো কোর্টইয়ার্ডে। থেমে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। ফক্সের বাথরুমের জানালা কিছুটা খোলা। আবারও ছুটল সেলেনা, হাজির হলো ওই জানালার কাছে। হ্যাঁচকা টানে দু'দিকে সরিয়ে দিল জানালার দুই পাল্লা, তারপর ও-দুটো আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল। হালকাপাতলা শরীরটাকে বিশেষ কায়দায় মুচড়ে ঢুকে পড়ল ফক্সের বাথরুমে।

সেখান থেকে হাজির হলো ফক্সের অ্যাপার্টমেন্টে।

এ-ঘরে সে-ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে সেলেনা, প্রস্তুত হয়ে আছে যে-কোনও জরুরি অবস্থার জন্য। প্রাণের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না আশপাশে কোথাও। যে-টেবিলটা নিজের ডাইনিং-টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে ফক্স, ওটার ওপর দেখা যাচ্ছে একটা খালি কফির কাপ। সঙ্গে একটা প্লেট, ওটাতে শেষ না-করা কিছু খাবার। আরেকটা ডেস্কের ওপর দেখা যাচ্ছে ফক্সের ল্যাপটপ। চলছে ওটা।

তারমানে, ভাবল সেলেনা, হঠাৎ কোনও জরুরি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাই বাইরে গেছে ফক্স। যদি সত্যিই তা-ই হয়, তা হলে এখনও বেঁচে আছে সে।

অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করল সেলেনা। টের পেল, শিথিল হয়ে আসছে ওর টান-টান পেশিগুলো। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসবে ফক্স।

হঠাৎ বেজে উঠল ফক্সের ল্যাণ্ডফোন। চমকে উঠল সেলেনা, আরেকটু হলে লাফ দিত। দু'বার রিং হওয়ার পর চালু হয়ে গেল অটোমেটিক অ্যান্সারিং মেশিন। শোনা গেল ফক্সের সুপরিচিত কণ্ঠ। তারপর, ও-প্রান্ত থেকে, ফরাসি ভাষায় মেসেজ দিল ভরাট একটা পুরুষকণ্ঠ:

'এনযো বলছি। তোমার রিপোর্ট পেয়েছি। সবকিছু প্ল্যান অনুযায়ীই হচ্ছে। আজ রাতে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এম.আর.-

এর।'

থতমত খেয়ে গেছে সেলেনা।

কী হচ্ছে এসব? কীসের রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে? ফক্স কার কাছে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে? যাকে এতদিন বন্ধুর মতো বিশ্বাস করেছে, সে-লোক কি কোনও কারণে...

মাথা নাড়ল সেলেনা। ও-প্রান্তের লোকটা কোন্ প্ল্যানের কথা বলল?

কেঁপে উঠল সেলেনা। প্ল্যান বলতে কি ওকে খুন করার যে-চেষ্টা করা হয়েছিল সেটা বোঝানো হয়েছে?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে ডেস্কের দিকে। স্ট্যাণ্ডবাই মোডে আছে ফক্সের ল্যাপটপ। স্ক্রিনটা তুলল সেলেনা। চালু হয়ে গেল কম্পিউটার।

ডেস্কটপে একটা ই-মেইল আইকন দেখা যাচ্ছে, ওটাতে দু'বার ক্লিক করল সেলেনা। সেন্ট আইটেমে যাওয়ামাত্র মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল ওর। এখানকার প্রতিটা ই-মেইলের সাবজেক্ট বডিতে লেখা আছে: রিপোর্ট। তারিখগুলো খেয়াল করল সে। আজ থেকে কয়েক মাস আগে ওসব ই-মেইল পাঠাতে শুরু করেছে ফক্স। শেষের আগেরটা পাঠিয়েছে কিছুদিন আগে।

শেষ যে-রিপোর্ট পাঠিয়েছে ফক্স, ওটাতে ক্লিক করল সেলেনা। রিপোর্টটা স্ক্রিনে ভেসে ওঠামাত্র পড়তে শুরু করল। টের পেল, হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে ওর। ডেস্ক-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল, ধীর করেছে পড়ার গতি। চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে, তা যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।

নিজের গবেষণায় সম্প্রতি যে-ব্রেকথ্রু পেয়েছে সেলেনা, সে-ব্যাপারে বিশদ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। "এ" ট্যাঙ্কের মাছিদের আয়ুষ্কাল কীভাবে বেড়ে গেছে, খুঁটিনাটি জানানো হয়েছে সে-ব্যাপারে।

আবারও সেন্ট আইটেমে ফিরে গেল সেলেনা।

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো ওর।

সর্বশেষ ই-মেইল পাঠানো হয়েছে আজ, কয়েক ঘণ্টা আগে।

সাবজেক্ট বডি ব্ল্যাঙ্ক; ওটাতে ক্লিক করামাত্র মেসেজটা আবির্ভূত হলো স্ক্রিনে:

মাসুদ রানা নামের এক সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করেছে সেলেনা।

মাথা নাড়ছে মেয়েটা। একেই বোধহয় বলে, ঘরের শত্রু বিভীষণ।

একটা অ্যাটাচমেন্ট দেখা যাচ্ছে ই-মেইলের সঙ্গে। ওটাতে ক্লিক করল সেলেনা।

মাথাটা আবারও ঘুরে উঠল ওর।

কয়েকটা ফটোগ্রাফ...জেপিইজি ফাইলের একটা সিরিজ দেখা যাচ্ছে। প্রতিটা ফটোতে মাসুদ রানার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেলেনাকে।

তারমানে, নিশ্চিত হলো মেয়েটা, এই কাজ ফক্সের। আজ যখন দেখা করতে গিয়েছিল রানা, তখন বিশেষ কোনও একটা ডিভাইস ব্যবহার করে ফটোগুলো তুলেছে সে—টের পায়নি রানা বা সেলেনা। তারপর, পোষা বিড়ালের খাবার কেনার অজুহাতে, সেলেনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরে গেছে। আসলে হাজির হয়েছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে, ফটোগুলো ই-মেইলের সঙ্গে অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিয়েছে জায়গামতো।

আজ রাতে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এম.আর.-এর।

সেলেনা এখন বুঝতে পারছে, ফোন মেসেজে এম.আর. বলতে কার কথা বলা হয়েছে।

হঠাৎ কুঁকড়ে গেল মেয়েটা, ঝট্ করে মুখ ঘুরাল অ্যাপার্টমেন্টের সদর-দরজার দিকে—বাইরের করিডোরে কারও পায়ের-আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শিস বাজাচ্ছে লোকটা। ওই শিস সেলেনার পরিচিত। ল্যাবে যখন কাজ করে, তখন অনেক সময় শিসটা বাজায় ফক্স।

একলাফে চেয়ার ছাড়ল সেলেনা। পরের লাফে গিয়ে লুকাল একটা কাউচের আড়ালে।

দরজার লকে চাবি ঢোকানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর পাওয়া গেল তালা খোলার শব্দ।

দম নিতেও ভয় পাচ্ছে সেলেনা।

ঘরে এসে ঢুকেছে ফক্স। ওর একহাতে একটা শপিংব্যাগ। এখনও শিস বাজাচ্ছে। যা যা কিনেছে, সেগুলো বের করছে ব্যাগের ভেতর থেকে, রাখছে একটা টেবিলের ওপর। কাজ শেষ হওয়ার পর এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। রেকর্ড বাজিয়ে মেসেজ শুনছে।

কাউচের আড়াল থেকে মাথাটা একটুখানি বের করল সেলেনা, তাকিয়ে আছে ফক্সের দিকে, দেখছে লোকটার চেহারা। আবেগের কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই ফক্সের মুখভাবে। পুরো মেসেজ শুনল, তারপর শুধু মাথা ঝাঁকাল।

যা ঘটছে, তা এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না সেলেনার। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা যে আসলেই ফক্স, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সেই জলজ্যান্ত সত্যটাকে। আড়াল ছেড়ে বের হয়ে হামলা চালাবে কি না, ভাবল। কিন্তু বাতিল করে দিল চিন্তাটা। যে-মানুষ এতদিন গোবেচারা সেজে থেকে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে সেলেনার ওপর, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা অসম্ভব না। তা ছাড়া ফক্সের ওপর হামলা হলে সতর্ক হয়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষ।

অ্যান্সারিং মেশিনে কী যেন করছে ফক্স। সম্ভবত একটু আগে আসা মেসেজটা ডিলিট করছে। কাজ শেষে এগিয়ে গেল ঘরের একদিকের জানালার কাছে, খুলে দিল ওটা। ফিরে এল টেবিলের কাছে, সবে কিনে-আনা একটা বিয়ারের বোতল নিয়ে বসে পড়ল টিভি'র মুখোমুখি। রিমোট নিল হাতে। খেলার একটা চ্যানেল খুলল। খেলা দেখার ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দিচ্ছে বিয়ারের বোতলে।

মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করল সেলেনা, হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। এগিয়ে যাচ্ছে বাথরুমের দিকে। একসময় ঢুকে পড়ল সেখানে, সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে শেষবারের মতো তাকাল ফক্সের দিকে। খেলা দেখায় মগ্ন।

নিঃশব্দে লাগিয়ে দিল সেলেনা বাথরুমের দরজাটা। এগিয়ে গেল জানালার দিকে।

কসরত করে বাইরে বেরিয়ে আসতে বেশি সময় লাগল না ওর।

খেলা দেখছে ঠিকই ফক্স, কিন্তু আসলে টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে শুধু, আনমনা হয়ে ভাবছে এনযোর মেসেজটা নিয়ে। ভাবছে এনযোর কথা।

মাস কয়েক আগে ফক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে এনযো। ওই লোকের ওই একটা নামই জানে ফক্স। নামের অন্য কোনও অংশ জানে না, নামটা আসল নাকি নকল তা-ও জানে না। লোকটার আসল উদ্দেশ্যও পরিষ্কার না ওর কাছে। ওকে শুধু বলা হয়েছে, চোখে-চোখে রাখতে হবে সেলেনা বার্নহার্টকে, মেয়েটার প্রতিটা গতিবিধির খবর পাঠিয়ে দিতে হবে নির্দিষ্ট একটা ঠিকানায়। বিনিময়ে, সময়ে সময়ে, টাকাভর্তি একটা খাম চলে আসবে ফক্সের ঠিকানায়।

এবং, এখন পর্যন্ত, প্রতিবার রিপোর্ট পাঠানোর দু'-

একদিনের মধ্যেই টাকা পেয়ে গেছে ফক্স।

হেসেখেলে জীবনটা উপভোগ করার জন্য ওর দরকার টাকা—সেটা যে-পথেই আসুক না কেন। ল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে সামান্য যে-বেতন পায় সেলেনার কাছ থেকে, তা দিয়ে প্যারিসের মতো শহরে চলা মুশকিল। আর কিছুদিন পর মেয়েটা বেতন দিতে পারবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে ফক্সের মনে। কাজেই...

সেলেনার সহকারীর চাকরিটা ছেড়ে দিত ফক্স। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল ওই ব্যাপারে। কথাটা যেদিন সেলেনাকে জানিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছিল, তার দু'দিন আগে যোগাযোগ করল এনযো।

এখন দ্বিতীয় চাকরিটা ভালোই লাগে ফক্সের। ইন্টারেস্টিং মনে হয়। এনযোর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করে। যে-লোক সামান্য একটা কাজের জন্যে এত টাকা দিতে পারে, তার অধীনে স্থায়ী কোনও চাকরি করলে নিশ্চয়ই আরও অনেক টাকা বেতন পাওয়া যেত।

একসময় সেলেনার সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল ফক্সের, এখন আর মেয়েটাকে ভালো লাগে না ওর। যে কম বেতন দেয় এবং যে হয়তো একসময় আর বেতন দিতে পারবে না, তাকে ভালো লাগবে কেন? এখন ফক্সের শুধু ভালো লাগে ওর মেইলবক্সে-আসা টাকাভর্তি মোটা-মোটা খামগুলো।

রোমের অভিজাত এক এলাকার আলিশান এক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ অবস্থিত একটা ঘরে বসে আছে দু'জন লোক, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

তাদের একজন বেশ লম্বা-চওড়া। তার চেহারা দেখলে মনে হয়, শুধু কর্তৃত্ব করার জন্যই এসেছে এই পৃথিবীতে। নাম উসবিলিয়ানো মাতিমাসি। সঙ্গে আছে তার প্রাইভেট

সেক্রেটারি স্যাভিও ফ্যারেনি।

'এখন আমাদের যা অবস্থা,' বলল মাতিমাসি, 'আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা সংগঠনে পরিণত হবো আমরা।'

স্ফটিকের একটা গ্লাস থেকে একচুমুক মদ খেল ফ্যারেনি। 'আমরা এখনই প্রচণ্ড শক্তিশালী। যদি আরও বড় আর আরও শক্তিশালী হই, আমাদের আশপাশে যারা থাকবে, তাদের কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবো কীভাবে?'

'আমার প্ল্যান যদি কাজে লেগে যায়, লুকিয়ে থাকার আর দরকার হবে না আমাদের। শুধু গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে চুপচাপ আছি আমরা, অন্যকিছু না।'

মাতিমাসির সবচেয়ে কাছের লোক ফ্যারেনি। দু'জনেরই বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই করছে। দু'জনই একে অপরকে অনেক বছর ধরে চেনে।

যুবক বয়সে দেখা হয়েছিল ওদের দু'জনের। মাতিমাসি তখন একজন যাজক। যদিও তার স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ একেবারেই অন্যরকম। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অঢেল টাকা তখন তার হাতে।

তার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের পর ফ্যারেনি টের পায়, কোনও একটা মতলব আছে এ লোকের মনে। কিন্তু সে-ব্যাপারে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করেনি সে মাতিমাসিকে, বরং দু'জনের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা এগিয়ে যেতে দিয়েছে। সময় গড়িয়েছে, মাতিমাসির ক্ষমতা বেড়েছে। আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এবং একসময় ফ্যারেনি টের পেয়েছে, যে-লোকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বের, কখন যেন প্রভুসুলভ আচরণ শুরু করেছে লোকটা। যেন হঠাৎ করেই নির্মম হয়ে গেছে, কোনও বাধা না-মানার প্রতিজ্ঞা করেছে।

ফ্যারেনি টের পেয়েছে, ইতিমধ্যে ভয় পেতে শুরু করেছে সে মাতিমাসিকে।

মাতিমাসির সামনে কারুকার্যখচিত একটা অ্যান্টিক টেবিল আছে এখন, ওটার ওপর চলছে ওর ল্যাপটপ। স্লাইডশো দেখা যাচ্ছে ওই কম্পিউটারে—সুগঠিত শরীর আর ধারালো চেহারার এক যুবকের সঙ্গে কথা বলছে একটা মেয়ে।

এতক্ষণে কি মরে গেছে মেয়েটা? সে-রকমই কথা ছিল।

ওই মেয়ে মাতিমাসির মাথাব্যথার কারণ নয়। ওর মাথাব্যথার কারণ মেয়েটার সঙ্গের ওই দক্ষিণ এশীয় সঙ্গী। ইতিমধ্যে খবর চলে এসেছে মাতিমাসির কাছে, যে-কাজে হাত দেয় বাংলাদেশী লোকটা, সেটা শেষ না করে ছাড়ে না—সে-রকম নজির নেই। যে-কোনও কেসে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে ওই লোক এবং তার গড়ে তোলা এজেন্সি। নিজেকে সে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়েছে সেলেনার কাছে, কিন্তু সেটা আসলে ভুয়া। প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার অনেক রেকর্ড আছে তার। বেশিরভাগ সময় একা কাজ করে, অন্য কারও সাহায্যের তেমন ধার ধারে না।

লোকটার নাম মাসুদ রানা।

ইনফর্মার সতর্ক করেছে মাতিমাসিকে, স্পেশালিস্ট ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে রানার। আছে এমন কিছু গুণ, যা সাধারণ লোক তো পরের কথা, আর দশজন স্পেশালিস্টের মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর। কথাটা মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে মাতিমাসি। রানার পিছু নিয়ে ওকে নিরালা কোনও জায়গায় শেষ করে দেয়ার জন্য একজন গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছিল সে, এখন মর্গে আছে সেই ঘাতকের লাশ। খবর এসেছে, নটরডেম ক্যাথেড্রালের প্যারাপেট থেকে দু'শ' ফুট নিচের রাস্তায় আছড়ে পড়েছিল বেচারা।

মরার আগে কোনও রিপোর্ট করেনি লোকটা। মাসুদ রানার সঙ্গে আদৌ দেখা হয়েছিল কি না তার, জানে না মাতিমাসি। জানে না, তার লোক রানাকে শেষ করতে গিয়ে

উল্টো রানার হাতে শেষ হয়েছে কি না।

কিন্তু এসব নিয়ে আসলে তেমন একটা চিন্তিত নয় মাতিমাসি। কারণ সে নিশ্চিত, বেশিদূর যেতে পারবে না মাসুদ রানা।

'আর্চবিশপ...' মাতিমাসির টাইটেল ধরে ডাকল ফ্যারেনি, কিছু একটা বলতে চাইছে কিন্তু শেষ করল না কথাটা, নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছে।

'বলো।'

'আমরা যা করছি তার জন্য কি ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করবেন?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্যারেনির দিকে তাকাল মাতিমাসি। 'অবশ্যই করবেন। আমরা যা করছি, তাঁরই ইচ্ছায় করছি।'

ফোনের দিকে হাত বাড়াল সে।

সোফায় হেলান দিল ফ্যারেনি। সে জানে, মাতিমাসি যা বলল, তা সত্য নয়। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য মগজধোলাই ছাড়া আর কিছু করছে না সে সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের।

পাঁচ

একটা ট্যাক্সিতে উঠে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে খেয়াল করল সেলেনা, হাত-পা কাঁপছে ওর।

বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে, ওর পিছু নিয়েছে কি না ফক্স, নিশ্চিত হতে চাইছে সে-ব্যাপারে।

না, থ্রিলার কোনও মুভির মতো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে ছুটে বের হয়নি লোকটা—ওর হাত ফস্কে সেলেনা চলে যাচ্ছে দেখে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে খুঁজে বের করেনি কোনও ভেহিকেল, তারপর সেটা নিয়ে ধাওয়া করতে শুরু করেনি মেয়েটাকে। হয়তো এখনও নিজের অ্যাপার্টমেন্টেই আছে ফক্স, বিয়ারের বোতলে চুমুক দিতে দিতে খেলা দেখছে।

মোবাইল ফোন বের করল সেলেনা, যোগাযোগ করল প্যারিস পুলিশের ইমার্জেন্সি নম্বরে।

'একটা হত্যাপ্রচেষ্টার রিপোর্ট করতে চাই আমি,' বলল সে। 'আমার অ্যাপার্টমেন্টে একটা লাশ পড়ে আছে।'

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিল সে। সে-বর্ণনা শুনে বড় হয়ে গেল ট্যাক্সি ড্রাইভারের চোখ। লোকটা যতক্ষণে সেলেনাকে ওর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর নিচে পৌঁছে দিল, ততক্ষণে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের দুটো গাড়ি চলে এসেছে সেখানে।

ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্বে আছে সাদা-পোশাকের কর্মচঞ্চল এক ইন্সপেক্টর। লোকটার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মত হবে। মাথাভর্তি কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে রেখেছে। সবুজ দুই চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

'আমি অ্যাল মার্লো,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেলেনার দিকে। 'আপনিই কি ঘটনাটা রিপোর্ট করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনিই সেলেনা বার্নহার্ট?'

'হ্যাঁ।'

'কানাডার নাগরিক? আইডেন্টিফিকেশন আছে?'

'আছে।' ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে পাসপোর্ট আর ওয়ার্ক ভিসা বের করল সেলেনা, দেখাল মার্লোকে।

ওগুলো দেখে ফেরত দিল ইন্সপেক্টর।

‘আপনার নামের আগে *ডক্টর* আছে। তারমানে আপনি কি ডাক্তার?’

‘না। বায়োলজিস্ট।’

‘ও। চলুন, ক্রাইম সিন দেখি।’

সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা। মার্লো যেন আরও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে বার বার। শক্ত হয়ে আছে ওর চোয়াল। ওর পিছনে আছে পুলিশের আধ ডজন অফিসার এবং পুলিশের একজন ডাক্তারের অধীন একটা প্যারামেডিক টিম। ডাক্তার লোকটার হাতে একটা মেডিকেল কেস আছে।

‘ক্রাইম সিন দেখা হলে ঘটনাটা সম্পর্কে আপনার পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি নেবো আমরা,’ সেলেনাকে বলল মার্লো। ‘ওপরে কে আছে এখন?’

‘ওই লোক ছাড়া কেউ না।’

‘ওই লোক?’

‘মানে...লাশটা আর কী।’

‘তারমানে লাশটা ঘাঁটাঘাঁটি করেননি আপনি?’

মাথা নাড়ল সেলেনা।

‘অ্যাপার্টমেন্টে একটা লাশ রেখে বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন?’

‘এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।’

‘কে সে?’

জবাব দিল না সেলেনা।

‘ঠিক আছে, এসব নিয়ে পরে কথা বলবো। আগে লাশটা দেখা দরকার।’

সদর-দরজার দিকে এগিয়ে গেল সেলেনা, লক খুলে আলতো ঠেলা দিল পাল্লায়। তাকাল মার্লোর দিকে। ‘আমি যদি বাইরে অপেক্ষা করি, কিছু মনে করবেন?’

ধাক্কা মেরে দরজার পাল্লা পুরো খুলে ফেলল মার্লো।

‘লাশটা কোথায়?’

‘হলওয়েতে,’ বলল সেলেনা।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল মার্লো। ওর পিছন পিছন যাচ্ছে পুলিশের অফিসাররা আর প্যারামেডিক টিমটা। একজন অফিসার সেলেনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকল ল্যাণ্ডিং-এ।

দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। ভীতিকর ঘটনাটা ভুলবার আশায় বন্ধ করে ফেলেছে দুই চোখ।

কিছুক্ষণ পর ল্যাণ্ডিং-এ শোনা গেল কারও পদশব্দ। চোখ খুলল সেলেনা।

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মার্লো। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে গেছে লোকটার। ‘আপনি কি নিশ্চিত এটা আপনার অ্যাপার্টমেন্ট?’

আশ্চর্য হলো সেলেনা। ‘হ্যাঁ। কেন?’

‘স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়া, মৃগীরোগ অথবা অন্য কোনও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন না তো আপনি?’

‘কী বলছেন এসব!’

‘ড্রাগস বা মাত্রাতিরিক্ত মদ্য খাওয়ার বদভ্যাস আছে আপনার?’

‘আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, ইন্সপেক্টর।’

হাত বাড়িয়ে সেলেনার একটা হাত ধরল মার্লো, মেয়েটাকে নিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে। ‘এবার বলুন কী বলার আছে আপনার।’

হাঁ হয়ে গেছে সেলেনা।

হলওয়ের যেখানে পড়ে ছিল লাশটা, সে-জায়গা এখন শূন্য। এমনকী এক ফোঁটা রক্তের দাগও নেই।

‘বলুন,’ মার্লোর কণ্ঠে বিরক্তি, ‘এসবের মানে কী?’

‘হয়তো...হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেছে লোকটা।’

‘এবং যাওয়ার সময় সযত্নে মুছে দিয়ে গেছে রক্তের সব দাগ? আপনার কথামতো গুরুতর আহত হওয়ার পরও?’

জবাব দিল না সেলেনা। চোখ কচলাচ্ছে, মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁপা লাগছে ওর।

কঠোর দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল মার্লো। 'পুলিশের সময় নষ্ট করাটা গুরুতর একটা অপরাধ। ইচ্ছা করলে এখনই গ্রেপ্তার করতে পারি আমি আপনাকে।'

'কিন্তু হলওয়েতে ছিল লাশটা,' এমন ভঙ্গিতে বলল সেলেনা, দেখে মনে হলো যেন ফুঁসে উঠেছে। 'আমি কোনও গল্প বানাইনি, কোনওকিছু কল্পনা করিনি। একটা লোক সত্যিই...'

'থামুন! আপনার কথা-অনুযায়ী ওই লোকের সোলার প্লেক্সাসে আমূল ঢুকে গেছে একটা ছুরি, মরার আগে নিজের আশপাশে রক্তের পুকুর বানিয়ে ফেলেছিল সে। ...কোথায় সেই পুকুর? আর ওই লোকই বা কোথায়?'

'জানি না,' অসহায় বোধ করছে সেলেনা। 'বিশ্বাস করুন...'

মেয়েটার ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মার্লো, তাকাল নিজের এক লোকের দিকে। 'আমার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে এসো।' আবার তাকাল সেলেনার দিকে, অবজ্ঞার দৃষ্টি দেখা দিয়েছে চোখে। 'তা হলে কোথায় গেল লোকটা? আপনার ভয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে?'

জবাব দিল না সেলেনা।

নিজের লোকদের দিকে তাকাল মার্লো। 'তল্লাশি করো এই অ্যাপার্টমেন্ট। মিস বার্নহার্টের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলো। ওদের কেউ কিছু শুনেছে কি না, জানার চেষ্টা করো।'

মার্লোর কয়েকজন অফিসার এমন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সেলেনার দিকে, যেন এইমাত্র পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটা। অসহায়ত্বের অনুভূতিটা আবার গ্রাস করছে মেয়েটাকে।

কয়েকজন অফিসার ছড়িয়ে পড়ল অ্যাপার্টমেন্টের

ভেতরে। এটা-সেটা উল্টেপাল্টে দেখছে ওরা, ঘাঁটাঘাঁটি করছে সেলেনার ব্যক্তিগত কিছু জিনিস। দু'জন অফিসার বেরিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, সেলেনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলবে।

'আপনি বলেছেন,' মেয়েটাকে বলছে মার্লো, 'যে-লোক হামলা করেছিল আপনার ওপর সে নাকি খুবই স্বাস্থ্যবান—যেমন লম্বা তেমন চওড়া। বলেছেন, লোকটার কাছে নাকি একটা ছুরি ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি একে তো মেয়েমানুষ, আবার তেমন লম্বাও না—পাঁচ ফুট পাঁচও হবেন কি না সন্দেহ; তারপরও ছুরিওয়ালা এক শক্তিশালী পুরুষ কিছুই করতে পারল না আপনার?'

'না, পারেনি,' বিরক্তি বোধ করছে সেলেনা। পুলিশে খবর দেয়ার মতো নাগরিক দায়িত্ব পালন করায় নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে ওর।

'আপনাকে খুন করতে এসে ওই লোক নিজেই খুন হয়ে গেল?'

'এক মিনিট,' বাধা দেয়ার কায়দায় হাত তুলল সেলেনা, 'ভুল হচ্ছে আপনার। আমি কিন্তু একবারও বলিনি, লোকটা খুন হয়েছে আমার হাতে। নিজের ছুরির ওপর নিজেই উল্টে পড়েছে সে, আর তখন খাড়া অবস্থায় ছিল ছুরিটা। এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই না।'

'কী করতে এসেছিল সে?'

'চুরি ছাড়া আর কী? আমার ল্যাবের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে লোকটা।'

'ল্যাব?'

'কেন, এখনও কি বুঝতে পারেননি?' তর্জনীর ইশারায় ল্যাবরেটরিটা দেখিয়ে দিল সেলেনা, তারপর এগিয়ে গিয়ে

ঠেলা মেরে খুলে দিল ওটার দরজা।

ল্যাবের ভেতরটা দেখে আরেকবার হাঁ হতে হলো ওকে।

কাবার্ড, কাচের ট্যাঙ্ক আর শত শত মাছি বাদে আগের মতো হয়ে গেছে ল্যাবরেটরিটা—যেটা যেখানে রাখা ছিল, সেটা ঠিক সেখানেই রাখা আছে।

'বারোটা কীভাবে বাজল, বুঝিয়ে বলবেন?' মার্লোর কণ্ঠে বিদ্রূপ।

ল্যাবের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল একজন পুলিশ-অফিসার। 'স্যর, মিস বার্নহার্টের প্রতিবেশীদের কেউই কোনও অস্বাভাবিক আওয়াজ শোনেননি আজ।'

অবজ্ঞায় নাক টানল মার্লো, ল্যাবের ওপর নজর বুলাচ্ছে। একধারের একটা টেবিলের ওপর রাখা একটা ম্যাগাযিন দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর, এগিয়ে গিয়ে ওটা হাতে নিল সে। 'কী এটা?' পাতা উল্টাচ্ছে। 'আপনার একটা আর্টিকেল দেখি ছাপা হয়েছে এই ম্যাগাযিনে! কী যেন শিরোনাম আর্টিকেলের? *অ্যালকেমি—নতুন এক বিজ্ঞান*। মানে?'

'মানে...আগেও বলেছি...আমি একজন বিজ্ঞানী।'

'ও। অ্যালকেমি তা হলে এখন বিজ্ঞান হয়ে গেছে? আপনি তা হলে সীসাকে সোনা বানিয়ে ফেলতে পারেন?'

'এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি না আমি।'

হা-হা করে হেসে উঠল মার্লো। 'আপনি সীসাকে সোনা বানিয়ে ফেলতে পারেন কি না জানি না, কিন্তু মানুষকে যে গায়েব করে ফেলতে পারেন, সে-ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত।' ম্যাগাযিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের ওপর।

কিছু বলল না সেলেনা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পুলিশের ডাক্তার ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ল্যাবের দোরগোড়ায়। এসেছে কয়েকজন অফিসারও। তাদের সবাই

মাথা ঝাঁকাচ্ছে—যেন সমর্থন করছে মার্লোকে।

সেলেনা টের পাচ্ছে, শত্রুভাবাপন্ন কয়েক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আপনার কফি, স্যর।'

সহকারীর কাছ থেকে ওয়ান-টাইম কাপটা নিয়ে এক চুমক কফি খেল মার্লো। সেলেনাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বিবাহিত? না হয়ে থাকলে বয়ফ্রেণ্ড আছে?'

'না, এখনও বিয়ে করিনি আমি। বয়ফ্রেণ্ড ছিল একসময়, ব্রেকআপ হয়ে গেছে। ...এই অ্যাপার্টমেণ্টে যা ঘটেছে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে বা বয়ফ্রেণ্ডের সম্পর্ক কী?'

'আমার মনে হয় আপনি সাংঘাতিক একাকীত্বে ভুগছেন, মিস বার্নহার্ট,' মার্লোর কণ্ঠটা শোনাল উপদেশ দেয়ার মতো। 'বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ব্রেকআপ হয়ে যাওয়ায় মনে ভীষণ চোট পেয়েছেন, এবং সেটা সামলাতে পারছেন না। তাই এমন সব ঘটনা কল্পনা করছেন, যা আসলে ঘটেইনি।'

'কী বলতে চাইছেন? নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে আমার?'

জবাব দিল না মার্লো, শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হলো সেলেনার, চিৎকার করে কিছু-একটা বলতে চাইল সে। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'দেখুন, আমার মনে হয় আরেকজন লোককে খুন করতে চাইছে ওরা।'

'কারা?'

'যারা আমার ওপর হামলা করেছিল।'

আরেকবার হা-হা করে হাসল মার্লো। 'সেক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি, আপনার কল্পিত শত্রুরা যাকে খুন করতে চাইছে, সে-লোক আপনার মতোই নিরাপদে আছে।' হঠাৎ কঠোর হয়ে গেল ওর চেহারা, একচুমুকে কাপের সব কফি শেষ করে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। 'মিস বার্নহার্ট, আবারও যদি কখনও পুলিশে খবর

দেন, আগে দশবার ভাববেন, তারপর করবেন কাজটা। কারণ পরেরবার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট নিয়ে আসবো আমি—আগে নিশ্চিত হবো আপনি কোনও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন কি না, তারপর শুনবো আপনার গল্প। দরকার হলে খবর দেবো ইন্টারপোলে, আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে কানাডার-জীবন পর্যন্ত সব জেনে নেবো ওদের সাহায্যে। বুঝতে পেরেছেন?'

ঢোক গিলল সেলেনা, অজানা কোনও ভয় গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে আস্তে আস্তে।

'পরেরবার যদি খামোকা পুলিশে খবর দেন,' হুমকি দেয়ার সুরে বলছে মার্লো, 'আপনার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবো।' ইশারা করল সঙ্গীদের উদ্দেশে, ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হলওয়েতে এখন একা দাঁড়িয়ে আছে সেলেনা। ওর মনে হচ্ছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে সে। চোট পেয়েছে মনে, একইসঙ্গে আশ্চর্য হয়েছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর অ্যাপার্টমেন্টের সদর-দরজার দিকে। পুলিশের অফিসাররা নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে, শুনতে পাচ্ছে সে-আওয়াজ।

কী করবো আমি? মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

আজ রাতে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এম.আর.-এর।

মাসুদ রানার জন্য খারাপ লাগছে সেলেনার। বেচারা! সরল মনে ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল। কল্পনাও করতে পারেনি, কত বড় চক্রান্তের জালে ফেঁসে গেছে। কিছুই টের পাবে না লোকটা, তার আগেই ওকে...

রানাকে সতর্ক করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সেলেনা। এবং এই কাজে পুলিশের কোনওরকম সাহায্য

নেয়া যাবে না। পুলিশ আর বিশ্বাস করবে না ওকে। যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে চলেছে, রানার সঙ্গে দেখা করে সব বলবে সেলেনা।

ওর মনে পড়ে গেল, ওকে নিজের ফোন নম্বর দিয়েছে রানা।

মোবাইলের কণ্ট্যাক্ট লিস্ট ঘেঁটে নম্বরটা বের করল সেলেনা।

প্যারিসে অপেরা কোয়ার্টার নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে রানা। সেলেনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে চ্যাভিস লরেমকে ফোন করেছিল, অপেরা কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি পাঠাতে বলেছে।

হোটেল ছেড়ে রাত সোয়া আটটার দিকে বেরিয়েছে ও। দূরত্ব বেশি না, তাই পথের পুরোটাই হেঁটেছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। সময়মতো হাজির হয়ে গেল একটা মার্সিডিয লিমাযিন। ইউনিফর্ম পরিহিত ড্রাইভার নামল গাড়ি থেকে, রানার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'মসিয়ে রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

লিমাযিনের পেছনের দরজা খুলে ধরল ড্রাইভার।

গাড়িতে উঠে পড়ল রানা।

লিমাযিন চলছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা।

প্যারিস অপরিচিত না ওর কাছে, তারপরও কখনও ডানে কখনও বাঁয়ে তাকিয়ে দেখছে যতটুকু দেখা যায়। উদ্দাম আরেকটা রাত শুরু হয়েছে প্যারিসের বুকে। শহরতলী ছাড়িয়ে আসার পর আলো আর কোলাহল দুটোই কমল।

গাড়িটার বয়স বেশি না। বলতে গেলে নিঃশব্দে চলছে ইঞ্জিন। শহরতলী ছাড়িয়ে শুরু হয়েছে সরু কান্ট্রি লেন।

অপর্যাপ্ত স্ট্রিট ল্যাম্পের কারণে রাস্তার এখানে-সেখানে যেন জমাট বেঁধেছে অন্ধকার। ঝোপ আর গাছের সারি দেখা যাচ্ছে দু'ধারেই। এই এলাকায় বাড়িঘরের বিস্তার ঘটেছে বিক্ষিপ্তভাবে। লিমাযিনের আলোয় কখনও কখনও ঝিলিক দিয়ে উঠছে রোডসাইড বার।

চ্যাভিস লরেমের কথা ভাবছে রানা। কী অদ্ভুত নাম লোকটার! তবে তিনি নিঃসন্দেহে একজন সফল প্রকাশক। কারণ পয়সাওয়ালা ছাড়া অন্য কেউ মার্সিডিয লিমাযিন কেনে না। আবার, হতে পারে, উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক টাকা পেয়েছেন তিনি। প্রকাশনার ব্যবসাটা তাঁর পেশা না হয়ে শখও হতে পারে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। লরেমের দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী, কোর্ট দ্য ব্রিগন্যান গ্রামটা আর বেশি দূরে নেই। লিমাযিনের গতি কমছে। ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে গাড়ির উইণ্ডশিল্ড দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল রানা। ওরা কোনও গ্রামে হাজির হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আশপাশে কোনও বাড়িও দেখা যাচ্ছে না।

হেডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে অনতিদূরের একটা রোড সাইন:

ডেঞ্জার! লেভেল ক্রসিং!

কাঠের ব্যারিয়ারগুলো আপাতত খাড়া হয়ে আছে। তারমানে ওগুলোর নিচ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে গাড়ি।

লিমাযিনটা মসৃণ গতিতে চালিয়ে রেললাইনের ওপর উঠল ড্রাইভার, তারপর হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্যাশবোর্ডের একদিকে কয়েকটা বাটন আছে; চাপ দিল একটা বাটনে। মুহূর্তের মধ্যে সচল হলো লিমাযিনের সেণ্ট্রাল লকিং সিস্টেম। মৃদু বোঁ-বোঁ আওয়াজ শোনা গেল, মোটা গ্লাসের একটা পার্টিশন চলে এল রানার সামনে, ওর আর

ড্রাইভারের মাঝখানে তৈরি হলো স্বচ্ছ একটা আড়াল।

'এই যে,' পার্টিশন-গ্লাসে জোরে টোকা দিল রানা, 'কী হচ্ছে?'

লিমাযিনের সাউণ্ডপ্রুফ কম্পার্টমেন্টের ভেতরে নিজের কণ্ঠ কেমন ফাঁপা শোনাল রানার কানে।

ড্রাইভারের কোনও বিকার নেই।

রানা জানে দরজা লক হয়ে গেছে, তারপরও ওর দু'দিকের দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে খামোকাই টানাটানি করল কিছুক্ষণ। 'থামলে কেন?' চেঁচাল ড্রাইভারের উদ্দেশে।

জবাব দিল না লোকটা, এমনকী ঘাড় ঘোরানোর প্রয়োজনও বোধ করল না। ইগনিশন বন্ধ করে দিল। নিভে গেল গাড়ির হেডলাইট। নিজের ঠিক পাশের দরজাটা খুলল সে, জ্বলে উঠল গাড়ির ইণ্টার্নাল লাইট। রানা খেয়াল করল, যে-গ্লাস পার্টিশন বন্দি করে ফেলেছে ওকে, স্টিলের রিইনফোর্সমেণ্ট আছে সেটাতে; আরও আছে জড়াজড়ি-করে-থাকা কিছু তার।

ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে নেমে গেল ড্রাইভার, তারপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। নিভে গেল ইণ্টার্নাল লাইট। পকেট থেকে একটা টর্চলাইট বের করল লোকটা, জ্বালাল। অন্ধকার ফুঁড়ে কিছুদূর এগিয়ে গেল ওটার সরু রশ্মি। কিছু একটা খুঁজছে মনে হয় লোকটা, যানবাহনশূন্য রাস্তা ধরে ধীর পায়ে হাঁটছে। এদিকওদিক দোলাচ্ছে টর্চটা, ফলে এক-জায়গায় স্থির থাকছে না ওটার আলো। কম্পমান সে-আলোয় কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কালো একটা গাড়ি—পার্ক করা আছে রাস্তার ডানধারে, লেভেল ক্রসিং থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে। ড্রাইভার লোকটা ওই গাড়ির কাছাকাছি যাওয়ামাত্র জ্বলে উঠল ওটার টেইললাইট, খুলে গেল পেছনের একদিকের দরজা। সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা।

গ্লাস পার্টিশনে সজোরে কিল মারল রানা। কিছুই হলো না। ওর দু'দিকের জানালার টিন্টেড কাচে একই কায়দায় হামলা চালাল, ফল আগের মতোই।

স্টার্ট নিল অনতিদূরের কালো গাড়িটা, রওয়ানা দিল।

আবারও দু'দিকের দরজায় নিষ্ফল হামলা চালাল রানা। দম-বন্ধ-করা একটা অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ওর ভেতরে, জোর করে শান্ত রেখেছে নিজেকে। জানে, এই কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরোনোর কোনও-না-কোনও উপায় নিশ্চয়ই আছে।

গাড়ির বাইরে থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল। ঘণ্টা বাজছে। সে-শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু যান্ত্রিক কোলাহল। রেললাইনের দু'পাশে কাঠের সেই ব্যারিয়ারগুলো নামতে শুরু করেছে। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা, তবে অনুমান করতে পারছে কী ঘটতে চলেছে। রেললাইনের ওপর নিথর দাঁড়িয়ে আছে লিমাযিন, ব্যারিয়ারগুলোর মাঝখানে আটকা পড়তে চলেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে।

একটা ট্রেন ধেয়ে আসছে লিমাযিনের দিকে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটতে চলেছে ভয়াবহ একটা সংঘর্ষ। চুরমার হয়ে যাবে লিমাযিন, মারা পড়বে রানা।

কালো গাড়িটা চালাচ্ছে মোটা এক লোক। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে লিমাযিনের সেই ড্রাইভারের দিকে। 'সব ঠিক আছে?'

মাথা থেকে শোফারের-ক্যাপ খুলল লিমাযিনের ড্রাইভার। 'হুঁ।'

'তা হলে চলো একদফা বিয়ার হয়ে যাক।'

'ঠিক আছে, চলো।'

'নাকি একটু দেরি করবো?' বলল গাড়ির ভেতরে থাকা

তৃতীয় একজন। 'নিজেদের চোখে চুরমার হতে দেখবো না লিমাযিনটা? লোকটা যে মরেছে, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবো না?' নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাল নিজের হাতঘড়ির দিকে।

গাড়ি থামাল মোটা লোকটা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তৃতীয় লোকটা। লিমাযিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী দরকার?' বলল মোটা লোকটা। 'এখন মাসুদ রানাকে বাঁচানোর ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই। কাজেই গলা ভেজাতে দেরি করবো কেন আমরা?'

'ঠিক আছে তা হলে,' বলল তৃতীয় লোকটা। 'গাড়ি আগে বাড়াও।'

এক্সেলারেটরে পা দাবাল মোটু। 'আর দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই হাজির হয়ে যাবে ট্রেনটা। তারপর...'

অন্ধকার সয়ে গেছে রানার চোখে। লিমাযিনের একদিকের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে তারাখচিত আকাশটা। রেললাইনের একদিকে দেখা দিয়েছে ধেয়ে-আসা ট্রেনের হেড-লাইট, যেন নিজেরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে সেটা। ইস্পাত-লাইনের ওপর ঘুরন্ত ট্রেনের-চাকার কারণে কম্পন অনুভব করছে রানা। প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে সে-কম্পন।

এবার হোটেলরুম থেকে বেরোনোর সময় ওয়ালথারটা সঙ্গে করে এনেছে ও, শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করল ওটা। নল ধরে বাঁট কাজে লাগাল হাতুড়ির মতো, ওটা দিয়ে জোরে আঘাত করল গ্লাস পার্টিশনে। কিছু হলো না। এবার বাঁট ধরল রানা, সেফটি ক্যাচ নামিয়ে গুলি করল পার্টিশনে। মাকড়সার জালের মতো একটা জাল তৈরি হলো কাচের গায়ে, কিন্তু চুরমার হয়ে গেল না সেটা—গ্লাসটা বুলেটপ্রুফ।

ওয়ালথারের নল নিচু করল রানা, গাড়ির লকে গুলি

করবে কি না ভাবছে। লাভ হবে কোনও? অটোমেটিক লকিং সিস্টেম চালু আছে, কাজেই পিস্তলের পুরো ম্যাগাযিনও যদি খালি করে ফেলে রানা দরজার ওপর, কোনও ফায়দা পাবে না।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে রানা, দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়, কিন্তু কোনও আইডিয়া খেলছে না মাথায়।

ধেয়ে আসছে ট্রেন, আলো আরও উজ্জ্বল হয়েছে সেটার।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটল একদিকের জানালায়, চমকে উঠল রানা। চুর-চুর হয়ে গেছে ওই জানালার কাচ। একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে।

'রানা?' কানাডিয়ান উচ্চারণে শোনা গেল একটা নারীকণ্ঠের ডাক।

সেলেনা বার্নহার্ট!

ওর হাতে একটা টায়ার-আয়রন, নিয়ে এসেছে ভাড়া-করা একটা সিত্রোঁর ইমার্জেন্সি কিট থেকে। আবারও বাড়ি মারল মেয়েটা লিমাযিনের জানালায়, চুর হলো আরও কিছু কাচ।

মনে মনে দ্রুত একটা হিসেব কষল রানা। কাঁচ খসাতে পারলেও জানালা দিয়ে বের হওয়ার সুযোগ পাবে না ও, অত সময় নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল কত দূরে আছে সেলেনার সিত্রোঁ। মেয়েটাকে বলল, 'নিজের গাড়িতে ফিরে যাও জলদি। লিমাযিনের ড্রাইভার নেমে যাওয়ার সময় হ্যাণ্ডব্রেক টানেনি। ব্যারিয়ার পাশ কাটিয়ে তোমার গাড়ি নিয়ে হাজির হও লিমাযিনের পেছনে, গুঁতো মেরে লিমাযিনকে নামিয়ে দাও রেললাইনের ওপর থেকে।'

টায়ার-আয়রনটা ফেলে দিয়ে ছুট লাগাল সেলেনা।

ট্রেনের গর্জন আরও বেড়েছে। সিত্রোঁর ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল সেলেনা, হ্যাঁচকা এক টানে লাগিয়ে দিল দরজা, কিন্তু আওয়াজ শুনতে পেল না রানা। এক সেকেণ্ড পরই

লাফিয়ে আগে বাড়ল সিত্রোঁ, কয়েক মুহূর্ত পরই লিমাযিনের পেছনের বাম্পারে প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ টের পেল রানা। শুনতে পেল ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ। সিত্রোঁর তুলনায় লিমাযিন অনেক ভারী, প্রথম সংঘর্ষেই চুরমার হয়ে গেছে সিত্রোঁর উইণ্ডস্ক্রিন।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে রানা। দেখতে পাচ্ছে, ব্যাকগিয়ার দিয়েছে সেলেনা, পিছিয়ে নিচ্ছে সিত্রোঁকে। কিছুদূর গিয়েই গিয়ার বদল করল দ্রুত, তারপর আবার গুঁতো দিল লিমাযিনকে।

ব্যাকসিট থেকে ছিটকে গাড়ির মেঝেতে পড়ে গেল রানা। আছড়েপাছড়ে উঠে বসল, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। আর বড়জোর পঞ্চাশ কি ষাট মিটার দূরে আছে ট্রেনটা। তেড়ে আসছে খেপার মত।

আবার ব্যাকগিয়ার দিয়ে সিত্রোঁকে পিছিয়ে নিল সেলেনা, এবং আবারও ঢুস মারল লিমাযিনকে। রেললাইনের ওপর থেকে নেমে গেল লিমাযিন, গিয়ে বাড়ি খেল ব্যারিয়ারের সঙ্গে।

আরও একবার ব্যাকগিয়ার দিতে হলো সেলেনাকে। পিছিয়ে গিয়ে যেইমাত্র নেমে গেছে সে রেললাইন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে দানব ট্রেনটা হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল লিমাযিন আর সিত্রোঁর মাঝখান দিয়ে। গাড়ির ভেতরে থাকার পরও ঝড়ো বাতাসের দুলুনি টের পেল রানা-সেলেনা দু'জনই।

ট্রেনটা দূরে চলে যেতেই রানার পাশে হাজির হলো সেলেনা।

'ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজা লক করে যায়নি ড্রাইভার,' মেয়েটাকে বলল রানা। 'উঠে বসো ওই সিটে। চেষ্টা করে দেখো সেণ্ট্রাল লকিং মেকানিযমটা চিনতে পারো কি না। আমার যে-কোনও একপাশের দরজার লক খুলতে পারলেই বের হতে পারবো আমি।'

লকিং মেকানিযমটা বুঝতে ত্রিশ সেকেণ্ড সময় লাগল সেলেনার।

লক খুলে যেতেই লিমাযিন থেকে বাইরে বের হলো রানা। সেলেনাও বের হলো।

'ধন্যবাদ, সেলেনা,' নরম সুরে বলল রানা, 'ঠিক সময়ে তুমি হাজির না হলে গেছিলাম আজ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার বদলে বুঝিয়ে বলো কী ঘটছে এসব,' তেতো কণ্ঠে বলল সেলেনা।

জবাব না দিয়ে সেলেনার ভাড়া-করা গাড়িটার দিকে তাকাল রানা। 'আশা করি গুঁতোগুঁতির কারণে তেমন ক্ষতি হয়নি তোমার গাড়ির।'

'কেন? কোথায় যেতে চাও?'

'এখানে আসার সময় একজায়গায় একটা বার দেখেছি, সেখানে।'

ছয়

বারের অন্ধকার পার্কিংলটে গাড়ি থামাল রানা, নামল। বের হলো সেলেনাও। দুটো মোটরসাইকেল আর কয়েকটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। বারের দরজার ওপর লাল আলো বিলাচ্ছে একটা নিয়ন সাইন। ভেতরে ঢুকল ওরা দু'জন।

বারটা বলতে গেলে খালি। লম্বা চুলের কয়েকজন বাইকার পুল খেলছে এককোনায়। নিজেদের মধ্যে ফাজলামি করছে ওরা, থেকে থেকে কর্কশ হাসি হাসছে। বোতলে চুমুক

দিয়ে বিয়ার গিলছে। আরেক কোনায় চলছে জুকবক্স, বাজছে হার্ডরক।

উদ্দাম আওয়াজ থেকে যথাসম্ভব দূরের একজায়গায় বসতে বলল রানা সেলেনাকে। বার থেকে লাল ওয়াইনের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এল ও। বসল মেয়েটার মুখোমুখি, দুটো গ্লাসেই মদ ঢালল। একটা গ্লাস ঠেলে দিল মেয়েটার দিকে।

ওয়াইনের গ্লাসে বড় করে চুমুক দিল সেলেনা, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। 'দিন গেল একখানা!'

কিছু বলল না রানা।

চোখ খুলল সেলেনা। 'ঘটনা কী?'

ঘটনা সংক্ষেপে বলল রানা।

'কিন্তু কেন, রানা? কেন হঠাৎ করেই এত জনপ্রিয় হয়ে গেলাম আমরা?'

'আমরা?' কথাটা ধরল রানা।

'হ্যাঁ, "আমরা"।' তপ্ত কণ্ঠে বলল সেলেনা। 'তোমার সঙ্গে আজই পরিচয় আমার, আর পরিচয়ের পর থেকেই একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। অচেনা লোক ঢুকে পড়ছে আমার অ্যাপার্টমেন্টে, খুন করার চেষ্টা করছে আমাকে। যাকে বন্ধু বলে ভাবতাম সে-লোক পরিণত হয়েছে ঘরের-শত্রু-বিভীষণে। মরা মানুষ গায়েব হয়ে যাচ্ছে আমার ঘর থেকে। পুলিশে খবর দিয়ে বোকা বনছি আমি, তারা পাগল ঠাউরাচ্ছে আমাকে।'

যা যা ঘটেছে, সব বলল সেলেনা। মন দিয়ে শুনল রানা।

'তোমাকে ফোন করছিলাম বার বার,' হতাশা এখনও যায়নি মেয়েটার কণ্ঠ থেকে, 'মোবাইল বন্ধ করে রেখেছ কেন?'

অপ্রস্তুত হাসি হাসল রানা। মনে পড়ে গেছে, সেলেনার ইন্টারভিউ নেয়ার সময় সেই যে সুইচ-অফ করেছিল ওর

মোবাইলের, আর চালু করা হয়নি। পকেট থেকে বের করল ওটা, বাটন চেপে অন করল।

'যখন বুঝতে পারলাম,' বলছে সেলেনা, 'ওরা হামলা করতে চলেছে তোমার ওপর, ফোন করলাম তোমাকে। লাভ হলো না। কী করা যায় ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, আজ রাতে মিস্টার লরেমের সঙ্গে দেখা করার কথা তোমার। ভাগ্যিস তখন ঠিকানাটা মুখে বলেছিলে, আর আমিও খেয়াল করে শুনেছিলাম। কোর্ট দ্য ব্রিগন্যান চিনি, বুঝতে পারছিলাম এত রাতে সেখানে যেতে চাইবে না কোনও ট্যাক্সি-ড্রাইভার। তাই একটা রেণ্ট-আ-রাইড থেকে সিত্রোঁটা ভাড়া নিই।'

'আমাকে না-বাঁচালেও তো পারতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সেলেনা। 'দয়া করে ভেবে নিয়ো না, দেখামাত্র তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। আসলে তোমাকে সতর্ক করা আমার দায়িত্ব বলে মনে হয়েছিল। যা-হোক, এবার বলো এসবের মানে কী। তুমি যে-পত্রিকায় কাজ করো, সে-পত্রিকার সব সাংবাদিকের জীবনই এমন রোমাঞ্চকর নাকি?'

নিজের জন্য আরেক গ্লাস ওয়াইন ঢালল রানা। 'রোমাঞ্চটা তোমার জন্যে একটু বেশিই হয়ে গেছে মনে হয়।'

'ফালতু বোকো না। কেন ওরা লেগেছে আমাদের পেছনে, বলো।'

জবাব দিল না রানা। সময় নিয়ে চুমুক দিচ্ছে ওয়াইনের গ্লাসে।

'দেখো, রানা, সাইকোলজিকাল কোনও গেম খেলো না আমার সঙ্গে, প্লিয। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে, অমনি খেপে উঠল একদল লোক, আমাদের দু'জনকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য উঠেপড়ে লাগল—এসব কাকতালীয় ব্যাপার হতেই পারে না। ...আমি কচিখুকি নই, রানা। তুমি যে সাংবাদিক নও, তা ইতিমধ্যে বোঝা হয়ে গেছে আমার।

কে তুমি? এবং মিস্টার লরেমের নাম করে তোমাকে ফোন করেছিল কে? তোমার মোবাইল নম্বরই বা জোগাড় করল কোখেকে? ...যদি তালা মেরে রাখো মুখে, সত্যি বলছি, পুলিশে খবর দেবো আমি।'

মুচকি হাসল রানা। 'তুমি কি মনে করো, তোমার কথা আর বিশ্বাস করবে ওরা?'

'সেটা আমি বুঝবো। আগে বলো, তুমি কে।'

অনেকদূরে চলে এসেছে, তবু এখনও যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ট্রেনের ড্রাইভারের বুকে। একটু আগে কী ঘটেছে রেললাইনের ওপর, দেখেছে সে। ওই দুটো গাড়ি থেকে ট্রেনের দূরত্ব যখন এক শ' মিটারের মতো ছিল, তখন খেয়াল করেছিল সে গাড়ি দুটোকে। অত কম দূরত্বে কিছুই করার ছিল না তার, ব্রেক করাও অসম্ভব ছিল। সিত্রোঁটা যে গুঁতিয়ে লিমাযিনকে নামিয়ে দিতে চাইছিল রেললাইনের ওপর থেকে, বুঝতে পেরেছিল সে।

কিন্তু কেন ওই কাজ করতে হলো সিত্রোঁর ড্রাইভারকে? লিমাযিনের ব্যাকসিটে যে-লোক বসে ছিল, আত্মরক্ষার জন্য সে কিছু করল না কেন? কেউ কি তা হলে লিমাযিনের লোকটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে...

নাহ্...মাথা নাড়ল ট্রেনের ড্রাইভার...ঘটনাটা মনে হয় রিপোর্ট করা দরকার।

রেডিয়োর উদ্দেশে হাত বাড়াল সে।

'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর,' বলল রানা।

'গোয়েন্দা? তা হলে সাংবাদিক না?'

'না।'

'অর্থাৎ মিথ্যা বলেছ আমাকে?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'মিথ্যা না বললে আমার সঙ্গে দেখা করতে না তুমি।'

'তোমার ওপর থেকে আমার বিশ্বাস যে উঠে গেছে, বুঝতে পারছ?'

'স্বাভাবিক। তোমার জায়গায় আমি হলেও একই কথা বলতাম। চরম মিথ্যাবাদী লোককে কে বিশ্বাস করবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সেলেনা, ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওয়াইনের গ্লাসের দিকে। হঠাৎ মুখ তুলল। 'কীসের তদন্ত করছ তুমি?'

'তদন্ত না। একটা জিনিস খুঁজছি।'

'কী?'

পিয়েরে উইনিং, তাঁর নাতনি মিনতি এবং হেনরিখ প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে বলল রানা।

শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা নাড়ল সেলেনা। 'তোমাকে কোনও সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না। ওই পাণ্ডুলিপি কোথায় আছে, সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। ...আমার কাছে কোন্ ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগছে, জানো?'

'কোন্‌টা?'

'অসহায় একটা মানুষকে সাহায্য করার জন্য একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজছ তুমি...হয়তো সেটা একটা মিথ—আসলে অস্তিত্বই নেই। অথচ একদল লোক মেরে ফেলতে চাইছে তোমাকে, এমনকী আমাকেও। কেন?'

'জানি না, বিশ্বাস করো। জানলে গোপন করতাম না।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে সেলেনা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এবার কী করবে?'

'খবর দিয়ে একটা ট্যাক্সি আনাবো। যেতে হবে আমাদেরকে।'

'সিত্রোঁ কী দোষ করল?'

‘ওটা নেয়া যাবে না।’

‘কেন?’

‘আমাদের শত্রুরা ইতিমধ্যে হয়তো দেখে ফেলেছে গাড়িটা। আমি চাই না, আমরা যে-জায়গায় যাবো, সে-জায়গার হদিস জানুক ওরা।’

‘রেন্ট আ রাইড কোম্পানিকে কী জবাব দেবো?’

‘ফোন করে জানিয়ে দিয়ো, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সিত্রোঁর।’

‘ওরা যদি ক্ষতিপূরণ চায়?’

‘আমি দেবো।’

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সেলেনা। ভাবছে, ক্ষতিপূরণটা যদি রানা দেয়, তা হলে একদিক দিয়ে ভালোই হয়। কারণ ওর কাছে অত টাকা নেই। বলল, ‘কোথায় যেতে চাও?’

‘বলছি। তার আগে বলো, তুমি কি ফিরে যেতে চাও তোমার অ্যাপার্টমেন্টে?’

‘মজা করছ নাকি? অ্যাপার্টমেন্টে যাই, আর আবার কেউ একজন ঢুকুক সেখানে, তারপর আমাকে একা পেয়ে আমার গলাটা দু’ফাঁক করে দিক?’ মাথা নাড়ল সেলেনা। ‘আমি আর যাচ্ছি না ওখানে।’

‘তোমার অ্যাসিসটেন্টের ঠিকানা কী?’

‘কেন?’

‘ওকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।’

‘যেমন?’

‘আমার ধারণা, আমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ আছে জে ফক্সের। ওর কাছ থেকেই আমার মোবাইল নম্বর পেয়েছে ওরা। তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য ফোন করেছিলাম আমি ফক্সকে, নম্বরটা রেখে দিয়েছিল সে তখন। পরে জানিয়ে দিয়েছে জায়গামতো। সুযোগটা নিয়েছে কেউ

একজন...প্রকাশক চ্যাভিস লরেমের নাম করে ফোন করেছে আমাকে।'

'জে ফক্সকে জিজ্ঞেস করার মতো কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমারও।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে থাকাটা উচিত হবে না তোমার। আমার সঙ্গে থাকলে কী ঘটে, ইতিমধ্যে দেখেছ।' ওয়ালেট বের করল রানা, সেটা থেকে বের করল বেশকিছু নোট।

'কী করছ?'

নোটগুলো সেলেনার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'এগুলো রাখো। ভালো দেখে কোনও একটা হোটেলে উঠে পড়ো আজ রাতের জন্য। আগামীকাল সকালে টিকিট কেটে রওনা হয়ে যেয়ো কানাডার উদ্দেশে।'

ধাক্কা মেরে রানার হাত সরিয়ে দিল সেলেনা, দুই চোখ জ্বলছে। 'করুণা করছ? তুমি আমাকে করুণা করার কে? মনে রেখো, তোমার জীবন বাঁচিয়েছি আমি। আরও মনে রেখো, হামলা শুধু তোমার ওপর করা হয়নি, আমার ওপরও করা হয়েছে। কাজেই কী ঘটছে তা জানার ন্যায্য অধিকার আছে আমার।' বিষদৃষ্টিতে আরেকবার তাকাল রানার হাতের নোটগুলোর দিকে। 'তোমার ওয়ালেট যদি বেশি গরম হয়ে গিয়ে থাকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা দাও। পরকালে কাজে লাগবে।'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল রানা, নোটগুলো ঢুকিয়ে রাখল ওয়ালেটে। 'যে বা যারা লেগেছে আমাদের পেছনে, তারা প্রফেশনাল। পরেরবার আরও শক্ত হামলা করবে তারা আমাদের ওপর।'

'ইনফর্মেশনের জন্য ধন্যবাদ। ট্যাক্সি ডাকো।'

'কোথায় যাচ্ছ তা হলে?'

'শব্দটা "যাচ্ছ" না, "যাচ্ছি" হবে। এখন থেকে আমরা দু'জন একসঙ্গে।'

‘কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

‘জে ফক্সের অ্যাপার্টমেন্টে। ...রেন্ট আ রাইডকেও ফোন করতে হবে।’

খিস্তির তুবড়ি ছুটেছে মোটুর মুখে।

গলা ভিজিয়ে ফিরে এসেছে ওরা তিনজন লিমাযিনের কাছে। ইচ্ছা ছিল, রানার থ্যাঁতলানো লাশ নিয়ে যাবে ওদের বস উসবিলিয়ানো মাতিমাসির কাছে। কিন্তু এখন আশ্চর্য হয়ে দেখতে পাচ্ছে, পেছনের বাম্পারটা ঝুলে পড়া ছাড়া লিমাযিনের কোনও ক্ষতিই হয়নি। গাড়ির ভেতরে কারও লাশ নেই। পেছনের একদিকের জানালার কাচ চুরমার হয়ে আছে। এবং যেভাবেই হোক একদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে মাসুদ রানা।

‘পুলিশ আসার আগেই কেটে পড়ি, চল্,’ পরামর্শ দিল ওদের একজন।

‘গলা ভেজাতে যাওয়াটা উচিত হয়নি আমাদের,’ বলল মোটু।

‘উচিত-অনুচিত পরে হিসেব করি। আগে পালাই।’

গাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা তিনজন।

মোটু বলল, ‘ঘটনাটা কি রিপোর্ট করা দরকার বসের কাছে?’

জবাব দিল না বাকি দু’জনের কেউ।

কারণ ওরা জানে, ঘটনাটা রিপোর্ট না করে উপায় নেই ওদের।

নীলচে লাল আলোর ক্রমাগত ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে আছে জে ফক্সের অ্যাপার্টমেন্ট সংলগ্ন রাস্তা। আলোকিত হয়ে আছে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটাও। একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখা যাচ্ছে বিল্ডিং-এর বাইরে। আছে পুলিশের একাধিক গাড়িও।

কৌতূহলী লোকদের ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে ফুটপাথের একদিকে।

ওই বিল্ডিং থেকে দুই ব্লক দূরে ট্যাক্সি থামাতে বলল রানা ড্রাইভারকে। সেলেনাকে নিয়ে নেমে পড়ল, ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। সতর্ক নজর রেখেছে আশপাশে। একসময় মিশে গেল ওরা কৌতূহলী জনতার ভিড়ে।

কাছেপিঠের কয়েকটা বার থেকে হাজির হয়েছে এসব লোক, গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আকস্মিক বিস্ময়ের ছাপ তাদের প্রায় সবার চেহারায়, কারও কারও চোখ ছানাবড়া হয়ে আছে এখনও।

ট্রলিতে করে একটা স্ট্রেচার নিয়ে বিল্ডিং থেকে বের হলো একদল প্যারামেডিক। তাড়াহুড়ো করছে না ওরা। ট্রলিতে শুয়ে-থাকা নিথর দেহটার আপাদমস্তক ঢেকে দেয়া হয়েছে সাদা একটা চাদর দিয়ে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে চাদরের একটা জায়গা।

অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো স্ট্রেচারটা, তারপর লাগিয়ে দেয়া হলো দরজা।

ঘটনা আঁচ করতে পারছে রানা, তারপরও এগিয়ে গেল পুলিশ-বাহিনীর এক সদস্যের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে এখানে?'

'আত্মহত্যা,' নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল লোকটা। 'নিহত লোকটার এক প্রতিবেশী শুনেছে গুলির আওয়াজ।'

'যে মারা গেছে তার নাম কি জে ফক্স?'

নিজের পাশ থেকে সেলেনার কণ্ঠ শুনতে পেল রানা।

'লোকটাকে চেনেন নাকি?' এখনও নিস্পৃহতা যায়নি পুলিশ সদস্যের কণ্ঠ থেকে। জবাবের অপেক্ষা না-করে বলে চলল, 'তা হলে এক কাজ করুন। ঢুকে যান বিল্ডিং-এর ভেতরে। আপনার সঙ্গে হয়তো কথা বলতে চাইবেন আমাদের চীফ।'

সদর-দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল সেলেনা।

ওর পিছু নিল রানা। কিছুদূর গিয়েই মেয়েটার একটা হাত ধরে টান দিল।

থামল সেলেনা, ঘুরে তাকাল। বিরক্ত দৃষ্টি।

'চলো কেটে পড়ি এখান থেকে,' চাপা গলায় বলল রানা। 'তোমার বা আমার কিছু করার নেই এখানে। শুধু শুধু পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে লাভ কী?'

একটানে হাত ছাড়িয়ে নিল সেলেনা। 'আমাকে জানতে হবে কী হয়েছে এখানে। আজ কোন্ নরক গুলজার হলো প্যারিসে, জানতে চাই আমি।' ঘুরে হাঁটা ধরল আবার। পুলিশের টেপ পার হয়ে হাজির হলো বিল্ডিং-এর সদর দরজায়।

রানা শুনতে পেল, এক পুলিশ-সদস্য আরেকজনকে বলছে, 'বুলেট লোকটার গোটা মুখটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ওর মা-ও ওকে এখন চিনতে পারবে কি না, সন্দেহ।'

লিমাযিন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে প্যারিস পুলিশের কয়েকজন সদস্য। টর্চের আলো ফেলে-ফেলে এদিকওদিক দেখছে ওরা। কোমরের বেল্ট থেকে রেডিয়ো খসিয়ে সার্চলাইটের আবেদন জানাল ওদের একজন নিকটস্থ স্টেশনে।

'ট্রেনের ড্রাইভার ছোটখাটো একটা সিট্রোঁর কথাও বলেছিল,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল এক পুলিশ অফিসার।

'ওটা গেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

'বেশিদূর যেতে পারেনি...আমি নিশ্চিত। ওই দেখো, সিট্রোঁয় যে-কুল্যাণ্ট ব্যবহার করা হয়েছিল, ওগুলো লিক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।'

লিমাযিনের দিকে এগিয়ে গেছে দু'জন অফিসার, টর্চের আলো ফেলে-ফেলে ভেতরটা দেখছে। গাড়ির মেঝেতে পড়ে-থাকা চকচকে কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের

একজনের। পকেট থেকে রুমাল বের করে ওটা তুলে নিল সে, ধরল টর্চের আলোতে। 'হ্যালো, হ্যালো,' কৌতূহলে চকচক করছে তার চোখ, 'এটা কী? কোনও পিস্তলের থ্রি-এইট শেল মনে হয়।' নাকের কাছে নিয়ে করডাইটের গন্ধ শুঁকল। 'বেশিক্ষণ আগে গুলি করা হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'ব্যাগে ভরো ওটা,' পরামর্শ দিল ওর সঙ্গী।

পনেরো মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে গেল পুলিশের একটা টো-ট্রাক। লিমাযিনটাকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ওটা কাছের স্টেশনের উদ্দেশে।

জে ফক্সের অ্যাপার্টমেন্টে, ইউনিফর্ম-পরিহিত পুলিশ সদস্যদের নেতৃত্বে আছে বেঁটে আর মোটা এক লোক। হুকুমের ভঙ্গিতে কী যেন বলছে সে তার অধস্তনদের উদ্দেশে, পরনে সাদা পোশাক। সেলেনার উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র মেয়েটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে, রানার মনে হলো, বমি বা তার চেয়েও খারাপ কিছু দেখছে লোকটা।

'আপনি সাংবাদিক নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল ওই লোক, মারমুখী ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সেলেনার দিকে। 'উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয় তা হলে সোজা উল্টো দিকে হাঁটা ধরুন। এখানে দেখার মতো কিছু নেই।'

'আপনি কি অফিসার ইন-চার্জ?' পাল্টা প্রশ্ন করল সেলেনা

হ্যাঁ-না কিছু বলল না লোকটা, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

'আমি ডক্টর সেলেনা বার্নহার্ট। জে ফক্স আমার...' সামলে নিল নিজেকে, 'জে ফক্স ছিল আমার সহকারী। একটু আগে ওর লাশই তো নিয়ে গেল আপনার লোকেরা, না?'

রানা সবসময় পুলিশি ঝামেলা এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী, তাই সেলেনার কথা শেষ হওয়ামাত্র বলল, 'আমরা আসলে এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম। এত লোক দেখে ভাবলাম...'

'আপনি কে, মসিয়ে?' জিজ্ঞেস করল অফিসার ইন-চার্জ।

বানোয়াট একটা নাম বলতে চাইছিল রানা, কিন্তু তার আগেই সেলেনা বলে উঠল, 'ওর নাম মাসুদ রানা। ...আমার দিকে তাকান, অফিসার। জে ফক্স আত্মহত্যা করেনি। ওকে খুন করা হয়েছে।'

প্রমাদ গুনল রানা।

'আফসোস, মাদাম সেলেনা খুন ছাড়া আর কিছুই দেখি বোঝেন না।'

কথাটা বলা হয়েছে রানার পেছন থেকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও।

ঘাড় ঘুরাল সেলেনাও। যে বলেছে কথাটা, তাকে দেখামাত্র চুপসে গেল।

অ্যাল মার্লো।

রানা-সেলেনার দিকে এগিয়ে আসছে মার্লো, সবুজ দুই চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মেয়েটার ওপর। 'আপনাকে সতর্ক করেছিলাম, আমার কথা বোধহয় কানে যায়নি আপনার। এই কেস পরিষ্কার আত্মহত্যার। আমরা এমনকী একটা নোটও পেয়েছি... আপনি কী করছেন এখানে?'

'কীসের নোট?' জিজ্ঞেস করল সেলেনা, কণ্ঠে সন্দেহ।

মার্লোর একহাতে প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ আছে, ওটা উঁচু করে দেখাল। স্বচ্ছ প্লাস্টিক ভেদ করে দেখা যাচ্ছে, সেলোফেনে মোড়ানো আছে একখণ্ড নোটপেপার; কিছু একটা লেখা আছে ওটাতে।

'আত্মহত্যা করার আগে লোকটা বলে গেছে,' বলল মার্লো, 'আর সহ্য হচ্ছিল না ওর। কাজের চাপ, হতাশা, ঋণ, দৈনন্দিন জীবনের হাজারটা সমস্যা...কিছুই সামাল দিতে পারছিল না সে। হৃদয়ঘটিত সমস্যা ছাড়া আর প্রায় সব সমস্যার কথা বলে গেছে বেচারা।' উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সেলেনার দিকে।

কুঁকড়ে গেল মেয়েটা—বুঝতে পেরেছে কী বোঝাতে চেয়েছে মার্লো।

'জানতে চেয়েছিলাম,' বলছে লোকটা, 'আপনি কী করছেন এখানে। আজ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখা হলো আপনার সঙ্গে।'

'সুইসাইড নোটটা দেখতে চাই আমি,' সেলেনার বলার ভঙ্গি শুনে মনে হলো, যেন দপ করে জ্বলে উঠেছে। 'ওই নোট জে ফক্স লেখেনি।'

'দুঃখিত,' মার্লো কিছু বলার আগেই মুখ খুলল রানা, হাত বাড়িয়ে ধরেছে সেলেনার একটা হাত, চাইছে না আর কিছু বলুক মেয়েটা। 'সহকর্মীকে হারিয়ে আসলে যারপরনাই আপসেট হয়ে গেছে আমার বাগ্‌দত্তা, তাই...। কিছু মনে করবেন না আপনারা। আমরা চলে যাচ্ছি।' টানতে টানতে মেয়েটাকে নিয়ে এল সদর-দরজার কাছে।

ওদের দু'জনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মার্লো। ওকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে ওর সহকর্মীরা।

'তোমার বাগ্‌দত্তা মানে?' হিসহিসে কণ্ঠে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল সেলেনা। 'কবে কখন কোন্ জায়গায় তোমার সঙ্গে বাগ্‌দান হয়েছে আমার? আর...টানাটানি করছ কেন? ছাড়ো, ব্যথা লাগছে।'

'চুপ করো!' মৃদু ধমক দিল রানা মেয়েটাকে। 'আগামী কয়েকটা ঘণ্টা পুলিশ স্টেশনে কাটিয়ে দেয়ার শখ জেগেছে, না? পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ কী, জানা আছে? না থাকলে মুখটা বন্ধ রাখো, আর মাথাটা ঠাণ্ডা করো।'

'জে ফক্স আত্মহত্যা করেনি,' বলল সেলেনা।

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এবার যা বলি, মন দিয়ে শোনো। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড সময় পাবে, তার মধ্যেই কাজটা করতে হবে তোমাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাও, একনজর দেখে বলো এই অ্যাপার্টমেন্টের কোনওকিছু অন্যরকম লাগছে

কি না। অথবা এখান থেকে কোনওকিছু হারানো গেছে কি না। কোনওকিছু সরানো হয়েছে কি না, অথবা কোনও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে কি না।'

রানার কথামতো কাজ করল সেলেনা। কিছুক্ষণ পর রানার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'জে ফক্সের কম্পিউটারটা গায়েব হয়ে গেছে।'

'ডক্টর বার্নহার্ট,' মার্লোর ডাকে চমকে উঠল মেয়েটা, 'আপনার নাগরিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই—নিজের এবং আমাদের সময়ের অপচয় করবেন না। আর আমাকে না-জানিয়ে শহরের বাইরে কোথাও যাবেন না। মসিয়ে ফক্সের মৃত্যুর ব্যাপারে পরে হয়তো কথা বলতে হবে আপনার সঙ্গে।'

সেলেনাকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে চলে এল রানা।

ও খেয়াল করেছে, কিছু একটা খেলা করছে ইন্সপেক্টর মার্লোর দৃষ্টিতে।

কী সেটা?

সন্দেহ?

সাত

যেভাবে একের পর এক হামলা করছে অচেনা শত্রুরা, তাতে একটুখানি হলেও দুশ্চিন্তা জেগেছে রানার মনে। তবে সেটা ওর নিজের জন্য না, সেলেনার জন্য। শত্রুপক্ষ এতদিন হাত বাড়ায়নি মেয়েটার দিকে, রানা প্যারিসে আসামাত্র...

রানা সিদ্ধান্ত নিল, হোটেলরুম ছেড়ে দেবে। প্যারিসে একটা সেফহাউস আছে রানা এজেন্সির, সেলেনাকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠবে আপাতত। কাউকে চোখে-চোখে রাখার চিন্তা যখন কাজ করে না মাথায়, তখন অন্য কাজে মন দেয়া যায়।

সেফহাউস থেকে যথেষ্ট দূরে ছেড়ে দিল রানা ট্যাক্সিটা, সেলেনাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়ল খোয়াবিছানো সরু একটা গলিতে। সেখান থেকে একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিংলটে। ওটা পেরিয়ে হাজির হলো আরেকটা সুনসান অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিতে। এখানে একটা বিল্ডিং-এর পেছনদিকে লোহার সিঁড়ি আছে। ওটা বেয়ে উঠে পড়ল রানা, হাজির হলো সেফহাউসের আর্মার্ড দরজায়।

'তুমি এখানে থাকো?' আশ্চর্য হয়েছে সেলেনা।

'মাঝেমধ্যে,' মেয়েটাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল রানা। লাইট জ্বালাল।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে সেলেনা। 'এটা কোন্ জাতের অ্যাপার্টমেণ্ট?'

'স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেণ্ট। একটা বেডরুম, একটা কিচেন, লিভিংরুম নামের একচিলতে ফাঁকা জায়গা আর একটামাত্র বাথরুম।' অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করল রানা। 'কফি খাবে? সেই কখন থেকে দেখছি পেটে দানাপানি দেয়ার কথা উচ্চারণও করছ না। খাওয়ার কথা ভুলে গেছ নাকি?'

কড়া কিছু-একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সেলেনা। 'খাবো।'

ঝটপট কফি বানিয়ে ফেলল রানা। সেফহাউসে আসার সময় একটা দোকান থেকে দুটো স্যাণ্ডউইচ কিনেছে, ওগুলো প্যাকেট থেকে বের করে দুটো আলাদা প্লেটে রাখল।

কিচেন টেবিলের একটা চেয়ারে বসে পড়েছে সেলেনা, আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছে। ওর সামনে কফির কাপ আর

স্যাণ্ডউইচের একটা প্লেট নামিয়ে রাখল রানা। 'খেয়ে নাও।'

ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল সেলেনা। 'শুধু কফি খাবো। অন্য কিছু না।'

'কেন?'

'ইচ্ছা করছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। খেয়ে নিল, তারপর রিফ্রিজারেটর খুলে বের করল লাল ওয়াইনের একটা বোতল। ওটা নিয়ে ফিরে এল টেবিলের কাছে। খেয়াল করল, অল্প অল্প কাঁপছে সেলেনা। বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ভেতরের ঘরে গেল রানা, একটা কম্বল নিয়ে এসে ওটা দিয়ে জড়িয়ে দিল মেয়েটাকে। 'কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে,' নরম গলায় বলল, 'খেয়ে নাও। ভালো লাগবে।'

'জে ফক্সের জন্য খারাপ লাগছে,' নিচু গলায় বলল সেলেনা।

'লোকটা তোমার বন্ধুরূপী শত্রু ছিল,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'জানি। তারপরও...' হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সেলেনা, মুখ নিচু করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে চোখ মুছল, দুর্বল হাসি দেখা দিয়েছে ঠোঁটের কোনায়। 'তুমি হয়তো আমাকে বোকা ভাবছ।'

'না। জে ফক্স অনেকদিন ধরে কাজ করছিল তোমার সঙ্গে। ওর জন্য তোমার খারাপ লাগতেই পারে।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ো। আগামীকাল সকালে আমার কিছু কাজ আছে।' আবারও ভেতরের ঘরে গেল ও, দুটো কম্বল আর একটা কুশন নিয়ে এল। কিচেন টেবিলের পাশে, মেঝেতে বিছাল কম্বল; বালিশের মতো রাখল কুশন। 'বেডরুমটা তোমার জন্যে। যাও, শুয়ে পড়ো। স্যাণ্ডউইচ রেখে দিয়েছি ফ্রিজে। খিদে লাগলে খেয়ে নিয়ো।'

ভালো ঘুম হলো না সেলেনার। সারাদিনের ঘটনা ভুলতে পারছে না কিছুতেই। চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। টাকাপয়সা যা আছে সব একাট্টা করে কানাডায় ফিরে যাওয়াই কি ভালো? সেক্ষেত্রে কোনওদিনই জানা যাবে না কিছু প্রশ্নের জবাব।

মাসুদ রানার ব্যাপারটাই বা কী? প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছে সাংবাদিক হিসেবে, এখন বলছে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। গোয়েন্দারা এ-রকম দুর্গের মতো অ্যাপার্টমেন্টে থাকে নাকি? তা ছাড়া...একটা হিসেব কিছুতেই মিলছে না সেলেনার...লোকটা হেনরিখ প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির সন্ধানে প্যারিসে এল, অথচ এখানে আগে থেকেই গোপন এক ডেরা আছে তার। এটা কীভাবে সম্ভব?

কিচেনে শুয়ে-থাকা ওই লোকটা আসলে কে?

চেহারাটা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। বিশেষ করে চোখদুটো। বিপদে পড়ার অভিজ্ঞতা আছে মানুষটার। ভাবলে এখনও আশ্চর্য হচ্ছে সেলেনা—ছুটে আসছে ট্রেন, রেললাইনের ওপর গাড়ির ভেতরে আটকা পড়ে আছে রানা, অথচ তেমন কোনও বিকার নেই তার চেহারায়। কী করতে হবে তা চট করে বলে দিল সেলেনাকে। যেন আগে থেকেই জানা ছিল সমাধানটা!

কিন্তু লোকটার আচরণ কেমন যেন নিস্পৃহ। চোখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব জানার কোনও উপায় নেই। তবে এটা পরিষ্কার, রানা যতক্ষণ সঙ্গে থাকছে, ততক্ষণ অদ্ভুত এক নিরাপত্তাবোধ কাজ করছে সেলেনার মনে।

জোর খাটিয়ে রানার ভাবনা মন থেকে সরাল মেয়েটা। ওর গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে কেউ অথবা একদল লোক। শুধু উৎসাহী না, অত্যুৎসাহী বলা উচিত। ওকে শেষ করে দিতেও আপত্তি নেই তাদের। তারমানে, সে

যা আবিষ্কার করেছে অথবা করতে চলেছে, তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই লোকগুলোর জন্য। অর্থাৎ, ওর গবেষণার কোনও একটা মূল্য আছে তাদের কাছে।

বিপদে পড়েছে, তারপরও কিছুটা উত্তেজনা অনুভব করল মেয়েটা। সঠিক পথে আছে সে। এখন ওর কাজ হচ্ছে, কে বা কারা লেগেছে ওর পেছনে, তা জানা। ওকে কেন থামাতে চায় লোকগুলো, জানতে হবে সেটাও।

চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরে এল সেলেনা, মাথা তুলল বালিশ থেকে। ওর কান খাড়া হয়ে গেছে হঠাৎ। অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে...একটা কণ্ঠ আসলে। কেউ একজন কথা বলছে।

বেডরুমটা অন্ধকার আর অপরিচিত; এদিকওদিক হাতড়াল মেয়েটা। নামল বিছানা থেকে, এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। রাতের নৈঃশব্দ্যে চাপা থাকেনি ওই কণ্ঠ...খুব সম্ভব কিচেন থেকে আসছে ওটা।

রানা কথা বলছে?

যথাসম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলল সেলেনা, কান পাতল।

হ্যাঁ, রানাই কথা বলছে। সম্ভবত মোবাইলে।

একটা শব্দও বুঝতে পারছে না সেলেনা। কারণ ইংরেজি নয়...সম্ভবত ইউরোপিয়ান কোনও ভাষাতেও না, রানা কথা বলছে এমন কোনও ভাষায়, যা সেলেনার পূর্বপরিচিত নয়। তবুও উৎকর্ণ হয়ে থাকল মেয়েটা।

কিছুক্ষণ পর বিষণ্ন মনে ফিরে এল বেডরুমে।

'এ-ই তা হলে এখন পর্যন্ত তোর আপডেট?' মোবাইলের অন্য প্রান্তে শোনা গেল সোহেলের কণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ঠিক আছে। সাবধানে থাকিস। আর যে-কোনও দরকারে যোগাযোগ করিস।'

লাইন কেটে দিল রানা।

ফ্রান্সের প্রত্যন্ত এক গ্রামে নিজের ছেলেবেলা কাটিয়েছে ফ্র্যাযো। এবং ছোটবেলা থেকেই মানুষ অথবা যে-কোনও প্রাণীকে ব্যথা দিয়ে মজা পাওয়ার বিকৃত প্রবণতা আছে তার। পোকা হোক বা কেঁচো, তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারার মধ্যে আশ্চর্য আনন্দ পায় সে। ওই কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খরচ করতেও আপত্তি নেই।

কখনও কোনও পোকা ধরতে পারলে প্রথমে সেটার পাখাগুলো একটা একটা করে ছিঁড়ত সে। তারপর ছিঁড়ত এক এক করে পা। তারপরও মরত না সেটা, তড়পাতে থাকত। দৃশ্যটা চমৎকার লাগত ওর কাছে। সবশেষে...বিকৃত সুখের অনুভূতিটা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর...ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিত সে পোকার।

বয়স আট হওয়ার পর ফ্র্যাযো টের পায়, পোকা বা কেঁচো মারতে আগের-মতো ভালো লাগছে না আর। কাজেই পাখি আর ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী বেছে নিল মজার জন্য। যেসব গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠতে তেমন কষ্ট হয় না, সেসব গাছে বাসা-বাঁধা পাখিদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হয় সে। আতঙ্কে পরিণত হয় বেওয়ারিশ কুকুরদের কাছেও—ওর এলাকার নেড়ি কুকুরগুলো উধাও হয়ে যেতে শুরু করে একে একে।

তেরো থেকে শুরু করে উনিশ—টিনএজার জীবনে ফ্র্যাযো চর্চা করেছে অত্যাচার...যে বা যারা বাধা দিতে পারে না তাদের ওপর; তাই বিশ পেরোনোর আগেই ওই কাজে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে সে। টের পায়, কোনও মেয়েমানুষকে না, ও ওর সেই বিকৃতিকে ভালোবেসে ফেলেছে। যতক্ষণ ব্যস্ত থাকে নিজের বিকৃত আনন্দের কাজ নিয়ে, শুধু ততক্ষণ মনে হয় ওর, বেঁচে আছে।

বেশিদূর পড়ালেখা করেনি সে; সে-পাট চুকানোর আগে আরও একটা ব্যাপার টের পায়—আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে পোপের নেতৃত্বাধীন চার্চের শিক্ষাব্যবস্থায়। বড় বড় কাঁটা দিয়ে বানানো মুকুট, কিংবা ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত যিশুর মতো যেসব বিষয় করুণা বা ভীতি জাগায় সাধারণ মানুষের মনে, সেগুলো চুম্বকের মতো টানে ওকে। খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী যিশুর হত্যাদৃশ্য কল্পনা করে অপার্থিব কোনও অনুপ্রেরণা পেতে শুরু করে সে।

তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পড়ালেখা আরম্ভ করে চার্চের ইতিহাস নিয়ে। একদিন খুঁজে পায় পুরনো একটা বই। মধ্যযুগে কী কায়দায় শাস্তি দেয়া হতো অবিশ্বাসী বা ধর্মদ্রোহীদের, তার রগরগে বর্ণনা ছিল ওই বইয়ে। জানতে পারে, আজ থেকে বহু বছর আগে দক্ষিণ ফ্রান্সের এক জায়গায় কেন ও কীভাবে কেটে নেয়া হয়েছিল শতাধিক ধর্মদ্রোহীর কান-নাক-ঠোঁট। জানতে পারে, কীভাবে চোখে কাঁটা ফুটিয়ে অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে।

অত্যাচারের দৃশ্যটা যখন চোখ বুজে কল্পনা করছিল ফ্র্যাযো, ওর সেই অনুপ্রেরণা যেন বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল তখন। তারপর রাতের পর রাত জেগে ভেবেছে, ও-রকম কোনও নির্যাতন চালানোর সুযোগ যদি কখনও পেত!

একসময় ধর্মীয় চিত্রকলার ওপর ঝোঁক জন্মে যায় ফ্র্যাযোর। তখন মাইলের-পর-মাইল হেঁটে দূর-দূরান্তরের কোনও লাইব্রেরিতে যেত সে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকত ধর্মীয় চিত্রকলার বইয়ের ওপর। কল্পিত রাক্ষসরা মানুষদের ওপর যেসব অত্যাচার চালিয়েছে, সেগুলোর ছবি দেখে যারপরনাই মজা পেত। বল্লমে ক্ষতবিক্ষত শরীর, ছুরি দিয়ে কাটা হাত-পা, ডাইনি আখ্যা-পাওয়া কোনও নারীর নগ্ন দেহ—এসব দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যেত ওর।

না, নারীর নগ্নতা লোভাতুর করত না ওকে; বরং হাত

পিছমোড়া-করে-বাঁধা ওই নারীর অসহায়ত্ব উপভোগ করত সে, বেচারির যৌনাঙ্গ আবৃত-করে-রাখা কালো একটা ব্যাঙের দিকে তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টিতে। কল্পনার চোখে দেখত, আর কিছুক্ষণের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হবে ডাইনিটাকে।

তারপর একসময়, মানবজীবনের চিরাচরিত নিয়ম মানতে গিয়ে, অথবা হয়তো নিজের বাপ-মাকে খুশি করার জন্য, গ্রামের এক আগ্নেয়াস্ত্র-মেরামতকারীর মেয়েকে বিয়ে করে ফ্র্যাযো। কিন্তু বাসর রাতেই টের পায়, যৌনক্ষমতা বলে কিছু নেই ওর। স্রষ্টা ওকে পৌরুষ দেননি, দিয়েছেন নৃশংসতা।

নিজের অক্ষমতা নিয়ে কোনওকালেই বিকার ছিল না ফ্র্যাযোর, বউয়ের কী হবে তা নিয়েও ভাবেনি কখনও। নগ্ন নারীদেহের স্পর্শ উত্তেজনা জাগাত না ওর ভেতরে, বরং একটা ছুরির নগ্ন ফলায় আঙুল বুলিয়ে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি উত্তেজনা অনুভব করত সে। নারীমাংসের চেয়ে শিকারের-মাংস অনেক বেশি রোমাঞ্চকর ছিল ওর কাছে, সবসময়।

সপ্তাহ গড়িয়ে মাস যায়, ফ্র্যাযোর যৌনক্ষুধায় আক্রান্ত স্ত্রী একরাতে আর চুপ করে থাকতে পারে না। 'ডাক্তারের কাছে যাও,' শাসানির সুরে বলে সে ফ্র্যাযোকে, 'নইলে পৌরুষ আছে এমন কাউকে খুঁজে নিতে বাধ্য হবো আমি। তখন লোকে জানবে, আমার স্বামী একটা নপুংসক ছাড়া আর কিছু না।'

লিঙ্গোত্থানের সমস্যার কথা বাদ দিয়ে বললে ফ্র্যাযোর বিশাল শরীরটা যেমন পেশিবহুল তেমনই শক্তিশালী; বউয়ের কথায় ভীষণ অপমানিত হয় সে, তারপর ক্রোধোন্মত্ত হয়ে যায়। একথাবায় আঁকড়ে ধরে বউয়ের চুলের মুঠি, অন্যহাতের প্রচণ্ড এক ঘুসিতে অর্ধেক-অজ্ঞান বানিয়ে দেয় বেচারিকে। মেয়েটাকে বলতে গেলে ছুঁড়ে ফেলে বিছানার ওপর, তারপর হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় ভরে দেয়।

পোকামাকড়-কেঁচো-পাখি-ছোট স্তন্যপায়ীর পর জীবনে প্রথমবারের মতো কোনও মানুষের গায়ে হাত দেয় ফ্র্যাযো সে-রাতে।

ধারালো একটা ছুরি ব্যবহার করে প্রথমে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে সে নিজের বউকে, তারপর একে একে আলগা করতে শুরু করে বেচারির হাত-পা। কান-ঠোঁট কেটে নেয়ার পর মুণ্ডুটাও আলাদা করে ফেলে ধড় থেকে। রমণ-সুখের চেয়ে বহুগুণ বেশি অপার্থিব এক পৈশাচিক সুখ পেয়েছে সে তখন।

এবং সে-রাতেই টের পায়, কষ্ট দিয়ে মানুষ মারার মধ্যে যে-মজা আছে, তা অন্য কোনও প্রাণীহত্যায় নেই।

তারপর গভীর রাতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় ও।

আর কোনওদিন গ্রামে ফিরে যায়নি ফ্র্যাযো। দূরের এক শহরে ভিক্ষা করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল সে। ওদিকে ভগ্নিহত্যার বদলা নেয়ার কসম খেয়েছিল ওর শ্যালক, একরাতে ঘটনাক্রমে নিরালা একজায়গায় দেখে ফেলে সে ফ্র্যাযোকে।

কোমরে গোঁজা ছুরিটা হাতে নিয়ে ফ্র্যাযোর পেছনদিক দিয়ে এগোয় সে। কিছু-একটা টের পেয়ে যতক্ষণে ঘুরে তাকিয়েছে ফ্র্যাযো, ওর ওপর ততক্ষণে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে ওর শ্যালক। ধারালো ফলার মারাত্মক আঘাতে গভীর ক্ষত তৈরি হয় ফ্র্যাযোর ঘাড়ে ও গলায়।

অন্য কেউ হলে আছড়ে পড়ত মাটিতে, হয়তো মারা পড়ত ওই এক আঘাতেই, বাধা দেয়ার কোনও সুযোগ না-পাওয়ায় কচুকাটা হয়ে যেত; কিন্তু ফ্র্যাযোর বেলায় এসবের কোনওটাই ঘটেনি। নিজের রক্তের গন্ধ বাঁচার দুর্দমনীয় এক আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে ওর ভেতরে...যেন নতুন কোনও শক্তি পায় সে। আহত বুনো পশুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, পালানোর বদলে পাল্টা হামলা করে।

এক থাবায় ছুরিটা কেড়ে নেয় ও শ্যালকের হাত থেকে,

পরমুহূর্তেই গলাটা দু'ফাঁক করে দেয় বেচারার। তারপর চিরে ফেলে হতভাগা লোকটার পেট, সময় নিয়ে কেটে বের করে আনে তার কিডনি দুটো।

দ্বিতীয়বারের মতো অনুভব করে পৈশাচিক আনন্দটা।

এবং প্রথমবারের মতো টের পায়, দুর্জ্ঞেয় কোনও তাগিদে নরহত্যা চালিয়ে যেতে হবে ওকে। ওই কাজে বিরতি দেয়া চলবে না কিছুতেই।

পালিয়ে উপকূলের কাছে চলে যায় সে, একটা ফেরিতে উঠে হাজির হয় ইটালির মেইনল্যাণ্ডে। কখনও ভিক্ষাবৃত্তি, আবার কখনও কুলিগিরি বেছে নেয় জীবিকা হিসেবে। আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসতে থাকে ওর ঘাড় ও গলার ক্ষত। তবে নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠ হারিয়ে ফেলে সে, কেমন ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে যায় ওর গলার-আওয়াজ।

এবং বছর পেরোনোর আগেই, স্রেফ আনন্দ পাওয়ার জন্য, আরও দু'জনকে খুন করে।

পুলিশ যাতে কখনোই ধরতে না-পারে, সেজন্য খুন করেই সে-জায়গা থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যেত ফ্র্যাযো। যাযাবর জীবন তাকে একসময় নিয়ে আসে দক্ষিণ ইটালিতে। জীবিকার জন্য এটা-সেটা করতে করতে ততদিনে পৃথিবীর হালচাল সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেছে ওর। একটা মাফিয়াচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে হঠাৎ করেই। আসলে ও-রকম কিছু একটাই চাইছিল সে অনেকদিন থেকে।

দলের হয়ে ফ্র্যাযোকে যে-কাজ করতে হতো, তা ছিল ওর মনের মতো। শত্রুপক্ষের ধরা-পড়া লোকদের ওপর চালাতে হত পাশবিক নির্যাতন, তাদের পেট থেকে বের করে নিতে হত গোপন খবর। নির্যাতনের ব্যাপারে সহজাত অনুপ্রেরণা কাজ করে ফ্র্যাযোর ভেতরে, ওই কাজে সে স্পেশালিস্ট; তাই ওর নিত্যনতুন নির্যাতন-কায়দা দেখে ও শুনে ওর নামটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আণ্ডারওয়ার্ল্ডের

অপরাধজগতে। "ঠাণ্ডা মাথার নির্যাতনকারী" আখ্যা পেতে বেশি সময় লাগেনি ওর।

আণ্ডারওয়ার্ল্ডের হর্তাকর্তারা তখন বলাবলি করত, 'শত্রুপক্ষের কাউকে বাঁচিয়ে রেখে যারপরনাই কষ্ট দিতে চাও? ফ্র্যাযোকে খবর দাও।'

তারপরও, আশ্চর্যের ব্যাপার, পুলিশের খাতায় কখনও ওঠেনি ফ্র্যাযোর নাম—ওর কৌমার্য যেমন অক্ষুণ্ন রয়েছে, আইনের চোখে ওর নামও তেমনই নিষ্কলঙ্ক আছে আজও।

কয়েকবার দল বদল করেছে ফ্র্যাযো, শত্রুপক্ষের হাতে ধরাও পড়েছে। কিন্তু কখনোই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি ওকে। বরং যখন যে-দলের হাতে ধরা পড়েছে, সে-দলের কর্মী হয়ে গেছে। ওকে দলে রাখতে পেরে সে-দলের নেতা খুশিই হয়েছে—ভেবেছে, নিজের শক্তি আরও বাড়ল।

মাফিয়াদের জগতে দিন ভালোই কাটছিল ফ্র্যাযোর। তারপর একদিন, পড়ন্ত এক বিকেলে, একটা ফোনকল এল ওর কাছে।

না, আণ্ডারওয়ার্ল্ডের কোনও অঘোষিত সম্রাট অথবা কোনও মাফিয়া-রাজ করেনি ফোনটা; বরং ফোন করেছে এক ভ্যাটিকান বিশপ। নাম উসবিলিয়ানো মাতিমাসি।

চার্চের প্রতি ফ্র্যাযোর ভক্তির কথা ততদিনে কানে গেছে মাতিমাসির। কানে গেছে, যে বা যারা ধর্মের বিকৃতি ঘটায় অথবা ঘটাতে চায়, তাদের প্রতি কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে ফ্র্যাযো।

ওর ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠ শুনতে পেয়ে মাতিমাসি বলে, 'নতুন একটা দল গড়েছি, আমি চাই তুমি যোগ দাও আমাদের সঙ্গে।'

কী করতে হবে তা যখন জানতে পারে ফ্র্যাযো, সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয় প্রস্তাবটা। বুঝতে পারে, ওই কাজ ওকে ছাড়া

অন্য কাউকে দিয়ে হবে না।

'আমার দলের নাম *ঈশ্বরের তরবারি,*' ফোনে বলেছিল মাতিমাসি, 'আমি চাই তুমি সে-তরবারির ফলা হবে। পারবে না?'

'পারবো,' জানিয়ে দিয়েছিল ফ্র্যাযো।

আট

প্যারিসের একটা রিং-রোড ধরে ছুটে চলেছে রানার ভাড়া-করা গাড়িটা। চালাচ্ছে ও নিজেই।

পাশের সিটে বসা সেলেনা বলল, 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে তুমি বোধহয় মন্দ রোজগার করো না। প্যারিসে সুরক্ষিত স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেণ্ট আছে তোমার, আবার ইচ্ছা হলেই ভাড়া করতে পারছ দামি দামি গাড়ি। ...তোমার নামটা আসল তো?'

'হুঁ।'

'নামটা সুন্দর।'

ঘাড় ফিরিয়ে সেলেনার চেহারাটা দেখে নিল রানা। 'তুমি কি বলতে চাইছ, নামটা আমার মতো একজন মিথ্যেবাদীর তুলনায় সুন্দর?'

'না, তা বলিনি। ও-রকম নাম আসলে কখনও শুনিনি আমি আগে। ...কোন্ দেশের লোক তুমি?'

'আমি দক্ষিণ এশীয়।'

মাথা ঝাঁকাল সেলেনা। 'তা-ই ভেবেছিলাম।'

'প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে কিছু জানা আছে?' কাজের কথায় এল রানা।

'ওটার অস্তিত্ব আছে কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত নই আমি। কেউ বলে আছে, কেউ বলে নেই। কেউ জানে না ওই পাণ্ডুলিপি আসলে কী, অথবা ওটাতে আসলে কী লিখেছেন প্যানাসেলসাস। ...মিস্টার উইনিং মনে হয় মরিয়া হয়ে উঠেছেন পাণ্ডুলিপিটার জন্য?'

'কেন মনে হলো কথাটা?'

'তা না হলে তোমার মতো কাউকে ভাড়া করার কথা নয়।'

'মিস্টার উইনিং-এর কথা বাদ দাও। অ্যালকেমির কথা বলো। আসলেই কি এমন কোনও মহৌষধ আছে, যা খেলে মুমূর্ষু কেউ নতুন জীবন পাবে?'

'যদি থেকেও থাকে, আমি শুনিনি। আমি নিজে যদি কখনও আবিষ্কার করতে পারি ও-রকম কিছু, বিনা লাইসেন্সে প্রয়োগ করবো না কারও ওপর। ...কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'রাফায়েল সাশা-র নাম শুনেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সেলেনা। শুনেছে। 'সাশা এককালে প্যানাসেলসাসের সহকারী ছিলেন। ...কেন?'

'প্যানাসেলসাসের ব্যাপারে পড়াশোনা করেছি আমি। জানতে পেরেছি, তিনি গায়েব হয়ে যাওয়ার আগে সাশাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ দিয়েছিলেন। ঘটনাটা উনিশ শ' ছাব্বিশ সালের।'

'কিন্তু...' সেলেনার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, 'আমি যতদূর জানি, আজ থেকে অনেক বছর আগে মারা গেছেন সাশা।'

'হ্যাঁ। আমি জানতে চাই, তাঁকে ঠিক কী দিয়ে গিয়েছিলেন প্যানাসেলসাস।'

'কীভাবে জানতে পারবে?'

'খোঁজ নিয়েছি সাশার কোনও বংশধর আছে কি না।'

‘কী জানতে পেরেছ?’

‘তাঁর ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে।’

‘কী নাম লোকটার?’

‘গ্যাব্রিয়েল সাশা। এককালে ব্যাংকে চাকরি করতেন। এখন রিটায়ার্ড।’

‘কিছু জানা গেছে তাঁর কাছ থেকে?’

‘না, তেমন কিছু না। সত্যি বলতে কী, যে-ই প্যানাসেলসাসের নাম উচ্চারণ করেছি, অমনি গ্যাব্রিয়েল কেটে পড়তে বলেছেন আমাকে।’

কিছু বলল না সেলেনা।

‘যা-হোক, আমি ভেবেছিলাম আর কখনও কথা হবে না গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে। কিন্তু আজ সকালে, তুমি তখন ঘুমিয়ে ছিলে, আমার নম্বরে ফোন করেছিল তাঁর ছেলে।’

‘কী বলল?’

‘গ্যাব্রিয়েলের একটা ভাই আছে, নাম লোরঁন সাশা। গ্যাব্রিয়েল এই জীবনে যতটা সফল, লোরঁন ততটাই বিফল। কারণ লোরঁন তাঁর বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন, যা গ্যাব্রিয়েলের দৃষ্টিতে জাদুবিদ্যার চর্চা এবং সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু না।’

‘লোরঁন কি বেঁচে আছেন?’

‘গ্যাব্রিয়েলের ছেলে তা-ই বলেছে।’

‘কোথায় আছেন তিনি?’

এদিকওদিক তাকাল রানা। ‘এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে, পুরনো এক ফার্ম হাউসে।’

সিটে হেলান দিল সেলেনা। ‘আমরা কি সেখানেই যাচ্ছি?’

‘হুঁ। তবে উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। দেখা হলে লোরঁন আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কি না, সন্দেহ আছে।’

‘কেন?’

‘তিনি নাকি খুবই আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের। লোকজনের সঙ্গে মেশেন না। কারও সঙ্গে দেখাও করতে চান না।’

‘কী মনে হয় তোমার...লোরঁনের কাছে এখনও রয়ে গেছে ওসব কাগজ?’

‘জানি না। আমি আসলে দেখতে চাইছি কী ঘটে।’

‘ইণ্টারেস্টিং,’ চোখেমুখে কৌতূহল ফুটেছে সেলেনার।

‘বিপজ্জনকও হতে পারে।’

রানার দিকে তাকাল সেলেনা। ‘কেন?’

‘গ্যাব্রিয়েলের ছেলে বলেছে, আমি ছাড়া আরও লোক যোগাযোগ করেছে ওর বাবার সঙ্গে, জানতে চেয়েছে প্যানাসেলসাসের ব্যাপারে।’

‘মানে?’

‘ওদের বাসায় দু’-এক দিন আগে তিনজন লোক গিয়েছিল। এটা-সেটা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে তারা। এমনকী জানতে চেয়েছে আমার ব্যাপারেও।’

কিছু বলল না সেলেনা। ওর উৎসাহ নিভে গেছে।

‘এখন কথা হচ্ছে,’ বলছে রানা, ‘ওই তিনজন লোক কি ইতিমধ্যে খুঁজে পেয়েছে লোরঁনকে? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে আরেকটা ফাঁদে পা দিতে চলেছি আমরা সম্ভবত।’

পুরনো সেই ফার্মহাউসে পৌঁছুতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগল রানা-সেলেনার।

ফার্ম থেকে কয়েক শ’ মিটার দূরে, রাস্তার একধারে খালি জায়গা আছে; অন্য কোনও গাড়ির চলাচলের অসুবিধা না করে পার্ক করা যাবে। ওখানে গাড়ি রাখল রানা। এদিকওদিক তাকাল। ‘জায়গামতো এসে গেছি মনে হয়।’

আকাশে মেঘ ঘনাচ্ছে, একটু-আধটু বিজলিও চমকাচ্ছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। নামল রানা, জ্যাকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আলগা করে দিল শোল্ডার হোলস্টারের স্ট্র্যাপ।

জরুরি মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে চায় ওয়ালথারটা। আড়চোখে তাকাল সেলেনার দিকে। মেয়েটা খুব সম্ভব খেয়াল করেনি ব্যাপারটা।

খোয়া বিছানো চত্বরে হাজির হলো ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই। হাতের দু'পাশে ক্ষয়িষ্ণু কয়েকটা ফার্ম বিল্ডিং। ধসে পড়া কাউশেডের আড়ালে দেখা যাচ্ছে উঁচু কাঠের-বার্ন, পড়ি পড়ি করছে। ওটার বেশিরভাগ জানালা ভাঙা, পেরেক দিয়ে তক্তা ঠুকে আটকে রাখা হয়েছে কোনওরকমে। কুচকুচে কালো ধাতব চিমনি থেকে বের হচ্ছে পাতলা ধোঁয়া।

সতর্ক দৃষ্টিতে এদিকওদিক তাকাল রানা, প্রস্তুত হয়ে আছে বিপদের জন্য। ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ধারেকাছে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

বার্নটাও মনে হয় খালি। ভেতরে ঢুকল ওরা। চারদিকের আবহাওয়া কেমন গুমোট, আজব কোনও ধোঁয়ার কারণে দম আটকে আসতে চায়। কিছু একটা পোড়ানো হচ্ছে কাছেপিঠে কোথাও, ধোঁয়ায় নাক জ্বালা করছে। ধুলো উড়ে বেড়াচ্ছে বাতাসে। মনে হয় কিছুক্ষণ আগে ঝাঁট দেয়া হয়েছে মেঝে। আপাতত চোখে পড়ছে একটা মাত্র বড় ঘর—জানালার ফাঁকফোকর আর তক্তার ফুটো দিয়ে ঢুকে-পড়া দুধসাদা সূর্যালোকে আধো আলোকিত হয়ে আছে। কড়িকাঠের আড়ালে-আবডালে বাসা বেঁধেছে একদল পাখি, ওগুলোর কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। ঘরের এককোনায় প্ল্যাটফর্মের মঞ্চের মতো কী-একটা দেখা যাচ্ছে, বাজে কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে সেটা। বহু পুরনো একটা আর্মচেয়ার আছে ওটার ওপর। মান্ধাতার আমলের টিভি-সহ একটা টেবিলও আছে। আর আছে নোংরা দু'-তিনটে কম্বলবিছানো একটা খাট।

আরেক কোনায় দেখা যাচ্ছে বেশ বড় একটা ফার্নেস—কালি আর ঝুলের কারণে সম্পূর্ণ কালো হয়ে গেছে।

কয়েক ইঞ্চি খুলে আছে ওটার দরজা, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া আর ঝাঁঝালো একজাতের গন্ধ। কোন্ জাতের লাকড়ি পোড়ানো হচ্ছে ফার্নেসের ভেতরে কে জানে।

ফার্নেসের দু'পাশে এলোপাতাড়ি অবস্থায় আছে কয়েকটা মেকশিফ্‌ট টেবিল। বইয়ের স্তূপ দেখা যাচ্ছে ওগুলোর ওপর। ছড়ানোছিটানো অবস্থায় আরও আছে বেশকিছু কাগজ। ধাতু আর কাচের কন্টেইনারও দেখা যাচ্ছে কতগুলো। কোনও কোনও কন্টেইনারের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় আছে রাবার বা পার্সপেক্সের টিউব। গ্যাস বোতলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় আছে কয়েকটা বুনসেন বার্নার। বিভিন্ন রঙের তরল টগবগ করে ফুটছে কোনও কোনও বার্নারে। বিশ্রী গন্ধের অসহ্য বাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। ঘরের কোনায় কোনায় স্তূপাকারে জমিয়ে রাখা হয়েছে ভাঙাচোরা বাক্স, কন্টেইনার, খালি বোতল।

'বিজ্ঞানীরা যেমন হয়,' নিচু গলায় মন্তব্য করল সেলেনা।

'অ্যালকেমিস্টরা যেমন হয়,' শুধরে দেয়ার কায়দায় বলল রানা, ওর কণ্ঠও নিচু। এগিয়ে গেল একধারের কয়েকটা টেবিলের দিকে। কিছু একটা নজর কেড়েছে ওর।

ধূসর হয়ে-আসা পুরনো কতগুলো কাগজ...সম্ভবত পাণ্ডুলিপি...চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে স্বচ্ছ কাচের পেপারওয়েট দিয়ে।

কাচের অর্ধগোলকটা সরিয়ে কাগজগুলো হাতে নিল রানা। আপনাআপনি পাকিয়ে এল ওগুলো, ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ দৃশ্যমান হলো ঘরে-ঢুকে-পড়া সূর্যালোকে। আলোয় ধরল রানা পাণ্ডুলিপিটা, গোটানো অবস্থা থেকে মেলল।

হাতের-লেখা দীর্ঘ আঁচড় সম্বলিত, দেখলে মনে পড়ে যায় মাকড়সার পায়ের কথা:

চ-শেং গুল্মলতা যদি কাউকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে
রাখতে পারে,
তা হলে এই মহৌষধ কেন কাউকে অমরত্ব দিতে
পারবে না?
স্বর্ণ, প্রাকৃতিকভাবেই, কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, নষ্ট
হয় না;
স্বর্ণ সবচেয়ে দামি ধাতুগুলোর একটি।
অ্যালকেমিস্ট যদি এই মহৌষধ তৈরি করেন,
পরমায়ু লাভ করতে পারবেন তিনি;
তাঁর যেসব চুল সাদা হয়ে গেছে
সেগুলো কালো হয়ে যাবে,
যেসব দাঁত পড়ে গেছে সেগুলো নতুন করে গজাবে।
বৃদ্ধ ওই লোক যৌবন ফিরে পাবেন আবার।
তাঁর প্রেমিকা হয়ে যাবে যুবতী।
মৃত্যুকে পরাজিত করে অনন্তজীবন লাভ করবেন তাঁরা।

'কিছু পেয়েছ মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল সেলেনা, রানার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে পাণ্ডুলিপিটার দিকে।

'পেয়েছি, কিন্তু সেটা কী, জানি না। তবে ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'দেখি,' হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো নিল সেলেনা রানার হাত থেকে, দ্রুত নজর বোলাচ্ছে।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে রানা। আরও কোনও পাণ্ডুলিপি আছে কি না খুঁজছে। কিন্তু স্তূপ-হয়ে-থাকা এলোমেলো ধুলোমাখা কাগজগুলোর মধ্যে দুর্বোধ্য কিছু ডায়াগ্রাম, চার্ট আর সঙ্কেত ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু নজরে পড়ল না ওর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। তাকাল সেলেনার দিকে। 'কিছু বুঝতে পারলে?'

জবাব না দিয়ে ওর কাছে সরে এল সেলেনা, তাকিয়ে আছে ঘরের অন্ধকার এক কোনার দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'কেউ আসছে।'

ঘুরল রানা। হাত চলে গেছে ওয়ালথারের বাঁটে।

'যার্দি, স্ক্রু-ড্রাইভারটা দাও তো,' ঘাড় ঘুরায়নি ইলেকট্রিশিয়ান লোকটা, শুধু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ওর বাড়ানো হাতে স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে দিল না কেউ।

এবার ঘাড় ঘুরাল ইলেকট্রিশিয়ান। 'যার্দি, এই, যার্দি?'

জবাব দিল না ছেলেটা।

মই থেকে নামল লোকটা, মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। 'যার্দি, শয়তান কোথাকার, গেলে কই?

যত দিন যাচ্ছে, টিনএজার ছোকরাটা যেন বোঝায় পরিণত হচ্ছে ওর জন্য। নিজের অধীনে শিক্ষানবিশির চাকরিটা কেন দিয়েছিল সে ওই ছোকরাকে, ভাবলে মাঝেমধ্যে আফসোস হয় লোকটার। আফসোস হয় নিজের মৃত ভাইটার জন্যও। একমাত্র ভাইয়ের একমাত্র সন্তান—যার্দিকে শেষপর্যন্ত কড়া কিছু বলতে পারে না লোকটা। বিদায়ও করে দিতে পারে না। ওর হাতে যার্দিকে একরকম গছিয়েই দিয়েছে ভাইয়ের বউ নাতালিনা।

'চাচা, চাচা, দেখে যাও কী পেয়েছি!' কংক্রিটের করিডোরে প্রতিধ্বনিত হলো যার্দির কণ্ঠ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল যার্দির চাচা রিকার্ডো। ঘামেভেজা দুই হাত ওভারঅলে মুছে এগোল ওই করিডোরের দিকে। ওটার প্রবেশমুখে স্টিলের একটা দরজা আছে। কয়েক ধাপ পাথুরে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

দরজাটা ছাড়িয়ে কয়েক পা গেল রিকার্ডো, তারপর থেমে দাঁড়াল হঠাৎ। উঁকি দেয়ার ভঙ্গিতে ঘাড়টা আগে বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে। 'তুমি ওখানে করছটা কী, শুনি?'

‘চাচা, তাড়াতাড়ি এসো!’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিকার্ডো। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হলো বড় আর খালি একটা সেলারে। এখানে মেঝে থেকে পাথরের কয়েকটা কলাম উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত।

আধো আলো আধো অন্ধকারে এদিকওদিক তাকিয়ে রিকার্ডো বলল, ‘হুঁ, বুঝেছি, সাত রাজার গুপ্তধন আবিষ্কার করে ফেলেছ তুমি! বের হও এখন। কাজ পড়ে আছে। সময় নষ্ট কোরো না।’

‘সময় নষ্ট করছি না,’ হাতের জ্বলন্ত টর্চটা নাচাল যার্দি, বিশেষ একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর চাচার। ‘ওই দেখো।’

রিকার্ডো দেখতে পেল, স্টিলের কতগুলো শিক চকচক করছে।

ভালোমতো তাকাল সে। কয়েকটা খাঁচা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। একদিকের দেয়ালে আটকানো আছে লোহার বড় বড় আংটা। ধাতব কয়েকটা টেবিলও দেখা যাচ্ছে। বলল, ‘হুঁ, দেখলাম। এবার চলো।’

‘এগুলো কী?’

‘জানি না। কুকুরের খাঁচা হতে পারে। আমাদের এত মাথাব্যথার দরকার কী?’

ঝট করে চাচার দিকে তাকাল যার্দি। ‘কখনও শুনেছ, কেউ কোনও সেলারে খাঁচার ভেতরে কুকুর আটকে রাখে?’

জবাব দিল না রিকার্ডো। ওর বিরক্তি বাড়ছে উত্তরোত্তর।

হঠাৎ নাক কুঁচকে গেল যার্দির, ঘ্রাণ শুঁকছে। ডিসইনফেকট্যান্টের গন্ধ পাচ্ছে। এদিকওদিক ফেলল টর্চের আলো। কঙ্ক্রিটের মেঝেতে তৈরি করা হয়েছে ছোট একটা নালা, ওটা গিয়ে মিশেছে দূরের এক নর্দমার সঙ্গে।

‘চলো, চলো,’ তাগাদা দিল রিকার্ডো। ‘আরও এক

জায়গায় যাওয়ার কথা আছে, এখানে যদি কাজ সারতে দেরি হয় তা হলে সেখানে যেতেও দেরি হয়ে যাবে।'

'এক মিনিট,' চকচকে অন্য কিছু-একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যার্দির, সেদিকে পা বাড়াল সে।

'এখানে আর এক সেকেণ্ডও না!' হুঙ্কার ছাড়ল রিকার্ডো। 'চলো!'

পিস্তল বের করে ফেলেছিল রানা। কিন্তু যখন দেখল কে আছে ঘরে, ওটা ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে।

বৃদ্ধ এক লোক এগিয়ে আসছেন। তাঁর দুই চোখ যেন জ্বলছে ভাটার আগুনের মতো। পাতলা হয়ে-আসা ধূসর চুল উস্কখুস্ক, জট পাকিয়ে গেছে কোথাও কোথাও। চেহারায় সাদা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। বাড়ি মারার ভঙ্গিতে একহাতে তুলে ধরেছেন একটা লাঠি।

কাছে এসে বুট-পরা পা ঠুকলেন তিনি মেঝেতে। 'ওটা নামিয়ে রাখো বলছি!' হুমকিটা সেলেনার উদ্দেশে। 'খবরদার হাত দেবে না এসবে!'

সুবোধ বালিকার মতো আদেশ পালন করল সেলেনা।

লাফিয়ে আগে বাড়লেন বৃদ্ধ, খালি হাত দিয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিলেন পাণ্ডুলিপিটা, জড়িয়ে ধরলেন বুকের সঙ্গে—যেন হারানো সন্তান ফিরে পেয়েছেন। তাঁর পরনে বহু পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া একটা কোঁচকানো গ্রেটকোট। বয়স অথবা অন্য যে-কোনও কারণে হোক, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, একরকমের শোঁ-শোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'তোমরা কারা?' হুমকির মতো শোনাল তাঁর কণ্ঠ, আধো আলোতেও দেখা গেল কালচে দাঁতের সারি। 'কী করছ আমার বাড়িতে?'

বৃদ্ধের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেলেনা। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, গত ত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন

প্যারিসের রাস্তায়-রাস্তায়, শেষকালে যেন অলৌকিক কোনও ঘটনায় ঠাঁই পেয়েছেন এই বার্নে।

'আমরা মসিয়ে লোরঁনের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল রানা। 'কিছু মনে করবেন না, দরজাটা খোলা ছিল, তাই অনুমতি নিতে পারিনি...'

'তোমরা কারা?' আবারও জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ। 'পুলিশের লোক? তা হলে এই মুহূর্তে বিদায় হও এখান থেকে। একা থাকতে দাও আমাকে।' এগিয়ে যাচ্ছেন ঘরের অন্ধকার এককোনার দিকে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে নাচাচ্ছেন লাঠিটা। পাণ্ডুলিপিটা এখনও জড়িয়ে ধরে রেখেছেন বুকের সঙ্গে।

'আমরা পুলিশের লোক নই,' বলল রানা। 'আপনিই কি লোরঁন?'

'হ্যাঁ,' যেন মুখ ঝামটা মারলেন বৃদ্ধ। 'কেন?'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।'

'কী এমন হয়েছে যে...' কথা শেষ করতে পারলেন না বৃদ্ধ, কাঁপতে শুরু করেছেন হঠাৎ করেই। কাঁপতে কাঁপতে পড়েই গেলেন মেঝেতে। লাঠি আর পাণ্ডুলিপি ছুটে গেল তাঁর হাত থেকে।

ছুটে গেল রানা, তুলল বৃদ্ধকে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সেটাতে বসিয়ে দিল। নিজে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বৃদ্ধের পাশে।

কাশছেন লোরঁন, কফ উঠে এসেছে তাঁর মুখে। মুখ ঘুরিয়ে থু করে ছুঁড়ে ফেললেন সেটা ঘরের মেঝেতেই।

গা গুলিয়ে উঠল সেলেনার।

'আমার নাম মাসুদ রানা। একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজতে এসেছি আমি এখানে।'

'কীসের পাণ্ডুলিপি?' লোরঁনের কাশির দমক কিছুটা কমেছে।

'হেনরিখ প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপি। ...কিছু মনে করবেন না, আমি কি ডাক্তার ডেকে আনবো আপনার জন্য? আপনাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

মাথা নেড়ে মানা করে দিলেন লোরঁন। কাশির প্রকোপ আরও কমেছে তাঁর। চুপ করে আছেন তিনি, হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করছেন। মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে এসেছে, একহাতের তালুতে মুছে ফেললেন সেটা। তাঁর দুই হাতই হাড় জিরজিরে, গেঁটেবাতের রোগীদের মতো। পাণ্ডুর চামড়ায় স্পষ্ট দেখা যায় নীল ধমনীগুলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি ঠিক আছি।' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন রানার দিকে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'কী যেন বলছিলে তুমি প্যানাসেলসাসের ব্যাপারে?'

'তিনি আপনার বাবার শিক্ষক ছিলেন, ঠিক না?'

'হুঁ, তিনি আমার বাবাকে অনেককিছু শিখিয়েছিলেন,' আবারও যেন শ্বাসকষ্ট না হয় সেজন্য বিড়বিড় করে বললেন কথাটা লোরঁন। খুবই নিচু গলায় আরও কী-যেন বললেন, এত কাছে থাকার পরও শুনতে পেল না রানা।

ওর মনে হচ্ছে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন লোরঁন, হারিয়ে গেছেন আত্মচিন্তায়।

মেঝেতে পড়ে-যাওয়া লাঠিটা তুলে নিল রানা হাত বাড়িয়ে। ওটা ঠেস দিয়ে রাখল চেয়ারের সঙ্গে। হাত বাড়িয়ে তুলল পাণ্ডুলিপিটাও।

রানার হাতে ওই কাগজগুলো দেখামাত্র যেন হুঁশ ফিরল লোরঁনের। ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন তিনি ওগুলো। 'দাও বলছি!'

'এগুলো আসলে কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার জেনে কাজ কী?'

'জানার জন্যই এসেছি আমি এখানে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন লোরঁন, রানার প্রশ্নের জবাব দেবেন কি না ভাবছেন সম্ভবত। তারপর বললেন, 'এটা *জীবনের রহস্য*। দ্বিতীয় শতকের জিনিস...চাইনিয। এককথায় অমূল্য।'

রানার বলতে ইচ্ছা হলো, জীবনের রহস্য যদি খাঁটি হবে, তা হলে আজ আপনার এই দশা কেন? কিন্তু বলল না কথাটা।

ওর দিকে তাকিয়ে আছেন লোরঁন, সম্ভবত বুঝবার চেষ্টা করছেন তাঁর কথা বিশ্বাস করেছে কি না ও। কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে ধরলেন লাঠিটা, ওটাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কাঁপতে কাঁপতে, খালি হাতের একটা আঙুল তুললেন শাসানোর কায়দায়। 'আমার কাছে কেন এসেছ? যত্তোসব ভিনদেশি চোরের দল! যখন-তখন ঢুকে পড়ে বাড়িতে, হাতের সামনে যা পায় তা-ই চুরি করে নিয়ে যায়!'

'না, মসিয়ে, আমরা চোর না,' বলল রানা। 'আমরা শুধু কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।'

মুখ ঘুরিয়ে থুতু ফেললেন লোরঁন। 'কথা? বের হও আমার বাড়ি থেকে!' থুতু ছিটকে বের হচ্ছে তাঁর মুখ থেকে।

এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলেন একটা টেস্টটিউব, একজাতের সবুজ তরল টগবগ করছিল ওটার ভেতরে। এমন ভান করলেন, যেন এখনই ওই তরল ছুঁড়ে মারবেন রানা আর সেলেনার ওপর। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, কাঁপতে শুরু করলেন আবার, আগেরবারের মতোই পড়ে গেলেন মেঝেতে। টেস্টটিউবটা ছুটে গেল তাঁর হাত থেকে, মেঝের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে গেল। সবুজ তরল ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

উঠে বসলেন লোরঁন, কাজটা করতে কষ্ট হলো তাঁর। লাঠিটা টেনে নিলেন নিজের দিকে। ওটাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে যাচ্ছেন সেই প্ল্যাটফর্মের দিকে। উঠলেন

সেখানে, লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বসে পড়লেন খাটের একপ্রান্তে। কেমন দুর্বল আর অসুস্থ দেখাচ্ছে তাঁকে।

তাঁর জন্য একগ্লাস পানি নিয়ে এল সেলেনা, খাওয়াল তাঁকে। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি দেখা দিল লোরঁনের চোখে।

'আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেন আপনি,' বলল রানা। 'আমরা কোনওকিছুই চুরি করতে চাই না আপনার কাছ থেকে। বরং যদি সাহায্য করেন, তা হলে বিনিময়ে টাকা দেবো আপনাকে। রাজি আছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন লোরঁন। আরেক চুমুক পানি খেলেন।

'ভালো,' মাথা ঝাঁকাল রানাও। 'এবার মন দিয়ে শুনুন। উনিশ শ' ছাব্বিশ সালে গায়েব হয়ে যান প্যানাসেলসাস। তবে তার আগে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ দিয়ে যান তিনি আপনার বাবাকে। আমি জানতে চাই, ওসব কাগজের মধ্যে কোনও পাণ্ডুলিপি ছিল কি না।'

মাথা নাড়লেন লোরঁন। 'আমার বাবার কাছে অনেক কাগজ ছিল। ওগুলোর বেশিরভাগই পুড়িয়ে ছাই করেছেন তিনি মরার আগে। যেগুলো রয়ে গিয়েছিল আমার কাছে, সেগুলোর বেশিরভাগ চুরি হয়ে গেছে।'

'কে চুরি করেছে?'

'হেলমুট ওয়ার্নার...আমার অ্যাসিসটেন্ট। অ্যালকেমির রহস্য শেখার জন্য আমার কাছে এসেছিল সে। ...ভাবলে নিজের ওপরই রাগ হয় এখন—ওকে থাকতে দিয়েছি আমি, খাইয়েছি, অনেককিছু শিখিয়েছি। বিনিময়ে কুত্তার-বাচ্চাটা...' দম ফুরিয়ে গেল লোরঁনের, কিছুক্ষণ হাঁপালেন। 'ওকে বিশ্বাস করেছিলাম, সেটা ভঙ্গ করেছে সে। দশ বছর হয়ে গেল দেখা হয়নি শয়তানটার সঙ্গে।'

'তারমানে আপনার বাবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ নিয়ে পালিয়েছে হেলমুট?'

মাথা ঝাঁকালেন লোরঁন। 'এবং একটা গোল্ড ক্রস-ও।'

‘গোল্ড ক্রস?’

‘হুঁ...জিনিসটা যেমন পুরনো তেমন সুন্দর, আবিষ্কার করেছিলেন প্যানাসেলসাস নিজে, বহু বছর আগে।’ আবারও কাশতে শুরু করলেন লোরঁন, থুতু ছিটকে বের হচ্ছে তাঁর মুখ থেকে। কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে বললেন, ‘প্যানাসেলসাস গায়েব হয়ে যাওয়ার আগে ওই ক্রস দিয়ে গিয়েছিলেন বাবাকে।’

‘প্যানাসেলসাস গায়েব হয়ে গেলেন কেন?’

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন লোরঁন। ‘তাঁর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল...আমার মতো।’

‘কে করেছিল?’

‘এমন কেউ, যাকে তিনি চোখ বুজে বিশ্বাস করতেন।’ তোষকের এককোনা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন লোরঁন, সাবধানে বের করে আনলেন পুরনো একটা বই। ক্ষয়ে-যাওয়া নীল চামড়া দিয়ে মোড়ানো আছে ওটা। কোনও কোনও জায়গায় ছিঁড়ে গেছে চামড়া। ‘এই যে।’

‘কী ওটা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ডায়েরি বা দিনলিপি বলতে পারো। প্যানাসেলসাস তাঁর নিজের জীবনের কিছু কথা লিখেছেন এটাতে। এখানে তাঁর টুকরো টুকরো জীবনকাহিনী আছে, আত্মোপলব্ধি আছে, আরও অনেককিছু আছে। ...একমাত্র এই জিনিস চুরি করতে পারেনি হেলমুট আমার কাছ থেকে।’

সেলেনার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা। ‘দেখতে পারি ওটা?’

জবাব দিলেন না লোরঁন। খুব সাবধানে খুললেন ডায়েরিটা, ওটার একটা পৃষ্ঠায় নজর বুলাচ্ছেন।

আড়চোখে তাকাল রানাও। পুরনো আমলের হাতের-লেখা দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, ‘ওটা কি প্যানাসেলসাসের হাতের-লেখা?’

'হুঁ,' বিড়বিড় করলেন লোরঁন। ডায়েরির ভেতরের কভারে প্যানাসেলসাসের স্বাক্ষর দেখালেন।

'আমি ডায়েরিটা কিনতে চাই আপনার কাছ থেকে,' বলল রানা।

নাক দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করলেন লোরঁন। 'এটা বিক্রির জন্য না।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'হেলমুট এখন কোথায় আছে, বলতে পারেন?'

'নরকের আগুনে জ্বলছে সম্ভবত।'

'মানে মরে গেছে?'

জবাব দিলেন না লোরঁন, আত্মচিন্তায় হারিয়ে গেছেন।

'লোকটা কি মরে গেছে?' আবারও জানতে চাইল রানা।

মুখে রা নেই লোরঁনের। আসলেই আত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছেন তিনি।

তাঁর চোখের সামনে একটা হাত নাড়ল রানা।

লাভ হলো না। চিন্তার জগৎ থেকে ফিরলেন না লোরঁন।

'তাঁর কাছ থেকে আর কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না আমার,' বলল সেলেনা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। হাতটা রাখল লোরঁনের কাঁধে, আলতো ঝাঁকুনি দিল তাঁকে। 'একটা কথা বলছি, দয়া করে মন দিয়ে শুনুন এবং মনে রাখার চেষ্টা করুন। অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও এই বার্ন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে আপনাকে।'

লোরঁনের দৃষ্টিতে যেন প্রাণ ফিরল। 'কেন?'

'কারণ কয়েকজন লোক আসতে পারে এখানে, পাকড়াও করতে পারে আপনাকে। ওরা ভালো না। ওদের খপ্পরে পড়া উচিত হবে না আপনার মতো মানুষের। ওরা আপনার ভাইয়ের বাসাতেও গিয়েছিল, এটা-সেটা নানান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে তাঁকে।'

‘তো?’

‘ওরা জানে কোথায় পাওয়া যেতে পারে আপনাকে। ওরা যা জানতে চাইবে, তা যদি না-বলেন, আপনার গায়ে হাত তুলতে পারে ওরা। তাই বলছিলাম আপনি যদি কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও চলে যান, ভালো হয়।’ পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করল রানা, দিল লোরঁনের হাতে।

একসঙ্গে এত টাকা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল বৃদ্ধের। ‘কেন টাকা দিচ্ছ আমাকে?’

‘এখান থেকে চলে গেলে যাতে দিন কাটাতে অসুবিধা না হয় আপনার, সেজন্য। এই টাকা দিয়ে নতুন কাপড় কিনবেন, ডাক্তার দেখাবেন। তবে সবার আগে যাবেন রেলস্টেশনে। ট্রেনে করে চলে যান দূরে কোথাও, দু’-এক মাস থাকুন সেখানে।’ আরও একগাদা নোট বের করল রানা। ‘এগুলোও দেবো আপনাকে, যদি আমার কাছে ওই ডায়েরিটা বিক্রি করতে রাজি থাকেন।’

নয়

‘পড়তে কেমন লাগছে?’ রানাকে জিজ্ঞেস করল সেলেনা।

‘ইণ্টারেস্টিং,’ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা, মুখ তুলে তাকাল।

ওর কাছে ডায়েরিটা শেষপর্যন্ত বিক্রি করেছেন লোরঁন, ওটা নিয়ে সেফহাউসে ফিরে এসেছে ও। এসেই কিচেন-টেবিলে বসে গেছে, পড়ছে। ওর মুখোমুখি বসেছে সেলেনা,

তবে তার আগে কফি বানিয়ে নিয়েছে নিজের জন্য। করার মতো কিছু নেই, তাই বিরক্তির ছাপ পড়েছে মেয়েটার চেহারায়।

পাত্তা দিল না রানা। ফিরে গেল প্যানাসেলসাসের ডায়েরির বহু-পুরনো হলদেটে পৃষ্ঠাগুলোয়।

ডায়েরির কোনও কোনও পাতা, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে খোয়া গেছে। কোনও কোনও পাতা এতই ক্ষয়ে গেছে যে, পড়ার উপযোগী অবস্থায় নেই।

রানা আশা করছে, এই ডায়েরির কোথাও-না-কোথাও এমন কোনও ক্লু দিয়ে গেছেন প্যানাসেলসাস, যা বুঝতে পারলে হয়তো তথাকথিত মহৌষধের সন্ধান পাওয়া যাবে। অথবা, হতে পারে, ওই মহৌষধ বানানোর প্রস্তুতপ্রণালী লিখেছেন তিনি কোনও-না-কোনও কায়দায়।

একটা একটা করে পাতা উল্টাচ্ছে রানা; যতটুকু পড়া যায়, পড়ছে। এবং যত পড়ছে, ওর আশা তত ফিকে হচ্ছে। ডায়েরিটা আহামরি কিছু না...আর দশটা সাধারণ ডায়েরি যেমন হয় অনেকটা তেমন—গায়েব হয়ে যাওয়ার আগে রোজনামচা লেখার চেষ্টা করেছেন প্যানাসেলসাস, যেদিন যা মনে এসেছে তাঁর তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪

পাহাড় বেয়ে উঠলাম। খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ, পথটাও অনেক দীর্ঘ। এসব কাজে আজকাল কষ্ট হয়, আসলে বুড়িয়ে যাচ্ছি আমি দিন-দিন।

চূড়ায় উঠে বসে পড়লাম একজায়গায়। হাঁপাচ্ছিলাম। শরীরের সবগুলো পেশি যেন কাঁপছিল। আজ সকাল থেকেই তুষার পড়ছে, কিছু তুষার জমেছে আমার চোখের পাতায়; মুছে ফেললাম ওগুলো। ঘাড়টা একটু উঁচু করে তাকালাম

সামনের দুর্গটার দিকে।

এককালে কী ছিল ওই দুর্গ, আর কালের ছোবলে এখন কী অবস্থা হয়েছে ওটার! যুদ্ধ আর মহামারী মানবসভ্যতার অবশ্যম্ভাবী দুটো ঘটনা; সভ্যতার শেকড়ে ওসব আঘাত করেছে বার বার, ভবিষ্যতেও করবে। যুদ্ধবাজ একেকটা জাতি রাজত্ব করেছে পৃথিবীর বুকে, একসময় নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে। হাতবদল হয়েছে একই ভূখণ্ড—এক শাসকের হাত থেকে পড়েছে আরেক শাসকের হাতে।

আজ থেকে পাঁচ শ' বছর আগেই পুরনো হয়ে গিয়েছিল আমার সামনের ওই দুর্গ, ধসে পড়েছিল ওটার দেয়ালের কোনও কোনও অংশ। হবে না-ই বা কেন? অত্যাচার কি কম চালানো হয়েছে ওটার ওপর? কখনও গাছের গুঁড়ি বয়ে এনে সেটা দিয়ে জোরে গুঁতো দেয়া হয়েছে ওটার সীমানা-প্রাচীরের ওপর, কখনও আবার বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। এককালে দুর্গের যেসব জায়গায় উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল গোলাকার কয়েকটা টাওয়ার, আজ সেখানে যেন মুখব্যাদান করে আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু ইট। মানুষের নৃশংসতার সাক্ষী হয়ে মস আর লাইকেনে ঢেকে গেছে কোনও কোনও দেয়াল। কোনও এককালে আগুন লেগেছিল অথবা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল দুর্গের ভেতরে, তাই ধসে পড়েছে একদিকের ছাদ। কফিনে পেরেক ঠোকা বলে একটা কথা আছে; ওই দুর্গের জন্য সে-কাজ করে দিয়েছে সময়, বাতাস, বৃষ্টি আর রোদ।

দুর্গের ভেতরে খোলা জায়গা বলতে যা আছে, তার বেশিরভাগই ছেয়ে গেছে চিরসবুজ একজাতের কাঁটাগুল্মে। কোথাও আবার বিস্তৃত হয়েছে কাঁটাগাছের ঝোপ। তাই প্রধান প্রবেশদ্বারের গথিক আর্চওয়ের ভেতর দিয়ে ঢোকার জন্য যথেষ্ট কসরত করতে হলো আমাকে, পথ বানিয়ে নিতে হলো। কাঠের বিশাল দরজায় পচন ধরেছে বহু আগেই; একদিকের পাল্লা গায়েব হয়ে গেছে, আরেকটা পাল্লার

অংশবিশেষ আস্ত আছে। লোহার কালো-হয়ে-যাওয়া তিন-চারটে কজ্জাও টিকে আছে, মরচে-পড়া রিভেট থেকে ঝুলছে কোনওরকমে।

আমার চারদিকে মৃত্যুপুরীর মতো সুনসান নীরবতা। মনে হচ্ছে, কোনও কবরস্থানে ঢুকেছি। যা খুঁজতে এসেছি, তা আদৌ পাবো কি না ভেবে হতাশ হয়ে পড়েছি।

তুষারে-ছাওয়া কোর্টইয়ার্ডের ভেতরে ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দেয়াল আর র‍্যামপার্টের অবশিষ্টাংশের ওপর নজর বোলালাম আর দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হঠাৎ করেই খুঁজে পেলাম প্যাঁচানো কয়েক ধাপ সিঁড়ি, পাক খেয়ে-খেয়ে নেমে গেছে পুরনো একটা স্টোররুমের দিকে। গেলাম সেখানে।

বাতাসের মাতামাতি নেই এই জায়গায়, তাই ছোট করে আগুন জ্বেলে বসে পড়লাম ওটার ধারে। উষ্ণতা স্পর্শ করল আমাকে; হাড়কাঁপানো শীতে ওই স্পর্শ প্রেয়সীর কাঙ্ক্ষিত-পরশের মতো লাগল আমার কাছে।

দুর্গের ওই ধ্বংসস্তূপের ভেতরে টানা দুটো দিন আমাকে আটকে রাখল প্রবল তুষারঝড়। যেটুকু রুটি আর পনির নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে, তা খেয়ে টিকে থাকা দায়। কপাল ভালো, আমার সঙ্গে একটা কম্বল আছে—নইলে হয়তো জমে যেতাম ঠাণ্ডায়। একটা সসপ্যানও আছে; ওটাতে আগুনের-আঁচে তুষার গলিয়ে পানি খাই। করার মতো কিছু নেই, তাই ইতস্তত ঘুরে বেড়াই দুর্গের এখানে-সেখানে। একটা আশা নিভু-নিভু আগুনের মতো এখনও রয়ে গেছে আমার মনে: গবেষণার মাধ্যমে যা জানতে পেরেছি, তা শেষপর্যন্ত সত্যি হবে।

আমি জানি, আমার এত কষ্টের ফল...যদি সত্যিই ও-রকম কিছু থেকে থাকে...মাটির ওপরে না, অর্থাৎ আশপাশে ছড়িয়ে-থাকা দেয়াল-র‍্যামপার্ট-টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপের ভেতর

না, বরং মাটির নিচে গড়ে-তোলা টানেল আর চেম্বারের নেটওয়ার্কের ভেতরে আছে। সময় ছোবল হেনেছে ওসব টানেলের ওপরও, ধসে পড়েছে ওগুলোর বেশিরভাগই। কিন্তু আমি জানি, কোনও কোনও টানেল এখনও আগের মতোই আছে।

স্যাঁতসেঁতে কিছু ডানজন খুঁজে পেয়েছি আমি। ধাড়ি ইঁদুরের দল এককালে বাসা বেঁধেছিল ওসব জায়গায়। মরার পর কোনও কোনও ইঁদুরের কঙ্কাল গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। জ্বলন্ত তেলপ্রদীপ হাতে নিয়ে হেঁটে বেড়াই আমি এইসব প্যাসেজওয়ে ধরে, চাতক দৃষ্টিতে এদিকওদিক তাকাই, আর মনে মনে প্রার্থনা করি সর্বশক্তিমানের কাছে।

একদিন সাড়া দিলেন তিনি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করেও যখন কোনও উপায় করতে পারছিলাম না, যখন নিষ্ঠুর হতাশা ছেয়ে দিচ্ছিল আমার মন, ঠিক তখন...অনেকটা হঠাৎ করেই...খুঁজে পেলাম প্রায়-ধসে-পড়া ভূগর্ভের এক টানেলের প্রবেশমুখ। প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে, তারপর বুকে হেঁটে ঢুকে পড়লাম ওটার ভেতরে। খেয়াল করলাম, চৌকোনা এক চেম্বারে হাজির হয়েছি। উঁচু করে ধরলাম প্রদীপটা। মাথার ওপর যেন ভল্টের মতো বিস্তৃত হয়েছে চেম্বারের ছাদ। কাঠ কেটে বিচিত্র সব নকশা বানিয়ে সেগুলো সেঁটে দেয়া হয়েছে চারদিকের দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায়। প্যারিসে যখন ছিলাম, ও-রকম নকশা দেখেছি।

খুশিতে নেচে উঠল আমার মন। বুঝতে পারছি, ঠিক জায়গাতেই হাজির হয়েছি।

চক্কর দিলাম পুরো চেম্বারে, তারপর হাজির হলাম জায়গামতো। পুরু হয়ে গজিয়েছে মাকড়সার-জাল, হাত দিয়ে সরালাম ওগুলো। ফুঁ দিয়ে সরালাম ধুলো। পাথরের একটা ব্লকের ওপর দেখতে পেলাম বিশেষ একটা চিহ্ন—সময়ের ছোবলে কেমন মলিন আর মসৃণ হয়ে গেছে।

চিহ্নটা আছে একাধিক ব্লকের গায়ে, ওগুলো অনুসরণ করে হাজির হয়ে গেলাম নির্দিষ্ট একটা ফ্ল্যাগস্টোনের কাছে। ওই পাথরের আশপাশ থেকে সরালাম স্যাঁতসেঁতে মাটি, দুই হাত দিয়ে যতখানি সম্ভব খুঁড়লাম। তারপর শরীরের সব শক্তি কাজে লাগিয়ে তুলে ফেললাম পাথরটা।

একটা গর্ত নজরে পড়ল। এতগুলো বছর ধরে খুঁজবার পর কী পেয়েছি তা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম, টের পেলাম কাঁদছি—স্বস্তি আর বিজয়োল্লাসে।

দ্রুত চলতে শুরু করেছে আমার হৃৎপিণ্ড, নিজের ধুকপুকানি টের পাচ্ছি। ভারী জিনিসটা বের করে আনলাম গর্তের ভেতর থেকে। ক্ষয়ে-যাওয়া ভেড়ার-চামড়া দিয়ে মোড়ানো আছে ওটা। সরালাম ওই আবরণ। এবার আমার হাতে ইস্পাতের একটা ছোট বাক্স।

নিজের ছুরিটা কাজে লাগিয়ে যখন ওই বাক্সের বন্ধ-ঢাকনা খুললাম, ভুস করে বাতাস বেরিয়ে গেল ওটার ভেতর থেকে। কাঁপা কাঁপা কয়েকটা আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম বাক্সের ভেতরে।

প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের দিকে। এটার গায়ে হাত দেয়া তো পরের কথা, গত প্রায় সাত শ' বছরে এটা দেখতেও পায়নি কেউ।

কী খুশি যে লাগছে আমার!

যে-আর্টিফ্যাক্টের কথা বলছি তা আমার পূর্বপুরুষদের, আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে ক্যাথারদের। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লুকানো আছে ওটা।

আমাদের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য ওটাই।

কৌতূহল বোধ করছে রানা, আরও কয়েকটা পাতা উল্টাল।

১৩ নভেম্বর, ১৯২৪

আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, প্রাচীন ওই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করাটা মুশকিল হবে আমার জন্য। ভুল প্রমাণিত হয়নি আমার অনুমান। গত কয়েকটা মাস পড়ে আছি এই এক জিনিস নিয়ে। পাণ্ডুলিপির সেকেলে ভাষাটা গাধার খাটুনি খাটাচ্ছে আমাকে।

সংকেতলিপির মাধ্যমে বিভিন্ন মেসেজ দেয়া আছে এই পাণ্ডুলিপিতে, বুঝি বুঝি করেও যেন বুঝতে পারছি না আমি। পাঠক যাতে ধোঁকা খায় সেজন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিছু গোলমেলে কথা।

তবে আজ আমি আর রাফায়েল সাশা মিলে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছি। এবং আমার মনে হচ্ছে, দীর্ঘ পরিশ্রমের পুরস্কার পেয়েছি শেষপর্যন্ত।

যেভাবে বলা হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে, সেভাবেই কাজ করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে একটা ক্রুসিবলে নিয়েছি নির্দিষ্ট কিছু জিনিস। ফার্নেসের আগুনের আঁচে গলিয়েছি ওগুলো। লবণ আলাদা করে নিয়েছি ওই তরল-মিশ্রণ থেকে। তারপর চালানো হয়েছে পাতনপদ্ধতি। আমাদের গবেষণাগার তখন ভরে গিয়েছিল আজব এক হিসহিস শব্দ আর বাষ্পে। শুধু তা-ই না, তাজা মাটি এবং মিষ্টি-গন্ধ ফুলের মতো একজাতের ঘ্রাণে যেন ম-ম করছিল পুরো গবেষণাগার—আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি আর সাশা। পাতনপদ্ধতিতে পাওয়া পানির রঙ ততক্ষণে সোনালি হয়ে গেছে। ওটার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে পারদ মেশালাম আমরা, তারপর ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিলাম দ্রবণটা।

পরে যখন ক্রুসিবলটা খুললাম, তখন দেখি...

আর্দ্রতার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে ওই পাতার বাকি লেখা।

পরের কয়েকটা পাতা খেয়ে ফেলেছে ঘুণপোকা।

'ধ্যাৎ!' বিড়বিড় করল রানা।

পাতা উল্টে চলল ও। কোনও কোনও জায়গার লেখা পড়া যায়, তবে আর্দ্রতার কারণে অনেক মলিন হয়ে গেছে। কোথাও আবার শুধু কয়েকটা আঁচড় চোখে পড়ে।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪

কী নাম দেবো আমি এটার? মহৌষধ? নাকি পরমায়ু লাভের পানীয়?

আমার পূর্বপুরুষরা যেভাবে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, সে-কায়দা অবলম্বন করে ওই মিশ্রণ বা দ্রবণ বানিয়েছি আমরা। কিন্তু সাশা ওটা খেতে সাহস পাচ্ছে না।

আমি ত্রিশ ড্র্যামের মতো খেয়েছি। কেমন মিষ্টি-মিষ্টি লাগল। এখন পর্যন্ত কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি আমার শরীরে। আরও সময় যাক। তারপর বোঝা যাবে আসলেই পরমায়ু দেয়ার ক্ষমতা আছে কি না এই তরলের...

হতাশ লাগছে রানার। কারণ ডায়েরির যেখানেই উত্তেজনাকর কিছু পাচ্ছে, সেখানেই কিছুদূর এগোনোর পর হয় মলিন হয়ে গেছে লেখা, নয়তো পোকায় খেয়ে ফেলেছে পৃষ্ঠার বেশিরভাগ অংশ।

আরও কয়েকটা পাতা উল্টাল ও।

এপ্রিল, ১৯২৬

আজ সকালে হাঁটতে বের হয়েছিলাম। ফিরে এসে টের পেলাম, উৎকট এক দুর্গন্ধ বের হচ্ছে আমার গবেষণাগার থেকে। অনুমানে বুঝে নিলাম কী হয়েছে। প্রাণপণে ছুট লাগালাম। সিঁড়ি বেয়ে নেমে হাজির হলাম সেলারে। গবেষণাগারের দরজা খুলতেই দেখি, ধোঁয়ার একটা মেঘের

আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আমার নতুন শিক্ষানবিশ লুকাস আনসেল, বোকার মতো কোনও একটা পরীক্ষা চালাতে গিয়ে ভজকট পাকিয়ে ফেলেছে।

আগুন নেভালাম। ধোঁয়ার কারণে ততক্ষণে কাশি শুরু হয়ে গেছে আমার। কাশতে কাশতেই আনসেলকে বললাম, 'পাগলের মতো পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে বারণ করেছিলাম তোমাকে।'

সে বলল, 'দুঃখিত। কিন্তু, স্যর, আরেকটু হলেই সফল হয়ে গিয়েছিলাম আমি।'

'যে-কোনও গবেষণায় সফল হওয়াটা কিন্তু বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, গবেষণার শেষে তুমি নিরাপদে থাকতে পারলে কি না। কারণ তুমিই যদি মারা যাও, তোমার গবেষণার কথা পৃথিবীকে জানাবে কে? মনে রেখো, কোন্ জিনিস কোন্‌টার সঙ্গে কী পরিমাণে মেশাতে হবে, তার নির্দিষ্ট একটা মাত্রা আছে। একটু এদিকওদিক হলেই...'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আমার হাত পেকে গেছে।'

'তা হয়তো পেকেছে, কিন্তু যৌবনের স্বভাবসুলভ কৌতূহল এখনও দমন করতে পারোনি তুমি।'

'সবকিছু শিখতে এত সময় লাগে যে... আমার আসলে অত ধৈর্য নেই। আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে চাই। আমি সবকিছু শিখতে চাই।'

আনসেলের বয়স বিশ। বেশিরভাগ সময়ই গোঁয়ারের মতো আচরণ করে, ঔদ্ধত্য দেখায়। ওকে হয়তো অনেক আগেই তাড়িয়ে দিতাম আমি। কিন্তু এখনও সঙ্গে রাখার একমাত্র কারণ, প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রতিভা আছে ওর মধ্যে। এবং সেটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া নতুন যে-কোনওকিছু শেখার ব্যাপারে ওর আগ্রহ অপরিসীম...অত আগ্রহ আর কারও মধ্যে দেখিনি আগে।

বললাম, 'সারা দুনিয়ার অ্যালকেমিস্টরা প্রায় তিন হাজার

বছর ধরে যা নিয়ে গবেষণা করছেন, যে-জিনিসের পেছনে আমি ব্যয় করে ফেললাম আমার প্রায় সারাটা জীবন, নিশ্চয়ই আশা করতে পারো না সেটা মাত্র কয়েকদিনেই বড়ির-মতো গিলিয়ে দিতে পারবো তোমাকে? শিকার যদি বড় হয়, সেটা গিলতে অজগরের সময় লাগে বেশি। ঠিক তেমনি কোনও গুপ্তবিদ্যা যদি মহৎ ও ব্যাপক হয়, তা আয়ত্ত করতে সময় লেগে যায় অনেক। ধাপে ধাপে করতে হয় কাজটা। অ্যালকেমির নিয়মই তা-ই।'

'কিন্তু, স্যর, আমার মাথায় প্রায় সারাক্ষণই নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। এবং সেসবের জবাব জানতে চাই আমি। আপনি অনেককিছু জানেন। যখন তুলনা করি আপনার সঙ্গে, নিজেকে তখন একটা গণ্ডমূর্খ বলে মনে হয়।'

'শিখতে পারবে তুমি। কিন্তু এই গুপ্তবিদ্যা শেখার আগে তোমাকে যা শিখতে হবে তা হলো, কীভাবে নিজের অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কোনও বাচ্চা যদি হাঁটতে শেখার আগেই দৌড়াতে চায়, নিশ্চয়ই সেটার ফল ভালো হয় না।'

জবাব দিল না আনসেল। অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর চেহারায়।

'আপাতত তাত্ত্বিক পড়ালেখায় মন দিতে হবে তোমাকে,' বললাম আমি।

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল আনসেল, বিরক্ত হয়েছে। 'বই পড়তে পড়তে লেখাপড়ার ওপর বিরক্তি চলে এসেছে আমার। তাত্ত্বিক পড়ালেখার গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু আমি হাতেকলমে কিছু করতে চাই। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যা করছি আমরা তা কেন করছি, সে-প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব আছে।'

তাকিয়ে আছি আনসেলের দিকে। তাত্ত্বিক পড়ালেখা কখনও কখনও কতখানি ক্লান্তিকর আর নিষ্ফল হতে পারে,

বুঝতে পারছি।

সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে যে-পুরস্কার পেয়েছি আমি, মনে পড়ে গেল সেটার কথা। ভাবলাম, সে-জ্ঞানের খানিকটা জানাবো নাকি আনসেলকে? তার ফলে কি ওর জ্ঞানক্ষুধা নিবৃত্ত হবে?

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম হঠাৎ। বললাম, 'ঠিক আছে, তোমার পাঠ্যবইয়ে নেই, এ-রকম কিছু একটা দেখাই তোমাকে।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আনসেল, উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ। 'কবে, স্যর, এখন?'

'না, এখন না। এত অধৈর্য হয়ো না।'

'তা হলে কবে দেখাবেন আপনি?'

'শীঘ্রই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। তোমার সম-বয়সী কোনও ছাত্র অ্যালকেমির কোনও গুপ্তবিদ্যা এত জলদি প্রত্যক্ষ করেনি আজপর্যন্ত। মনে রেখো, ওই বিদ্যা শুধু প্রত্যক্ষ করলেই হবে না, পাশাপাশি একটা গুরুদায়িত্বও পালন করতে হবে তোমাকে।'

'কী দায়িত্ব?'

'আমি যা বলবো অথবা যা দেখাবো তোমাকে, সে-ব্যাপারে কখনও মুখ খুলতে পারবে না কারও কাছে। কারও কাছে না...বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল আনসেল।

'উঁহুঁ, শুধু মাথা ঝাঁকালে হবে না, প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমাকে।'

'এখনই প্রতিজ্ঞা করতে রাজি আছি আমি।'

'ভেবে বলো, আনসেল। এমন এক দরজা পেরোতে যাচ্ছ, যেটা একবার খোলা হলে আর বন্ধ করা যায় না।'

এমন সময় গবেষণাগারে ঢুকল সাশা। বিস্ফোরণের ফলে যেসব জিনিস ভেঙে গেছে সেগুলো সাবধানে পরিষ্কার করতে

লাগল। ওকে দেখে হোক অথবা অন্য যে-কোনও কারণে হোক, বাইরে চলে গেল আনসেল।

আমার দিকে এগিয়ে এল সাশা। 'ক্ষমা করবেন, স্যর, আমি কখনোই আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি, কিন্তু আজ জিজ্ঞেস না-করে পারছি না...'

'কী?'

'আমি জানি আনসেলকে পছন্দ করেন আপনি। ছেলেটা নিঃসন্দেহে মেধাবী, শেখার আগ্রহও আছে। জ্ঞানের জন্য লালায়িত সে, যেভাবে একজন লোভী মানুষ ধনসম্পদের প্রতি লালায়িত। তারপরও...ওর বয়স মাত্র বিশ। যা শেখাতে চাইছেন ওকে, তা ওর জন্য অনেক জলদি হয়ে যাচ্ছে।'

'কী বলতে চাইছ আসলে?'

কিছুক্ষণ দ্বিধা করল সাশা। তারপর বলল, 'স্যর, আপনি কি নিশ্চিত, যা শেখাতে চাইছেন আনসেলকে, সে-জ্ঞানের দায়িত্ব নিতে পারবে সে?

'পারবে। ওকে বিশ্বাস করি আমি।'

ডায়েরি বন্ধ করল রানা। বন্ধ করল নিজের দুই চোখও। হেলান দিল চেয়ারে। ভাবছে।

নিজের ডায়েরিতে যদি অতিরঞ্জিত কোনও বর্ণনা না-দিয়ে থাকেন প্যানাসেলসাস, তা হলে সন্দেহ নেই, দুর্গ থেকে উদ্ধার-করা ক্যাথারদের সেই তথ্য ও অর্থ কাজে লাগিয়ে যুগান্তকারী কিছু-একটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন তিনি। যা, বর্তমানে, হেলমুটের হাতে আছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

তারমানে, কাজ এগোনোর মতো অন্তত একটা সূত্র পাওয়া গেছে।

চোখ খুলল রানা। ওর পাশে, টেবিলের ওপর ল্যাপটপ চলছে। ওটা নিজের দিকে টেনে নিল ও, গুগল সার্চ ইঞ্জিনে

লিখল: হেলমুট ওয়ার্নার।

'কী খুঁজছ?' দীর্ঘ বিরতির পর কথা বলল সেলেনা, নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসেছে রানার পাশে।

জবাব না-দিয়ে ল্যাপটপটা একপাশে একটুখানি সরিয়ে দিল রানা, যাতে স্ক্রিনের লেখা দেখতে পায় সেলেনা।

হেলমুট ওয়ার্নার সার্চের বিপরীতে দু' শ' একাত্তরটা রেযাল্ট দেখাচ্ছে গুগল।

একটুখানি থমকে গেল রানা, তারপর ধীরেসুস্থে স্ক্রলিং করতে শুরু করল দীর্ঘ ওই লিস্টে। শুরুর দিকে আছে হলিউডি এক সিনেমা-পরিচালকের নাম, আদি নিবাস জার্মানি। সম্প্রতি মুক্তি-পাওয়া মারদাঙ্গা একটা সিনেমা পরিচালনা করেছেন তিনি, প্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে তাঁর নামের বিপরীতে। প্রথমদিকের বেশ কয়েকটা রেযাল্ট ওই পরিচালককে নিয়েই। তারপর পাওয়া গেল হেলমুট ওয়ার্নার এক্সপোর্টস নামের প্রতিষ্ঠানের খোঁজ, মদের ব্যবসা করে তারা। পাওয়া গেল আরেক হেলমুটকে, ঘোড়া নিয়ে কারবার তার।

আরও কিছু আজেবাজে রেযাল্ট ঘাঁটার পর স্থানীয় এক ফরাসি নিউযপোর্টালে নজর আটকে গেল রানার।

হেডলাইনটা এ-রকম:

সেইন্ট বারনাবাসের পাগল

তারিখটা খেয়াল করল রানা—বছর চারেক আগের। মনে মনে পড়তে আরম্ভ করল খবরটা:

দক্ষিণ ফ্রান্সের ল্যাঙ্গুডক প্রদেশের সেইন্ট বারনাবাস গ্রাম-সংলগ্ন জঙ্গলে দেখা গেছে এক লোককে। সেখানে অর্ধ নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। তাকে দেখতে পান লুকাস ম্যাকগিল নামের স্থানীয় এক ফাদার। আজব এক ভাষায় কথা বলছিল লোকটা। ভাবভঙ্গি দেখে আর কথাবার্তা শুনে

বোঝা যাচ্ছিল, মাথার ঠিক ছিল না তার। সঙ্গে-থাকা কাগজপত্র ঘেঁটে ওই লোকের পরিচয় উদ্ধার করেন ফাদার ম্যাকগিল: হেলমুট ওয়ার্নার। পরে জানা যায়, হেলমুট এককালে প্যারিসের বাসিন্দা ছিল, কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যায়। সেইন্ট বারনাবাসের জঙ্গলে যখন পাওয়া যায় তাকে, তখন তার সারা গায়ে ছুরির ক্ষত—নিজের কাছে-থাকা একটা ছুরি দিয়ে ওসব তৈরি করেছে সে নিজেই।

সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে দ্বিধা করেননি ফাদার ম্যাকগিল, কালবিলম্ব না করে খবর দিয়েছিলেন অ্যাম্বুলেন্সে। পরে একজন মেডিকেলকর্মী আমাদের রিপোর্টারকে জানিয়েছেন, তিনি নাকি জীবনেও ও-রকম অদ্ভুত ঘটনা দেখেননি। ছুরি দিয়ে আজব কিছু নকশা কেটেছে হেলমুট নিজের শরীরে—কোনওটা ত্রিভুজ, কোনওটা ক্রস, কোনওটা আবার দুর্বোধ্য সংকেত।

'লোকটার মাথায় আসলেই সমস্যা আছে,' মন্তব্য করেছেন ওই মেডিকেলকর্মী, 'তা না হলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করে ওসব নকশা কাটার কাজ কেউ করে নিজের গায়ে?'

গুজব ছড়িয়ে পড়েছে পুরো সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে: রহস্যময় ওই নকশা আর সংকেতগুলো নাকি প্রাচীন কোনও শয়তানি-রীতির পরিচয় বহন করে। তবে স্থানীয় প্রশাসন ওই গুজব অস্বীকার করে বলেছে, মধ্যযুগীয় ওসব রীতির কোনও অস্তিত্ব নেই এখন আর—অন্তত ফ্রান্সের কোথাও চর্চা করা হয় না ওসব বর্বরতার।

যা-হোক, হেলমুটকে পরে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় এক মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে...

ঘাড় ঘুরিয়ে সেলেনার দিকে তাকাল রানা।

খবরটা পড়েছে মেয়েটা, তাকিয়ে আছে রানার দিকেই। বলল, 'শেষপর্যন্ত কী হয়েছে ওই লোকের, তা আর বলা

হয়নি খবরে। এতদিনে হয়তো হাসপাতাল থেকে ছাড়াও পেয়ে গেছে সে, চলে গেছে অন্য কোথাও। সবচেয়ে বড় কথা, বেঁচে আছে।'

'বছর চারেক আগেও ছিল,' বলল রানা, 'যদি সে-ই আসল হেলমুট হয়ে থাকে।

'বাজি ধরে বলতে পারি, ওই লোকই আসল হেলমুট। আরেকটা কথা। নিউজপোর্টালের রিপোর্টার অথবা ফাদার ম্যাকগিল ভুল করেছেন।'

'কী ভুল?'

'হেলমুটের গায়ের ওসব চিহ্ন কোনও শয়তানি রীতির না।'

'তা হলে কীসের?'

'অ্যালকেমিকাল মার্কিং।'

'বর্ণনা পড়ামাত্র বুঝে গেলে?'

'বুঝতে না পারলে আমার এতদিনের অ্যালকেমি চর্চা বৃথা হয়ে যেত।'

'কিন্তু...লোকটা নিজের শরীরে ওসব দাগ...কী বলবো...কাটতে গেল কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সেলেনা। 'বলতে পারবো না...হয়তো আসলেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, কী যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। ঘাঁটাঘাঁটি করে কী জানতে পারলাম আমরা, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। হেলমুট ওয়ার্নার নামের জনৈক জার্মানের খোঁজ পাওয়া গেছে, যার শরীরে ছুরির অনেকগুলো ক্ষতচিহ্ন ছিল, এবং যার কাছে প্যানাসেলসাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ ছিল সম্ভবত। ওই লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যিনি, সেই ফাদার ম্যাকগিল থাকেন দক্ষিণ ফ্রান্সের ল্যাঙ্গুডক প্রদেশের সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে।'

'আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের কথা বলছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। যে-ইমেইল সার্ভারে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলেছিল জে ফক্স, সেটাতে লগইন করল, তারপর টাইপ করল ফক্সের ই-মেইল অ্যাড্রেস। তাকাল সেলেনার দিকে। 'ফক্সের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানো?'

'যেমন?'

'ওর গার্লফ্রেণ্ড বা ওই জাতীয় কিছু?'

'না...ওর কোনও বান্ধবী ছিল বলে মনে হয় না। ওসব ব্যাপারে ওর কোনও মাথাব্যথাও ছিল না।'

'ওর মা'র নাম জানো?'

'উঁ...খুব সম্ভব ক্লারা।'

পাসওয়ার্ডের ঘরে নামটা টাইপ করল রানা।

মেইলসার্ভার বলছে: পাসওয়ার্ড ভুল।

'বিশেষ কোনও খেলার প্রতি আসক্তি ছিল ফক্সের? যেমন ফুটবল?'

'জানি না। খেলাধুলার প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায়নি সে কখনও...অন্তত আমার সামনে না।'

'তা হলে গাড়ি বা মোটরবাইকের প্রতি আসক্তি?'

'না, তা-ও না। খুব সাধারণ আর কম দামের একটা গাড়ি ব্যবহার করত সে। কখনও বলেনি, ওটা বদল করে ভালো কোনওকিছু কিনতে চায়।'

'পোষা প্রাণী...একটা বিড়াল ছিল না ওর?'

'হুঁ,' পিঠ খাড়া হয়ে গেল সেলেনার। 'বিড়ালটার নাম নুটিল। এন...ইউ...টি,..আই...এল।'

শব্দটা টাইপ করল রানা পাসওয়ার্ড বক্সে।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল জে ফক্সের মেইলবক্স।

বেশিরভাগ মেইলই স্প্যাম—কেউ বেচতে চায় ভায়াগ্রা, কেউ আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে পুরুষাঙ্গ মোটা ও লম্বা করার ওষুধের। ফক্সের সেই রহস্যময় কন্ট্যাক্টের পক্ষ থেকে কোনও

মেইল নেই।

সামনে ঝুঁকল সেলেনা, ফক্সের *সেন্ট-আইটেমে* ক্লিক করল।

এনযোকে যেসব মেইল পাঠিয়েছে ফক্স, কলাম আকারে দেখা যাচ্ছে সেগুলো। কোন্ মেইল কোন্ তারিখে পাঠিয়েছে ফক্স, সে-তালিকাও আছে।

কলামের প্রথম মেইলের দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেলেনা। 'ওটার কথা বলেছি তোমাকে। খেয়াল করো, অ্যাটাচমেন্টও আছে।' পেপারক্লিপের লোগোতে ক্লিক করল, চালু হয়ে গেল কয়েকটা জেপিইজি ফটো ফাইল।

ছবিগুলো দেখল রানা। তারপর ক্লিক করল *কমপোয নিউ মেসেজ* লোগোতে। *রিসিভার* বক্সে টাইপ করল এনযো'র ইমেইল অ্যাড্রেস।

'কী করছ?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে সেলেনার।

'একটু খোঁচা মারছি শত্রুপক্ষকে,' রানার ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি।

রানা টাইপ করছে:

বুঝতেই পারছ আমি কে? আমি সেই ভুল ব্যক্তি যার পেছনে খামোকা লেগেছ তোমরা। ফক্সকে খুন করেছ তোমরাই। পরপারে পাঠাতে চাইছ ডক্টর সেলেনাকেও। কিন্তু পৃথিবী স্বর্গ না যে, চাইলেই সব পাওয়া যায়। সেলেনা আমার হাতে। যদি তাকে চাও, যেভাবে বলছি সেভাবে কাজ করতে হবে।

'কেন খামোকা মৌচাকে ঢিল মারছ, রানা?' আর্তনাদের মতো শোনাল সেলেনার কণ্ঠ।

'খামোকা না। শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে, চাইলেই পিষে মারতে পারবে তোমাকে-আমাকে। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিতে

চাই, কাজটা অত সহজ নয়।'

সেলেনা কিছু বলল না...ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না সম্ভবত।

'তা ছাড়া তুমি ওই লোকগুলোর পরিচয় জানতে চাইছিলে,' বলে চলল রানা।

তবুও কিছু বলল না মেয়েটা।

'এখনও সময় আছে, সেলেনা। যদি বলো, তোমার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। চলে যাও কানাডায়, নিরাপদে থাকতে পারবে—ওই লোকগুলো অতদূর পর্যন্ত হাত বাড়ানোর উৎসাহ পাবে না।'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু না। এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছ তুমি, যেখানে "কিন্তু" বলে কোনও শব্দের স্থান নেই।'

চুপ করে আছে সেলেনা।

'তোমাকে প্রাণে বাঁচানোর গ্যারান্টি দিতে পারবো না, তবে তোমার জন্য শেষপর্যন্ত চেষ্টা করার নিশ্চয়তা দিতে পারবো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা, আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'বিশ্বাস করলাম।'

ল্যাপটপের দিকে ঘাড় ঘুরাল রানা, ক্লিক করল সেণ্ড আইকনে।

'দিলাম বোমা ফাটিয়ে,' বলল ও। 'দেখি এবার কী হয়।'

দশ

একজন মানুষ যত সাধারণ জীবনই যাপন করুক না কেন,

বিলাসিতা তার ভেতর থেকে বিদায় নেয় না সম্ভবত। সুযোগ পেলেই বিলাসী হয়ে ওঠে সে। যেমন লোরঁন। রানার উপদেশের ধার দিয়েও যাননি তিনি—যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি আসলে। একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা হাতে পেয়ে খায়েশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাঁর ভেতরে, দামি আর কড়া এক বোতল মদ কিনে এনেছেন নিজের জন্যে। অনেকদিন অভ্যাস নেই, তাই ওই বোতলের অর্ধেক খালি করার আগেই ঘরটা দুলতে আরম্ভ করল তাঁর চোখের সামনে। তারপরও জোর করে কয়েক ঢোক গিললেন তিনি। শেষে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন আর্মচেয়ারে।

তাই, যে-তিনজন লোক শেষ করে দিতে চেয়েছিল রানাকে, তারা যখন চুপিসারে ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর, কিছুই টের পেলেন না। ওদের দু'জন মিলে চ্যাংদোলা করল তাঁকে, দোল দিল কয়েকবার, তারপর প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে আছড়ে ফেলল মেঝেতে।

কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন লোরঁন, দম আটকে এল তাঁর, নেশার ঘোর হালকা হয়ে গেল অনেকখানি। কী ঘটছে বুঝবার জন্য উঠে বসতে চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় লোকটা প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকাল তাঁর নাকেমুখে। নাকের বাঁশি ভেঙে গেল লোরঁনের, ঠোঁট কেটে গেল; রক্ত বেরিয়ে এল দু'জায়গা থেকেই। চোখ ভরে গেল পানিতে। সে-পানি মুছবার সময় তিনি টের পেলেন, তাঁর থুতনির-কাছে পাকা দাড়ি ভিজে গেছে রক্তে।

যে-লোক লাথি মেরেছে লোরঁনকে, সে পকেট হাতড়াতে শুরু করল তাঁর। রানার-দেয়া টাকাগুলো খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগল না। বিস্ময়মিশ্রিত একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিল ওই লোকের চোখে। জিজ্ঞেস করল, 'ঘাটের মড়া, এত টাকা কে দিল তোমাকে?'

জবাব দিতে পারলেন না লোরঁন—শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাঁর,

কাশি চেপে রাখতে পারছেন না চেষ্টা করেও।

'কথা বল্!' হুমকি দিল লোকটা, পকেট থেকে পিস্তল বের করে সেটার নল চেপে ধরল লোরঁনের চাঁদিতে। 'কে এসেছিল? তার নাম কী?'

কথা বলতে চাইলেন লোরঁন, কিন্তু পারলেন না। একে তো প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তার ওপর কিছুতেই মনে করতে পারছেন না, বিদেশি যে-লোকটার কাছে বিক্রি করেছেন প্যানাসেলসাসের ডায়েরি তার নাম কী।

ওরা তিনজনে মিলে মারতে শুরু করল লোরঁনকে। তাঁর রক্ত আর বমি দিয়ে একসময় মাখামাখি হয়ে গেল মেঝে। ওসব মেখে নোংরা হয়ে গেল তাঁর জামা-কাপড়, চুল ও দাড়ি।

'লোকটা ছিল বাদামি চামড়ার,' শেষপর্যন্ত কোনওরকমে বললেন তিনি।

আবারও একটা লাথি আছড়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি মেঝেতে, নিস্তেজ হয়ে গেছেন।

'হয়েছে,' বলল তিন দুর্বৃত্তের একজন, 'বুড়োকে জ্যান্ত হস্তান্তর করার কথা আছে।'

লোরঁনকে ধরাধরি করে তুলল ওরা নিজেদের পিকআপ ট্রাকে, তারপর রওয়ানা দিল।

তবে তার আগে লোরঁনের ঘরদোরে আগুন লাগাতে ভুলল না।

নিজের ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে পার্কে এসেছে লোকটা। পার্কটা ছোট কিন্তু সুন্দর। চারদিকে একটা শান্তি-শান্তি ভাব আছে। গাছে গাছে পাখি গান গাইছে। একধারে হালকা বাতাসে থির-থির করছে ছোট্ট একটা লেক, সেখানে সাঁতার কাটছে রাজহাঁসের দল।

মেয়েকে নিয়ে প্রায়ই এই পার্কে আসে লোকটা। তার

নিজের সময় যেমন ভালো কাটে, তেমন মজা পায় মেয়েটিও। এখানে-সেখানে ইচ্ছামতো ছোটাছুটি করে বেড়ায়। লোকটা তখন বসে থাকে কোনও একটা বেঞ্চে, অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার একমাত্র সন্তানের দিকে।

আজও দৌড়াদৌড়ি করছে মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর বাবার কাছে হাজির হয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'বাবা, বাবা, দেখো, একটা কুকুর খেলা করতে চাইছে আমার সঙ্গে।'

স্নেহের হাসি হাসল লোকটা, দেখতে পেয়েছে কুকুরটাকে। 'হ্যাঁ, ওটা সুন্দর না?'

কুকুরটা ছোট, স্প্যানিয়েল। সারা গায়ে বাদামি লোম। গলায় একটা লাল কলার দেখা যাচ্ছে। তার মানে পালিত।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে লোকটা। কুকুরের মালিককে খুঁজছে। কিন্তু সে-রকম কাউকে নজরে পড়ল না তার।

'আমি কি ওটার সঙ্গে খেলা করতে পারি, বাবা?'

অনুমতির জন্য অপেক্ষা করল না মেয়েটা, এগিয়ে গেল কুকুরটার দিকে। 'ডগি, কী নাম তোমার?' ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওর বাবার দিকে। 'বাবা, কুকুরটার মুখে এটা কী?'

এতক্ষণ খেয়াল করেনি লোকটা, মেয়ে বলায় এবার নজরে পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে যারপরনাই চমকে উঠল সে।

কোনও মানুষের একটা কাটা, অর্ধগলিত কব্জি কামড়ে ধরে আছে কুকুরটা।

ওই সেলারের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না যার্দি। ও-রকম অদ্ভুত কিছু কখনও দেখেনি সে আগে। ওর চাচা যতই বলুক, ওটা কোনও সাধারণ স্টোরেজ প্লেস হতে পারে না। ওই খাঁচাগুলোয় কুকুরও রাখা হয় না...যার্দি নিশ্চিত।

আরও ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে পড়া দুর্গ আর ডানজনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। যত ভাবছে ব্যাপারটা,

ততই রোমাঞ্চিত হচ্ছে সে। ওই সেলার যদি আসলেই কোনও ডানজন হয়ে থাকে?

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নিজের সব কাজ শেষ করে ফেলল সে। ব্যস, এবার আগামী সোমবার পর্যন্ত টানা ছুটি ওর।

শিক্ষানবিশ হিসেবে একজন ইলেকট্রিশিয়ানের সহকারীর কাজটা মোটেও পছন্দ না যার্দির। কাজটা খুবই একঘেয়ে...কোনও মজা নেই। যার্দি আরও উত্তেজনাকর কাজ চায়। লেখক হতে চায় সে। রূপকথার গল্পের মতো দারুণ সব গল্প-উপন্যাস লিখতে চায়। যদি কোনও কারণে লেখক হতে না পারে, ওর ইচ্ছা আছে গোয়েন্দা হওয়ার। রহস্য খুব পছন্দ ওর।

এবং যার্দির ধারণা, কোনও একটা রহস্যের সন্ধান পেয়েছে সে পুরনো ওই সেলারে।

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে, বেডসাইড টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলল। চাচার হুঙ্কার উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়েছিল চকচকে ওই জিনিসটা, পকেটে ভরে বাসায় নিয়ে এসেছিল। ওটার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেনি এখন পর্যন্ত।

আচ্ছা, কাজটা কি চুরি হয়ে গেল?

হলে হবে...সবসময় ন্যায়নীতির কথা মানতে হয় না।

ড্রয়ারের ভেতর থেকে জিনিসটা বের করল যার্দি। এটা এত চকচক করছে কেন? খাঁটি সোনা দিয়ে বানানো হয়েছে নাকি?

কে যেন আসছে যার্দির ঘরের দিকে...তাড়াহুড়ো করে জিনিসটা ঢুকিয়ে রাখল সে ড্রয়ারের ভেতরে।

সন্ধ্যার খাবারটা দ্রুত খেয়ে নিল সে আজ। সুবোধ বালকের মতো ডিশওয়াশারে ডুবাল প্লেট আর কাঁটাচামচ। ঘরে গিয়ে নিয়ে এল নিজের হেলমেট আর বাইকের চাবি।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলেন যার্দির মা।

'বাইরে।'

‘বাইরে কোথায়?’

‘এই তো...চলে আসবো যত জলদি সম্ভব।’

‘মনে থাকে যেন কথাটা।’

বাড়ির বাইরে এসে তড়িঘড়ি করে হেলমেট পরল যার্দি, তারপর চালু করল বাইক। বিশেষ ওই বাড়িটা পঞ্চাশ কি ষাট কিলোমিটার দূরে এখান থেকে।

জায়গামতো পৌঁছে একজায়গায় লুকাল যার্দি ওর বাইক। কালো রঙ করা লোহার সদর-দরজা এখন বন্ধ। রাত নামছে। কতগুলো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ছেলেটা। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, অদ্ভুত ফিসফিসানি জেগেছে ওর আশপাশে। বুকের ভেতরে কেমন শিরশির করে উঠল ওর।

বাড়ির সীমানাপ্রাচীরের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে বড়সড় একটা গাছ। ওটার একটা ডাল চলে গেছে সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে। গাছটাতে চড়ল যার্দি, ডাল বেয়ে অতিক্রম করল সীমানাপ্রাচীর, তারপর এদিকওদিক তাকিয়ে লাফিয়ে নামল ঘেসো জমিতে।

বাড়ির একতলার কয়েকটা জানালা আলোকিত হয়ে আছে ভেতরের আলোতে। সেদিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল যার্দি, কিন্তু বরফের মতো জমে গেল হঠাৎ। উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে অনতিদূরে, খুলে যাচ্ছে সদর-দরজাটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল দুটো কালো গাড়ি ঢুকে পড়ল ড্রাইভওয়েতে। একজায়গায় গিয়ে থামল ও-দুটো, নামল কয়েকজন লোক। তারা কয়েকজন মিলে টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে নেয়ার চেষ্টা করছে উস্কখুস্ক এক বুড়ো লোককে।

শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে যার্দির। কল্পনাও করেনি, এ-রকম কিছু দেখতে হবে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

যে-লোককে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা

হচ্ছে, চিৎকার করতে শুরু করল সে হঠাৎ করে। যারা টানাহেঁচড়া করছিল, তাদের একজন পিস্তল বের করল শোল্ডার হোলস্টার থেকে। যার্দি ভাবল, গুলি করা হবে এখনই। কিন্তু ভুল প্রমাণিত হলো ওর অনুমান। যাকে জোর করে বাড়ির ভেতরে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার চাঁদিতে বাড়ি মারা হলো পিস্তলের বাঁট দিয়ে। ফেটে গেল লোকটার মাথা, রক্ত গড়িয়ে নামছে তার গাল বেয়ে।

পাগলের মতো লাফাতে শুরু করেছে যার্দির হৃৎপিণ্ড। লেখক বা গোয়েন্দা হওয়ার আশা শেষ ওর। পাঁই করে ঘুরল সে—পালাবে।

কিন্তু জানে না, ওর পেছনে নিঃশব্দে এসে হাজির হয়েছে ইয়া লম্বাচওড়া এক লোক। লোকটা ওকে জাপ্টে ধরতেই বুঝতে পারল যার্দি, পালানোর কোনও উপায় নেই।

চিৎকার করে উঠতে চাইল সে, কিন্তু প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে জ্ঞান হারাল মুহূর্তে।

ল্যুভর মিউযিয়াম ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মধ্য প্যারিসের এই পাব। আইরিশ মিউযিকের স্বর্গ বলা হয় এটাকে। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ষণ্ডামার্কা চারজন লোক ঢুকল সেখানে। জে ফক্স...সারা পৃথিবীর কাছে যে-মানুষ মৃত...তার পক্ষ থেকে ই-মেইল পেয়েছে তারা। বিশেষ কিছু নির্দেশনা জারি করা হয়েছে সেই মেইলে।

এদিকওদিক তাকাল ওই চারজন, তারপর এগিয়ে গেল বারের দিকে।

প্যারিস-সহ ইউরোপের বেশিরভাগ বড় শহরের পান-শালাগুলো গমগম করতে থাকে রাতের বেলায়। রাত যত বাড়ে, খদ্দেরও তত বাড়ে। এই পাবের বারেও লোকজনের কমতি নেই। শোনা যাচ্ছে হাসিঠাট্টার আওয়াজ, গ্লাসের টুংটাং শব্দ। ধীর লয়ে বাজছে বেহালা আর ব্যাঞ্জো।

ওই চারজনের মধ্যে যাকে দেখে দলটার নেতা বলে মনে হয়, তার সারা শরীরে পেশির সমাহার। চাঁদিটা নিখুঁতভাবে কামিয়ে রেখেছে সে, পাবের অনুজ্জ্বল আলোতেও চকচক করছে ওটা। পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, শার্ট, আর জিন্স। বারে হেলান দিল সে, আরেকবার এদিকওদিক দেখে নিয়ে মনোযোগ দিল দাড়িওয়ালা বারম্যানের ওপর।

মাথা ঝাঁকাল বারম্যান—কী করতে হবে তা আগে থেকেই জানে। ঝুঁকল, বারের নিচ থেকে বের করে আনল একটা মোবাইল ফোন। চাঁদিকামানো লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরল ওটা।

জিনিসটা নিল পেশিমানব। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। রাস্তায় বেরিয়ে গেল ওরা।

ঘড়িতে যখন রাত ঠিক সাড়ে এগারোটা, বেজে উঠল মোবাইল ফোন। কল রিসিভ করল পেশিমানব।

'একটা কথাও বলবে না,' ওপ্রান্ত থেকে হুকুম দেয়া হলো। 'যা বলছি, চুপচাপ শুধু শোনো। যা করতে বলবো, ঠিক তা-ই করবে। একচুল এদিকওদিক করা যাবে না। তোমাদের ওপর নজর রেখেছি আমি।'

কিছু বলল না পেশিমানব, এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

'আমাকে খুঁজে লাভ নেই,' আবারও বলা হলো মোবাইলের ওপ্রান্ত থেকে। 'যদি দেখি তেড়িবেড়ি করেছ, সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি বাতিল। কানাডিয়ান মেয়েটাকে হারাবে, ফলে যার পা চাটো তার তরফ থেকে নির্মম শাস্তি পেতে হবে।'

'শুনছি,' বলল কামানো-চাঁদির লোকটা।

'একটা ক্যাব ডাকো,' বলল রানা। 'তোমার সঙ্গে যাতে কেউ না থাকে। আবারও বলছি, কাউকে রাখা যাবে না তোমার সঙ্গে। যদি দেখি কথার নড়চড় হয়েছে, চিড়িয়া যাতে উড়াল দেয় সে-ব্যবস্থা করবো। বোঝা গেছে?'

‘হুঁ।’

‘ট্যাক্সিক্যাবে ওঠার পর ফোন করবে এই নম্বরে। তখন বলে দেবো কী করতে হবে।’

একটা ট্যাক্সিক্যাবে সওয়ার হয়েছে চাঁদিকামানো লোকটা। প্যারিসের কোল ঘেঁষে বয়ে-চলা নদীর ঘাটসংলগ্ন রাস্তা ধরে ছুটছে গাড়ি। দূরে নদীতে ভাসছে কিছু প্রমোদতরী, আলোকিত হয়ে আছে নিজেদের কৃত্রিম আলোকব্যবস্থায়। মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার পর, নদীর টাটকা বাতাসে হুঁশ ফেরানোর আশায় কিছু লোক প্রতি রাতেই সওয়ার হয় ওসব নৌকায়। ট্যুরিস্টরাও চড়ে, নদীতে ভাসতে ভাসতে উপভোগ করে রাতের প্যারিসের সৌন্দর্য।

পেশিমানবের কথামতো একদিকে মোড় নিল ড্রাইভার, এগোচ্ছে নদীতীরের অন্ধকার একটা রাস্তার দিকে। একজায়গায় ট্যাক্সি থামাল সে। ভাড়া চুকিয়ে নামল, মোবাইল ফোনটা হাতেই আছে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল লোকটা।

চারদিক চুপচাপ। হাঁটছে পেশিমানব। তার জুতোর খটাখট আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নদীতীরের গুটিকয়েক বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে। কাছিয়ে আসছে একটা ব্রিজ। ওটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছে ওকে।

জায়গামতো পৌঁছে এদিকওদিক তাকাল লোকটা।

‘রানা,’ ফিসফিস করে বলল সেলেনা, ‘আমার ভয় লাগছে। তোমার আইডিয়া আসলেই কাজে লাগবে কি না, বুঝতে পারছি না।’

চাঁদের আলোয় আলোকিত নদীর ঢেউয়ের আওয়াজ শোনা গেল মেয়েটার পেছনে। দূরের নটরডেম ক্যাথেড্রালের সোনালি গম্বুজ চকচক করছে চন্দ্রালোকে। হাতঘড়ি দেখল

রানা। কিছু বলল না।

অনতিদূরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, থামল ওটা। দরজা খুলে নামল কেউ। তারপর চলে গেল গাড়িটা। জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে লোকটা।

অস্থির ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল সেলেনা। 'রানা...'

'ভরসা রাখো আমার ওপর,' মেয়েটার কানে কানে বলল রানা। 'ওই লোক আমাদের কোনও ক্ষতিই করতে পারবে না।'

ব্রিজের এককোনায় গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ও সেলেনাকে নিয়ে, একহাতে মেয়েটার হাত ধরে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। পেশিমানব ততক্ষণে ব্রিজের গোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল রানা।

ওকে দেখে বাঁকা হাসি হাসল পেশিমানব। 'জে ফক্স?'

ব্রিজের পাথুরে খিলানে প্রতিধ্বনিত হলো কণ্ঠটা।

'টাকা এনেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

হাতেধরা ব্রিফকেসটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরল মাথা কামানো লোকটা। 'এই যে।'

'রাস্তার ওপর নামিয়ে রাখো ওটা,' বলল রানা।

ব্রিফকেসটা সাবধানে নামিয়ে রাখল লোকটা। রানার ওপর থেকে নজর সরে গেছে তার।

চট করে সেলেনার হাত ছেড়ে দিল রানা, শোল্ডার হোলস্টার থেকে একথাবায় বের করল ওয়ালথার। দুই লাফে পৌঁছে গেল পেশিমানবের কাছে। বাঁ হাতে মুচড়ে ধরল লোকটার এক হাত, ওটা বিশেষ কায়দায় মোচড় দিয়ে নিজের দিকে উল্টো ঘুরিয়ে ফেলল লোকটাকে। ওয়ালথারের নল ঠেসে ধরেছে লোকটার ঘাড়ে। চাপা গলায় বলল, 'হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো। হঠাৎ করে নড়ে উঠবে না...যদি চাও তোমার খুলি উড়ে না যাক।'

রানার হাতে পিস্তল দেখামাত্র হার্টবিট বেড়ে গেছে সেলেনার। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে সে। ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু পারছে না। কেউ যেন ওর পা দুটো পেরেক ঠুকে আটকে দিয়েছে রাস্তার সঙ্গে। জমাট বরফের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে, চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না রানার ওপর থেকে।

প্রস্তুত হয়েই এসেছিল পেশিমানব, কিন্তু কোনও কাজে লাগল না তার সে প্রস্তুতি। লোকটার জ্যাকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, বের করে নিয়ে এল একটা গ্লক নাইন এম.এম। ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিল অস্ত্রটা। মৃদু ছপাৎ আওয়াজ শোনা গেল।

'জে ফক্স,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল লোকটা, 'এজন্যে তুমি মরবে।'

'পৃথিবীর সব মানুষই কোনও-না-কোনওদিন মরবে। কাজেই মৃত্যু নিয়ে একটুও দুশ্চিন্তা নেই আমার। তুমি বরং তোমার নিজের কথা ভাবো। যা-যা জিজ্ঞেস করবো, ঠিকমতো জবাব দিয়ো। তা হলে জানে মারবো না। বোঝা গেছে?'

কিছু বলল না পেশিমানব।

'তুমি এনযো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব নেই।

পেশিমানবকে দেখামাত্র রানা বুঝে গিয়েছে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ওয়ালথারের বাঁট দিয়ে জোরে একটা বাড়ি মারল ও লোকটার ফরসা চাঁদিতে। 'তুমি এনযো?'

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল পেশিমানব, জবাব দিল না। তার চাঁদির যেখানে বাড়ি মেরেছে রানা, ফেটে গেছে সে-জায়গা, রক্ত গড়িয়ে নামছে।

দৃশ্যটা সহ্য করতে পারল না সেলেনা। আরেকদিকে তাকাল।

‘জবাব দেবে?’ বলল রানা। ‘তোমার চাঁদি ফাটাতে ইচ্ছে করছে না আসলে। আমার পিস্তলটা আবার ব্যবহার না করলে খুব মাইণ্ড করে।’

‘না,’ মুখ খুলল পেশিমানব, ‘আমি এনযো না।’

‘তা হলে এনযো কে? এবং কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?’

জবাব পাওয়া গেল না।

এবার পেশিমানবের চাঁদির ঠিক মাঝখানে বাড়ি মারল রানা।

রাস্তায় পড়ে গেল লোকটা, কিন্তু বেশিক্ষণ উপুড় হয়ে থাকল না, একবার গড়ান খেয়ে চিৎ হলো। তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ভয় দেখা দিয়েছে তার চোখে। কিন্তু সেটা মৃত্যুভয় না।

তারমানে, ভাবল রানা, মার খাওয়ার অভ্যাস আছে এই লোকের। ‘তুমি যদি আমার কোনও কাজেই না লাগো,’ ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অফ করল ও, নলটা তাক করল পেশিমানবের দুই চোখের মাঝখানে, ‘তা হলে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না।’

একটুও ভণিতা করেনি রানা, ওর হুমকিটা তাই সত্যি মনে হলো পেশিমানবের কাছে। এবার মৃত্যুভয় দেখা দিল তার চোখে। বাধা দেয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল সে। ‘আমি জানি না...সত্যি বলছি! আমি ওই লোকের হয়ে কাজ করি, কিন্তু তার সঙ্গে কখনও দেখা হয় না আমার। কোন্ কাজটা কখন কীভাবে করতে হবে তা ফোনে জানিয়ে দেয়া হয় আমাকে।’

‘যে-ফোন থেকে যোগাযোগ করা হয় তোমার সঙ্গে সেটার নম্বর বলো।’

নম্বরটা বলে দিল পেশিমানব।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। জ্যাকেটের চেইন

খোলা লোকটার। শার্টের ওপরের দিকের কয়েকটা বাতামও খোলা। ওই লোকের লোমশ বুকে সোনার একটা চেইন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আরও কিছু একটা।

হাঁটু গেড়ে বসল রানা, ওয়ালথারের নিশানা নড়েনি। খালি হাতের হ্যাঁচকা একটানে ছিঁড়ে ফেলল ও পেশিমানবের শার্টের বাকি বোতামগুলোও।

চাঁদের আলোয় একটা ট্যাটু দেখা যাচ্ছে লোকটার বুকের বাঁ দিকে।

মধ্যযুগীয় একটা তরবারি। ফলাটা একেবারে সোজা। হাতলে ক্রসগার্ড আছে, দেখতে অনেকটা ক্রুসিফিক্সের মতো। ফলার ওপরে ছোট ছোট অক্ষরে ল্যাটিনে লেখা আছে:

ঈশ্বরের তরবারি

'এটা কীসের ট্যাটু?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিছু না।'

ওয়ালথারের এবারের বাড়িটা পড়ল পেশিমানবের কপালের ঠিক মাঝখানে।

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে...' কথা শেষ করতে পারল না সেলেনা, গলা শুকিয়ে গেছে।

'অভিসারে আসিনি আমি,' পেশিমানবকে বলল রানা, ভুলেও তাকায়নি সেলেনার দিকে। 'তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে লম্বা সময় নেই আমার হাতে। জবাব দাও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেশিমানব। 'আমি ঈশ্বরের তরবারির একজন সৈনিক।'

'কীসের ঈশ্বরের তরবারি?'

'ওটা একটা প্রতিষ্ঠান। ওদের হয়ে কাজ করি আমি।'

রানা বুঝতে পারছে, মগজধোলাই করা হয়েছে

পেশিমানবের। বলল, 'মানে, তুমি বলতে চাইছ, তোমরা ঈশ্বরের সৈনিক? কেন যেচে পড়ে ঈশ্বরের সৈনিক সাজতে গেলে, বুঝলাম না। তোমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরীহ মানুষ খুন করা ছাড়া আর কিছু করো বলে তো মনে হয় না। যা-হোক, যাঁর সৈনিক সেজেছ, ইচ্ছা করলে এখনই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি তোমাকে। কিন্তু আপাতত করছি না কাজটা। যাও, পালাও। তোমার চেহারা যাতে আর কখনও না দেখি।'

এতক্ষণে ককাতে শুরু করল পেশিমানব, দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। রক্তে লাল হয়ে গেছে ওর শার্ট। ঘামে ভিজে গেছে চেহারা, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। টলমল পায়ে সিধে হলো সে।

ঠিক তখন, লাল একটা লেযাররশ্মি এসে পড়ল সেলেনার কপালে।

রশ্মিটা নজর এড়ায়নি রানার, একলাফে জায়গা বদল করল ও। বাঁ হাতে প্রচণ্ড এক থাবা চালাল সেলেনার শার্টের কলারে, হ্যাঁচকা এক টানে কয়েক ফুট সরিয়ে দিল মেয়েটাকে।

নদীর ও-পার থেকে শোনা গেল লেযার-সাইটেড একটা রাইফেলের গর্জন।

কিন্তু সেলেনাকে আগেই সরিয়ে নিয়েছে রানা, তাই পর পর তিনটে বুলেট গিয়ে বিঁধল অনতিদূরের একটা বাড়ির দেয়ালে, খসে পড়ল কিছু পলেস্তারা। অটোমেটিক রাইফেল ব্যবহার করছে স্নাইপার।

তাড়াহুড়ো করে আবারও গুলি করল লোকটা। তবে তার আগেই সেলেনার পিঠে জোরে ধাক্কা মেরেছে রানা। মেয়েটা বলতে গেলে উড়ে গিয়ে পড়েছে ব্রিজের গোড়ার অন্ধকার এক জায়গায়। দেরি করেনি রানা, ফুটবলের মতো ড্রপ খেয়ে নিজেও সরে এসেছে।

স্নাইপারের দ্বিতীয় দফার প্রথম বুলেট খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেল পেশিমানবের, তৎক্ষণাৎ মারা গেল সে। তাই দ্বিতীয় বুলেটটা যখন ঢুকল ওর বুকে, কোনও ব্যথাই টের পেল না।

লেযাররশ্মির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে রানা। আনুমানিক পঁচিশ মিটার দূরে, নদীতীরের এক বাড়ির ছাদে আছে স্নাইপার।

ব্রিজের গোড়া থেকে জবাব দিল রানা। চাপা একটা আর্তনাদ শোনা গেল—ঠিক জায়গায় গিয়ে ঢুকেছে রানার বুলেট। কয়েক মুহূর্ত পর শোনা গেল ঝপাস একটা শব্দ—বাড়ির ছাদ থেকে উল্টে গিয়ে নদীতে পড়েছে স্নাইপার। খটাস একটা আওয়াজও পাওয়া গেল—লোকটার রাইফেল আছড়ে পড়েছে রাস্তায়।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল, আরও দু'জন লোক ছুটে আসছে ব্রিজের দিকে, পিস্তলের বাগিয়ে ধরার কারণে লম্বা হয়ে আছে দু'জনেরই ডান হাত। তাদের একজন দৌড়াতে দৌড়াতেই গুলি করল রানাকে লক্ষ্য করে—ওয়ালথারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু ছুটন্ত পায়ের-আওয়াজ শোনামাত্র স্থান বদল করেছে রানা, তাই বেঁচে গেল। ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, পরেরটা ধাতব সংঘর্ষের আওয়াজ তুলল ব্রিজের স্প্যানের সঙ্গে।

ওয়ালথার তুলল রানা, একটু সময় নিয়ে নিশানা করল, তারপর চাপ দিল ট্রিগারে। পিস্তলওয়ালা যে-লোক গুলি করছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কোনও দয়া দেখাল না রানা, ওয়ালথারের নল একদিকে একটু সরিয়ে গুলি করল আবার। এবার লুটিয়ে পড়ল দ্বিতীয় পিস্তলধারীও।

আবারও দিক বদল করল রানা, সেলেনাকে নিয়ে সরে এল ঘুটঘুটে অন্ধকার এক জায়গায়। এদিকওদিক তাকাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করছে শত্রুপক্ষের আর কেউ আছে কি না ধারেকাছে।

আশপাশ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আবার। জোরে দম নিলে পোড়া বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়। নিথর পড়ে আছে দুই পিস্তলওয়ালা, চাঁদের আলোয় পা-ভাঙা মূর্তির মতো মনে হচ্ছে তাদেরকে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে পেশিমানব, একটা হাত বেঁকে আছে বিশ্রী ভঙ্গিতে। নদীর ও-পারে...যে-বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে গুলি করছিল স্নাইপার সেটার নিচের রাস্তায়...ভীরু পায়ে জড়ো হতে শুরু করেছে কৌতূহলী লোকজন। অতি উৎসাহী একজন নিচু হয়ে তুলে নিল কী যেন—খুব সম্ভব অটোমেটিক রাইফেলটা।

দূরে শোনা যাচ্ছে পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ।

সেলেনার দিকে তাকাল রানা। 'ব্যথা পেয়েছ?'

তেমন ঠাণ্ডা নেই, তারপরও দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে সেলেনার; ওই অবস্থাতেই বলল, 'তুমি যখন ধাক্কা মারলে, তখন মনে হয়েছিল কামানের গোলা লেগেছে আমার পিঠে। কেউ কাউকে এত জোরে ধাক্কা দেয়?'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'অত জোরে ধাক্কা মেরেছি বলেই কিন্তু বেঁচে গেছ তুমি।'

টলমল পায়ে উঠল সেলেনাও।

'একটুও দেরি করা চলবে না আমাদের,' জরুরি কণ্ঠে বলল রানা। 'পুলিশ আসছে। ওরা আমাদের দেখে ফেললে বিপদ হবে।'

কিছু বলল না সেলেনা। রানার কথা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এখনও টলছে।

ওকে বোঝানোর মতো সময় নেই রানার হাতে, তাই বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েটার কোমর, ওই অবস্থাতেই হাঁটছে যত দ্রুত সম্ভব। বলতে গেলে প্রায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটাকে। ব্রিজসংলগ্ন রাস্তা ধরে হাঁটছে, চেষ্টা করছে যতটা পারা যায় অন্ধকারে থাকতে।

কিছুদূর যাওয়ার পর হুঁশ যেন ফিরল সেলেনার। 'ছাড়ো

আমাকে!’ জোর খাটিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে রানার কবল থেকে, ছুট লাগাল উল্টোদিকে।

মেয়েটার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

‘খবরদার! ধরবে না আমাকে!’ উত্তর এল।

অনেক কাছে চলে এসেছে পুলিশের গাড়ি, এখন ডাকলে আওয়াজ কানে যেতে পারে ওদের। তা ছাড়া একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে—পুলিশের গাড়ির উদ্দেশেই ছুট লাগিয়েছে মেয়েটা, যেহেতু কোনও অপরাধ করেনি সে সেহেতু প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ হয়তো ছেড়ে দেবে ওকে। যতক্ষণ পুলিশ স্টেশনে থাকবে মেয়েটা, নিরাপদে থাকবে। ততক্ষণে প্যারিস ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে রানা।

দ্রুত পায়ে হাঁটছে ও, কাছিয়ে এসেছে অন্ধকার একটা গলি। ওখানেই রেখেছে ভাড়া-করা গাড়িটা। গলির মুখে থেমে দাঁড়াল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ছুটন্ত সেলেনার দিকে।

ওর কাছ থেকে পালাচ্ছে মেয়েটা। চাঁদের আলোয় আজব এক ছায়ামূর্তি বলে মনে হচ্ছে ওকে। দৌড়ানোর তালে তালে নাচছে ওর পনিটেইল করা লাল চুল। দুটো প্রাইভেট কার সাবধানে পাশ কাটিয়ে গেল পাগলিটাকে।

পুলিশের গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সেলেনার সামনে, ওর গতি রোধ করল আসলে। থামতে বাধ্য হলো মেয়েটা। পুলিশকার থেকে হুড়োহুড়ি করে নামছে অফিসাররা, প্রত্যেকের হাতে ফায়ারআর্ম। দূরে শোনা যাচ্ছে সাইরেনের নতুন আওয়াজ। আরও পুলিশকার আসছে। যদিও দূরে আছে এখনও।

বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রেপ্তার করা হলো সেলেনাকে, সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে ওর যোগসূত্র থাকতে পারে বলে সন্দেহ করেছে পুলিশ। পুলিশকারে তোলা হচ্ছে ওকে এখন।

গলিতে ঢুকে পড়ল রানা, হাঁটার গতি আরও বাড়িয়েছে। যত জলদি সম্ভব ফিরে গেল ভাড়া-করা গাড়ির কাছে। ওটা

চালিয়ে বেরিয়ে আসবে গলি থেকে, এমন সময় নতুন একটা দৃশ্য দেখতে পেল ও।

কালো একটা মিটসুবিশি পাজেরো ধেয়ে যাচ্ছে পুলিশকারের দিকে—যেটাতে তোলা হয়েছে সেলেনাকে। পাজেরোর দুই দিকের জানালা দিয়ে শরীরের অনেকখানি বের করে ফেলেছে দুই ছায়ামূর্তি, ফায়ারআর্ম দেখা যাচ্ছে তাদের হাতে। ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে পিস্তলসহ হাত বের করেছে আরেকজন।

নতুন এই লোকগুলো কারা এবং তাদের উদ্দেশ্য কী, বুঝতে একমুহূর্তও দেরি হলো না রানার।

শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে ফেলেছিল ওয়ালথারটা, বের করে হাতে নিল আবার। ওই অবস্থাতেই মোচড় দিল ইগনিশনে, পা দাবাল একসেলারেটরে। গলি থেকে বেরিয়ে পিছু নিল পাজেরোর।

কালো গাড়িটার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে পুলিশ অফিসাররাও, সেলেনার কথা ভুলে গেছে তারা সবাই, যে যার মতো দৌড়ে চলে যাচ্ছে পুলিশকারের আড়ালে। কিন্তু তার আগেই শোনা গেল শটগানের গর্জন—পাজেরোর জানালা থেকে ঝুলে-থাকা দুই দুর্বৃত্ত গুলি করছে। এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের প্রথম ধাক্কাতেই লুটিয়ে পড়ল দু'জন পুলিশ অফিসার, তাদের গাড়ির চলটা উঠে গেল জায়গায় জায়গায়।

প্রমাদ গুনল রানা। শটগানওয়ালা ওভাবে বেপরোয়া গুলি চালাতে থাকলে নির্ঘাত মারা পড়বে সেলেনা।

পা দিয়ে একসেলারেটরটা গাড়ির মেঝের সঙ্গে দাবিয়ে ফেলল রানা, খোলা জানালা দিয়ে হাত বের করে পর পর তিনবার গুলি করল পাজেরোর পেছনদিকের একটা টায়ার লক্ষ্য করে। টায়ারে লাগল না বুলেট, তবে পাজেরোর বডি ফুটো হয়ে গেল তিন জায়গায়। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে না

তাকিয়ে পারল না দুই শটগানওয়ালা। পাজেরোর গতি কমতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

স্টিয়ারিং ছেড়ে দিল রানা, পা সরায়নি একসেলারেটরের ওপর থেকে, এক্সট্রা ক্লিপ বের করে রিলোড করল ওয়ালথার, তারপর একটুখানি মোচড় দিল স্টিয়ারিং-এ। পাজেরোর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াল ওর গাড়ি, পাশ কাটাল পাজেরোকে। ওকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হঠাৎ ব্রেক কষল পাজেরোর ড্রাইভার। কিন্তু প্রস্তুত ছিল রানা, ব্রেক কষল সে-ও, ডান হাতটা মেলে দিয়ে পর পর দু'বার গুলি করল।

প্রথম গুলিতে মারা পড়ল পাজেরোর ড্রাইভার, দ্বিতীয় গুলিতে মারা পড়ল এক শটগানওয়ালা। এবার নির্দয়ের মতো ওয়ালথারের ম্যাগাজিন খালি করতে শুরু করল রানা—কোনও সুযোগ দিতে চায় না প্রতিপক্ষকে। ওর র‍্যাপিড ফায়ার-এর কারণে পাজেরোর বাকি দুই আরোহীর কেউই কোনও সুযোগ পেল না।

আবার একসেলারেটরে পা দাবাল রানা, হাজির হলো পুলিশকারের সামনে। নামল। ইতিমধ্যে আরেকদফা রিলোড করে ফেলেছে ওয়ালথার, প্রস্তুত অবস্থায় আছে ওটা। এদিকওদিক তাকাচ্ছে ও।

তিনজন অফিসার এসেছিল পুলিশকারে চড়ে, মারা গেছে তিনজনই। গাড়ির সবগুলো দরজা খোলা, ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে জানালার ভাঙা কাচ।

একদিকের দরজার কাছে সাবধানে হাজির হলো রানা, উঁকি দিয়ে তাকাল ভেতরে।

গাড়ির মেঝেতে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে সেলেনা, বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে বোঝা যাচ্ছে না।

ওয়ালথারটা হোলস্টারে ঢোকাল রানা, দুই হাতে খামচে ধরল সেলেনার জ্যাকেট। হ্যাঁচকা টানে মেয়েটাকে বের করে নিয়ে এল গাড়ির বাইরে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে,

ছুট লাগাল নিজের গাড়ির উদ্দেশে।

সেলেনাকে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসিয়ে একসেলারেটরে পা দাবাল রানা, ততক্ষণে অন্য পুলিশকারগুলো পৌঁছে গেছে ব্রিজের কাছে।

এগারো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিবাহিনী যখন প্যারিস দখল করেছিল, বিভিন্ন পছন্দসই বাড়িতে গড়ে তুলেছিল অস্থায়ী কয়েদখানা আর ইন্টারোগেশন সেন্টার। যুদ্ধের পরে ওসব বাড়ির বেশিরভাগেরই বাসিন্দা আর ফেরেনি, তাই পরিত্যক্ত বাড়িগুলো একসময় চলে যায় ফরাসি সরকারের অধীনে। খালি ফেলে না রেখে ওগুলো কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কোনওটাতে গড়ে তোলা হয় পুলিশের হেডকোয়ার্টার, কোনওটাতে আবার ফরেনসিক ল্যাব কিংবা মর্গ।

ও-রকম একটা বাড়ির সেলারে অবস্থিত মর্গে...নিয়ন আলোয় আলোকিত একটা একযামিনেশন রুমে দাঁড়িয়ে আছে ইন্সপেক্টর অ্যাল মার্লো। ওর পাশে আছে ফরেনসিক প্যাথোলজিস্ট ডারেল। ওদের দু'জনের সামনের স্ল্যাবে নিথর শুয়ে আছে সাদা-চাদরে-ঢাকা এক মরদেহ। শুধু পায়ের-পাতা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না লাশটার। ওটার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে ঝুলছে একটা ট্যাগ; নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে, নিহত ব্যক্তির নাম জে ফক্স।

চাদরটা সরিয়ে দিল ডারেল। এখন দেখা যাচ্ছে ফক্সের

মাথা, গলা ও বুক।

মর্গে নিয়ে আসার পর "পরিষ্কার" করা হয়েছে ফক্সকে, তারপরও বীভৎসতার ছাপ রয়ে গেছে নিষ্প্রাণ চেহারাটায়। থুতনির নিচ দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, দু'ভাগ করে ফেলেছে চেহারাটা, হাড়-মাংস-মগজ নিয়ে বেরিয়ে গেছে খুলিতে বিশ্রী এক গর্ত তৈরি করে। গায়েব হয়ে গেছে একটা চোখ। যেটা বাকি আছে, সেটা এমনভাবে লেগে আছে অক্ষিকোটরে যে, দেখে মনে পড়ে যায় সিদ্ধ ডিমের কথা। খুলে আছে চোখটা, নিষ্প্রাণ ফক্স যেন একদৃষ্টে দেখছে মার্লো আর ডুরেলকে।

ডুরেলের দিকে তাকাল মার্লো, চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

ফক্সের চেহারার দিকে ইঙ্গিত করল ডারেল। 'এই লোকের চেহারার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে ঘরের ছাদে গিয়ে লেগেছে বুলেট। অস্ত্রটা বুকের সঙ্গে ধরে ওটার নল সেঁটে ধরা হয়েছিল থুতনির ঠিক নিচে। যেদিক দিয়ে ঢুকেছে বুলেট সে-জায়গার চামড়া পুড়ে গেছে, এমনকী বারুদপোড়া কালিও লেগে আছে সেখানে।'

'কোন্ ফায়ারআর্ম ব্যবহার করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মার্লো।

'তিন ইঞ্চি ব্যারেলের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন রিভলভার, পয়েন্ট ফোর ফোর রেমিংটন ম্যাগনাম গুলি। হাড়-মাংসের বারোটা বাজার জন্য দায়ী খুব কাছ থেকে ছোঁড়া শক্তিশালী বুলেট।'

কিছু বলল না মার্লো, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। ভাবছে, সাধারণ এক ল্যাবরেটরি-অ্যাসিসট্যান্টের মৃত্যুর পেছনে কি অন্যকিছু লুকিয়ে আছে?

'নাইন মিলিমিটারের মতো সেমি-অটো পিস্তলে যে-রকম বুলেট ব্যবহৃত হয়,' বলছে ডারেল, 'রেমিংটন ম্যাগনাম বুলেট সাধারণত অত বেশি ক্ষমতার হয় না। অথচ ফক্সের থুতনিতে সিলমোহরের-মতো একটা পোড়াদাগ দেখা

যাচ্ছে।'

'কী বলতে চাইছ?'

'রিভলভারের হাতল আর ট্রিগারে ফক্সের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। তারমানে নিজেকে গুলি করার সময় গ্লাভস পরেনি সে।'

'না, পরেনি...দেখেছি আমি। লাশটা যখন খুঁজে পাই আমরা, রিভলভারটা তখনও ধরা ছিল ওর হাতে।'

'আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে কোন্ বিষয়টা, জানেন? এত বেশি শক্তিশালী বুলেট ব্যবহৃত হলো রিভলভারে, এত কাছ থেকে নিজের ওপর গুলি চালাল ফক্স, তারপরও ওর আঙুলে বারুদপোড়া কালি লাগল না।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মার্লোর। 'তুমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?'

'এক শ' ভাগ। যেভাবে মরেছে ফক্স, সেটা আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড তা বোঝার জন্য প্রায়ই ওই পরীক্ষা করতে হয় আমাদেরকে...আমরা বলি সোয়াব টেস্ট।' চাদর সরিয়ে ফক্সের দুই হাত বের করল ডারেল। 'নিজের চোখেই দেখুন লোকটার কোনও আঙুলে বারুদপোড়া কালি লেগে আছে কি না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ ফক্স নিজের ওপর গুলি চালায়নি?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডারেল, হাত ছেড়ে দিল ফক্সের। 'এই লোকের হাতে আরও যেসবের নমুনা পেয়েছি আমরা তা হলো: ঘাম, গ্রিয, এবং পিলচার্ড নামের একজাতের তেলতেলে মাছের সূক্ষ্ম মাংস।'

'তোমরা পিলচার্ড টেস্টও চালু করেছ নাকি?'

'না। প্রক্রিয়াজাত করা পিলচার্ডের একটা খোলা টিন পাওয়া গেছে ফক্সের কিচেন টেবিলে, ওর পোষা বিড়ালের ফিডিংডিশের পাশে। ...আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, মৃত্যু বা আত্মহত্যা যা-ই বলি, ফক্সের ব্যাপারটা ঠিক

স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না আমার কাছে। কারণ পোষা বিড়ালকে খাওয়ানোর সময় কেউ আত্মহত্যা করেছে বলে শুনিনি আজ পর্যন্ত।'

কিছু বলল না মার্লো, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফক্সের চেহারার দিকে।

লোকে যেভাবে কোলবালিশ বহন করে, যার্দিকে সেভাবে বহন করে সেলারে নিয়ে গেল বিশালাকার লোকটা। ততক্ষণে একটু একটু করে হুঁশ ফিরতে শুরু করেছে ছেলেটার। ধাতব দরজার ঝনঝনানি শুনতে পেল সে। শুনতে পেল, পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল কেউ; একটা চাবি আরেকটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে আওয়াজ তুলল। টের পেল, কোনও এক সেলের দরজা খুলে সেটার মেঝেতে শুইয়ে দেয়া হলো ওকে। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল কারা যেন।

'ঝামেলা রেখে লাভ কী?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল কেউ। 'একবারে শেষ করে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

'না,' বলল আরেকজন। 'বস বাঁচিয়ে রাখতে বলেছেন ছেলেটাকে।'

বাথটাবের কিনারে বসেছে সেলেনা, মাথা কিছুটা নামিয়ে রেখেছে ওটার ভেতরে। ভাঙা কাচের আঘাতে কেটে গেছে ওর চাঁদি আর কপাল, জায়গাটা ধুইয়ে দিচ্ছে রানা। রক্তে আংশিক লাল হয়ে-যাওয়া পানি গড়িয়ে চলে যাচ্ছে টাবের প্লাগহোল দিয়ে।

কাজ শেষে হ্যাণ্ডশাওয়ারটা দেয়ালের হুকে আটকে দিল রানা। শুকনো একটা টাওয়েল বাড়িয়ে দিল সেলেনার দিকে। 'এবার সাবধানে চুল মুছে ফেলো। কাটা জায়গাগুলো গভীর না, সেলাইয়ের দরকার হবে না।'

মাথা সোজা করল সেলেনা, ঘুরল রানার দিকে।

টাওয়েলটা নিল।

'একজাতের মলম আছে আমার কাছে,' বলে চলল রানা। 'ওটা লাগালে ইনফেকশনের ভয় থাকে না, আবার কাটা জায়গা শুকায়ও তাড়াতাড়ি।'

কিছু বলল না সেলেনা।

স্বাভাবিক হয়ে গেছে সে। ওকে যখন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে আসে রানা, সারা শরীর কাঁপছিল বেচারির। চোখের সামনে এত খুনখারাপি দেখেনি মেয়েটা আগে কখনও। যা ঘটছে তা বেশি হয়ে যাচ্ছে ওর জন্য।

'এখন আর ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না,' আশ্বাস দিল রানা।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল সেলেনা।

'তুমি বরং এক কাজ করো। শাওয়ার নাও। ভালো লাগবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সেলেনা।

ওকে নিজের একটা শার্ট দিল রানা। 'কাপড় ছেড়ে এটা পরতে পারো।'

আবারও মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, টেনে দিল দরজাটা। দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পানি পড়ার আওয়াজ পাওয়ার পর সরে এল। গিয়ে ঢুকল কিচেনে।

ওয়ালথারটার পরিচর্যা করল যত্নের সঙ্গে। নতুন একটা ম্যাগাজিন ঢোকাল ওটাতে। খালি হয়ে যাওয়া স্পেয়ার ম্যাগাযিনগুলোতে ঢুকিয়ে দিল আটটা করে বুলেট। কাজ করতে করতে ভাবল পুরো ব্যাপারটা নিয়ে।

ঢলঢলে শার্ট পরে কিচেনের দরজায় এসে হাজির হলো সেলেনা। ওকে দেখতে পেয়ে চিন্তার জগৎ থেকে ফিরল রানা। টাওয়েলে ভেজা চুল পেঁচিয়েছে মেয়েটা।

ওকে ইশারায় কাছে ডাকল রানা, কিচেন টেবিলের একটা

চেয়ারে বসতে বলল। ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে এল ওয়াইনের বোতল, একটা গ্লাসে ঢেলে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল মেয়েটার দিকে। 'ঠিক আছ?'

'হুঁ।'

সেলেনার মুখোমুখি বসে পড়ল রানা। 'শুরুতে নিজের পরিচয় গোপন করা ছাড়া আর কোনও মিথ্যা বলিনি আমি তোমাকে। তারপর যখন যা বলেছি, সোজাসাপ্টা বলেছি। এখন আরও কিছু কথা বলা দরকার মনে করছি।'

'যেমন...হঠাৎ করেই একটা পিস্তল কোত্থেকে এল তোমার কাছে? যেমন...একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটররের হাত পিস্তলে এত চালু হলো কী করে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে যাহা বলিব, সত্য বলিব। আমি দক্ষিণ এশিয়ার সুজলা-সুফলা, অপূর্ব সুন্দর, ছোট্ট একটা দেশের লোক। আর্মিতে ছিলাম একসময়। এখন দুনিয়াজোড়া মোটামুটি বড়সড় একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি চালাই।' এরপর দুই মিনতির কথা বলল ও—একজন মৃত, অপরজন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে; বৃদ্ধ এক লোকের করুণ আকুতির কথা বলল। 'কিন্তু কাজে নেমেই দেখি বেপরোয়া একদল গুণ্ডা লেগে গেছে পেছনে, আমি যার সঙ্গে যোগাযোগ করি তারই ওপর আক্রমণ করছে, আইন-কানুনের তোয়াক্কা করছে না। এর শেষ দেখব বলে স্থির করেছি আমি।'

একচুমুক ওয়াইন খেল সেলেনা, রানার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল মেঝের দিকে। 'আমি যা জানতে চেয়েছি তার পুরো উত্তর দিলে না কেন?'

'কারণ এরপর একে-একে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে তুমি, সেসবের জবাব দিতে গেলে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু হবে না। সেসব প্রশ্নের উত্তর জানাটাও জরুরি নয় তোমার জন্যে। বরং কাজের কথা বলি। আগামীকাল সকালে

প্যারিস ছাড়ছি আমি।'

'প্যারিস ছাড়ছ মানে? আমার কী হবে তা হলে?'

'তোমাকেও প্যারিস ছাড়তে হবে। যারা লেগেছে আমাদের পেছনে তারা কতখানি বিপজ্জনক, নিশ্চয়ই টের পেয়েছ।'

'তারপরও,' মুখ তুলল সেলেনা, 'তোমার সঙ্গে থাকতে চাই আমি। আমিও শেষ দেখতে চাই এসবের।'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল রানা। তাকিয়ে আছে সেলেনার দিকে।

আরেক চুমুক ওয়াইন খেল মেয়েটা। 'আগামীকাল কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

কিচেন টেবিলের ওপর রাখা আছে প্যানাসেলসাসের ডায়েরিটা, ওটার গায়ে হাত বুলাল রানা। 'সেটা কাল সকালেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু...আমাকে একটু আমার বাসায় যেতে হবে। কিছু জিনিস নেয়ার ছিল।'

'সম্ভব না। সরি।'

'রানা, ওখানে যাওয়াটা জরুরি আমার জন্য।'

'কেন? কাপড় নিতে চাও? তোমার যা লাগে, যে-কোনও শপিংমল থেকে কিনে নেয়া যাবে।'

'না, কাপড় না।'

'তা হলে?'

'আমার একটা অ্যাড্রেসবুক রয়ে গেছে ওখানে। কানাডায় আমার যত বন্ধু আর আত্মীয় আছে, সবার নাম-ঠিকানা আছে ওটাতে। যারা লেগেছে আমাদের পেছনে, তারা যদি আবার যায় আমার অ্যাপার্টমেন্টে, যদি হাতিয়ে নিতে পারে ওটা, কানাডায় ফিরে গিয়েও শান্তি পাবো না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

মর্গ থেকে অফিসে ফিরেই নদীতীরের গোলাগুলির ঘটনাটা জানতে পারল মার্লো। সহিংসতা প্যারিসে নতুন কিছু নয়। তবে সরাসরি পুলিশের ওপর হামলা ব্যতিক্রমী ঘটনা। রীতিমতো রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে আজ রাতে। মারা পড়েছে তিনজন পুলিশ। ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে একাধিক দুর্বৃত্তের লাশ। একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে নদী থেকে। আগ্নেয়াস্ত্র আর কার্তুজের খোসা ছড়িয়ে ছিল চারদিকে। পুলিশের ওপর-মহল থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, খতিয়ে দেখা হবে ঘটনাটা। শুরু হয়ে গেছে ধরপাকড়। আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সন্দেহভাজন কয়েকটা দলের কিছু কর্মীর হাতে হাতকড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যে।

নিজের ডেস্কে একটা বাদামি খাম দেখতে পেল মার্লো। ভেতরে একটা রিপোর্ট, পাঠিয়েছে হ্যাণ্ডরাইটিং অ্যানালিস্ট। ফক্সের অ্যাপার্টমেন্টে শপিংলিস্ট অথবা মেমোতে ওর হাতের-লেখার যেসব নমুনা পাওয়া গেছে, তার কোনওটার সঙ্গেই সুইসাইড-নোটের লেখার মিল নেই। নিজের মা'র উদ্দেশে অসমাপ্ত কয়েকটা চিঠি লিখেছিল ফক্স, সেগুলোর সঙ্গেও মেলানো হয়েছে সুইসাইড নোটের হ্যাণ্ডরাইটিং। মিল পাওয়া যায়নি।

রিপোর্টটা খামের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল মার্লো।

ফরেনসিক একযামিনার বলছে, নিজের ওপর গুলি চালায়নি ফক্স। হ্যাণ্ডরাইটিং অ্যানালিস্ট বলছে, সুইসাইড নোটের হাতের-লেখা ফক্সের না। সেলেনা বার্নহার্টের সঙ্গে শেষবার যখন দেখা হয়েছে, তখন ওই মেয়েও দাবি করেছিল, আত্মহত্যা করেনি ওর সহকারী।

তারমানে খুন করা হয়েছে লোকটাকে।

সেটার সঙ্গে কি নদীতীরের গোলাগুলির কোনও যোগসূত্র

আছে?

ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে মার্লোকে। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, সেলেনাকে অবহেলা করে ভুল করেছে সে আসলে। মনে হচ্ছে, মেয়েটাকে পাগল ঠাওরানো ঠিক হয়নি। কিছু-একটার সঙ্গে কোনও-না-কোনও সম্পর্ক আছে ওই মেয়ের।

জবাব না-পাওয়া কিছু প্রশ্ন এখন হাজির হয়েছে মার্লোর সামনে। শেষ যখন দেখা হলো, দীর্ঘদেহী এক অচেনা লোক ছিল মেয়েটার সঙ্গে; কে সে? মেয়েটিকে নিজের বাগ্‌দত্তা বলে দাবি করেছে ওই লোক, কিন্তু পরস্পরের প্রতি ওদের আচরণ কেমন বেখাপ্পা মনে হয়েছে মার্লোর কাছে। কেমন যেন আন্তরিকতাহীন মনে হয়েছে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মেয়েটা, ওকে তখন থামিয়ে দিয়েছে ওই লোক।

চোখ পিটপিট করল মার্লো। সেলেনা বার্নহার্টের ব্যাপারে ভুলই করে ফেলেছে সে।

মেয়েটা বলেছিল, এককালে বয়ফ্রেণ্ড ছিল তার, এখন নেই। বলেছিল, একাকী জীবন কাটাচ্ছে সে এখন। অথচ দীর্ঘদেহী ওই লোক...

তারমানে, তখন মিথ্যা বলছিল লোকটা।

মার্লোর মনে হচ্ছে, ওই লোক যে-ই হোক, এই কেসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তার।

কী নাম লোকটার? স্মৃতি ঘাঁটল মার্লো। না, নিজের নাম বলেনি লোকটা, বরং সেলেনা যখন বলে দিল নামটা তখন যেন বিরক্তই হয়েছিল।

মাসুদ রানা...নামটা মনে পড়ে গেল মার্লোর।

আবারও চোখ পিটপিট করল মার্লো। লোকটা নিঃসন্দেহে ফরাসি না—ও-রকম বাদামি চামড়া আর চেহারার আদল ফরাসিদের হয় না; অথচ নিখুঁত উচ্চারণে ফ্রেঞ্চ বলছিল সে।

তারমানে...মনে মনে বলল মার্লো... *ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে মাসুদ রানাকে নিয়ে। ঢুঁ মারতে হবে সেলেনা বার্নহার্টের অ্যাপার্টমেন্টেও।*

মার্লো ইচ্ছা করলে সরকারিভাবেই করতে পারে কাজটা। যে-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে ওয়ার‍্যান্ট ইস্যু করিয়ে নেয়াটা কঠিন কোনও কাজ হবে না।

একদৌড়ে সহকর্মী গোয়েন্দা পিকার্ডোর কাছে গিয়ে হাজির হলো মার্লো, পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল লোকটাকে। তারপর ওরা দু'জনে বেরিয়ে এল ব্যস্ত করিডোরে, সিঁড়ির উদ্দেশে হাঁটছে।

সিরিয়াস হয়ে গেছে পিকার্ডোর ধূসর আর হতশ্রী চেহারাটা। হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'নদীতীরের ওই খুনখারাপির ব্যাপারে আপডেট পাওয়া গেছে।'

'কী?'

'একজন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়েছি। গাড়ি চালিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে নিরাপদ দূরত্বে গাড়ি থামায়, নজর রাখে ঘটনাস্থলের ওপর। আলাদা করে চিনতে পারে একজন বাদামি চামড়ার পুরুষ আর এক শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে। ওই লোকের বক্তব্য, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে সেই লোক আর শ্বেতাঙ্গ মেয়েটা। মেয়েটার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের মতো, মাথায় লাল চুল। আর পুরুষলোকটা আরেকটু বয়স্ক, দীর্ঘদেহী, সুঠাম শরীর। মেয়েটাকে পুলিশের গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করেছে সে, পরে আরেকটা গাড়িতে তুলে চট্‌জলদি ছেড়েছে ঘটনাস্থল। প্রত্যক্ষদর্শী লোকটার মতে, মেয়েটার মাথা কেটে বা ফেটে গিয়েছিল...রক্ত পড়ছিল।'

চোয়াল শক্ত হলো মার্লোর। 'মেয়েটা কি গুলি খেয়েছে?'

'মনে হয় না। ছিটকে-আসা কাচের কারণে হয়তো...। আমাদের অফিসাররা মারা পড়ার আগে পাকড়াও করেছিল

মেয়েটাকে, গাড়িতে তুলেছিল। পুলিশ স্টেশনে ফিরে আসার কথা বলেছিল একজন রেডিয়োতে, তারপরই হামলা চালানো হয় ওদের ওপর। যা-হোক, ওই মেয়ের গা থেকে কিছু রক্ত লেগে গেছে পুলিশকারের পেছনের-সিটে, তবে সে-রক্ত মেয়েটার না।'

'তা হলে কার?'

'ব্রিজের কাছে একটা লাশ পেয়েছি আমরা—খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেছে অটোমেটিক রাইফেলের বুলেট, বুকেও বিশ্রী একটা ক্ষত আছে। আমাদের ধারণা, যখন গুলি চালানো হয় ওই লোকের ওপর, তখন ওর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা; রক্ত ছিটকে গিয়ে লেগেছে মেয়েটার শরীরে, পরে সেখান থেকে লেগেছে পুলিশকারের ব্যাকসিটে। রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি আমরা।'

'ওই মেয়ে এখন কোথায়?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পিকার্ডো। 'কোনও ধারণা নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে। হয় নিজেই পালিয়েছে, নয়তো ওই লোক...'

'এত দ্রুত সটকে পড়তে পারল কী করে ওরা? আমাদের ব্যাকআপ স্কোয়াড না গিয়েছিল ঘটনাস্থলে?'

মাথা ঝাঁকাল পিকার্ডো। 'এই লোকটাকে অত্যন্ত চালু মাল বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'ভালো,' নিমের তিতা ঝরল মার্লোর কণ্ঠে। সিঁড়ির কাছে থেমে দাঁড়িয়েছিল, নামতে শুরু করল। 'আর কিছু?'

'অটোমেটিক রাইফেলটা উদ্ধার করা হয়েছে। মিলিটারি ওয়েপন, ট্রেস করার কোনও উপায় নেই। ওটা কাজে লাগিয়ে গুলি করেছে যে-লোক তার আঙুলের ছাপ নেই সেটাতে, কারণ গ্লাভস ব্যবহার করা হয়েছে ট্রিগার টানার সময়। নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যে-লোকের লাশ, তার দুই হাতেই গ্লাভস ছিল। রাইফেলে যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে

সেগুলো কৌতূহলী এক পথচারীর।’

‘আর?’

‘যেসব লাশ পাওয়া গেছে তাদের সবার কাছেই ফায়ারআর্ম ছিল। এই লোকগুলোর দু’জনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগ আছে আমাদের কাছে। বাকিদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।’

‘পুরো ঘটনাটার ব্যাপারে তোমার ধারণা কী?’

‘ড্রাগের কারবার...সম্ভবত।’

‘আমার তা মনে হয় না।’

কী-আর-করা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পিকার্ডো। ‘আরও ইনফর্মেশন আছে।’

‘বলো।’

‘আরেকজন শুটার, খুব সম্ভব গায়েব হয়ে যাওয়া সেই লোকটা, পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের কোনও ফায়ারআর্ম ব্যবহার করেছে...আমার ধারণা ওয়ালথার। ওটা থেকে ছোঁড়া বুলেট পাওয়া গেছে গ্লাভস-পরিহিত লোকটার গায়ে, একটা কালো মিটসুবিশি পাজেরোর বডিতে এবং ওটার চার আরোহীর শরীরে।’

‘কিন্তু আমাদের যেসব অফিসার মারা পড়েছে তাদের কারও গায়ে না?’

‘না। অটোমেটিক এবং সেমি-অটোমেটিক অন্য ফায়ারআর্ম ব্যবহার করে হত্যা করা হয়েছে আমাদের অফিসারদের।’

‘এবং সেই ওয়ালথারটা উদ্ধার করা যায়নি, তা-ই না?’

‘না। ...পয়েন্ট থ্রি এইটের বুলেট পাওয়া গেছে যাদের শরীরে, তাদের কাউকেই একবারের বেশি দু’বার গুলি করা হয়নি। অর্থাৎ ফায়ারআর্মটা যার হাতে ছিল, ওটা চালানোয় তার হাত সাংঘাতিক পাকা।’

আরেকবার চোয়াল শক্ত করল মার্লো, কিছু বলল না।

পিকার্ডোকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। নিজের গাড়ির দিকে চলেছে।

মার্লোর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পিকার্ডো বলল, 'ঘটনা পর্যালোচনা করে আমাদের প্রাথমিক অনুমান, রহস্যময় ওই ভিনদেশি লোকটা যদি ক্রিমিনাল হয়েও থাকে, সাধারণ কেউ নয় সে।'

'কেন বলছ কথাটা?'

'নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যে-লোকের লাশ, সে গুলি খাওয়ার সময় ওর পজিশন কী ছিল, হিসেব করে বের করেছে আমাদের এক কলিগ। কতদূর থেকে গুলি চালানো হয়েছে ওই লোকের ওপর, হিসেব করে বের করা হয়েছে সেটাও। ...পঁচিশ মিটার।'

পিকার্ডোর শেষকথাটা শুনে কেন যেন থমকে দাঁড়াল মার্লো, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

'পঁচিশ মিটার দূর থেকে,' আবার বলল পিকার্ডো, 'হ্যাণ্ডগানের এক গুলিতে অটোমেটিক রাইফেলওয়ালা কাউকে খতম করে দিতে পারবে ক'জন?'

জবাব না দিয়ে গাড়ির দরজা খুলল মার্লো, উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে।

ওর পাশের সিটে বসল পিকার্ডো। নিজের বক্তব্য শেষ করল, 'ওই লোকটা একা লড়াই করেছে এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে। সে যে-ই হোক, আপাদমস্তক প্রফেশনাল।'

'আমারও তা-ই মনে হয়।'

বারো

'তুমি নিশ্চিত ওটা তোমার বেডসাইড টেবিলেই আছে?' সেলেনাকে জিজ্ঞেস করল রানা, মেয়েটার অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং থেকে যথেষ্ট দূরে সুবিধাজনক জায়গায় পার্ক করছে গাড়ি।

এখানে আসার আগে একটা শপিংমলে গিয়েছিল রানা, ওখান থেকে একটা বেসবল ক্যাপ কিনে দিয়েছে সেলেনাকে। ওটা এখন পরে আছে মেয়েটা। চুল খোঁপা করে বেঁধে গুঁজে দিয়েছে ক্যাপের ভেতরে। ওর লাল চুল দেখার উপায় নেই এখন। রানার কথামতো নিচু করে রেখেছে ক্যাপটা, ফলে অদৃশ্য হয়ে গেছে চেহারার অনেকখানি।

'হুঁ,' রানার প্রশ্নের জবাবে বলল মেয়েটা, 'বেডসাইড টেবিলেই আছে। লাল রঙের ছোট একটা ডায়েরি।'

'তুমি তা হলে গাড়িতেই থাকো। ইগনিশনে চাবি থাকল। যদি কোনও ঝামেলা টের পাও, সঙ্গে সঙ্গে পালাবে। আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে চালাবে, তাড়াহুড়ো করবে না—কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। আমার মোবাইল নম্বর আছে তোমার কাছে, প্রথম সুযোগেই ফোন করবে। আমিই দেখা করবো তোমার সঙ্গে।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সেলেনা।

সঙ্গে করে আনা সানগ্লাস পরল রানা, দরজা খুলে নামল গাড়ি থেকে।

ধীরস্থির ভঙ্গিতে হেঁটে সেলেনার অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এর

দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। থেকে থেকে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। গাড়িতে বসে একদৃষ্টে ওকে দেখছে সেলেনা। উৎকণ্ঠা কাজ করছে ওর মনে।

বিছানার পাশের টেবিল থেকে একটা ডায়েরি নিয়ে আসা তেমন কঠিন কিছু না। তারপরও মেয়েটার মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক বিপজ্জনক কোনও কাজ করতে যাচ্ছে রহস্যময় ওই মানুষটা।

সেলেনার চোখের সামনে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সদর-দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা একসময়।

গত আধ ঘণ্টা ধরে সেলেনার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ অপেক্ষা করছে মার্লো। বিরক্তি অনুভব করছে সে। কারণ, এই অপেক্ষার কোনও ফল পাবে কি না, বুঝতে পারছে না।

দু'জন এজেন্ট আছে মার্লোর সঙ্গে। একটা ফরেনসিক টিমের আসার কথা আছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে মার্লো আর দুই এজেন্ট। কিন্তু আধ ঘণ্টা হতে চলল কোনও খবর নেই টিমের।

মাথাব্যথা করছে মার্লোর। ওর মনে হচ্ছে, অপেক্ষা যত দীর্ঘ হচ্ছে, মাথাব্যথা তত বাড়ছে। সে খেয়াল করেছে, ফরেনসিক টিমের জন্যে ও যখনই কোনও জায়গায় অপেক্ষা করে, তখনই দেরি করে সেখানে যায় ওই লোকগুলো।

আসুক আজ, মনে মনে বলল মার্লো, *সময়জ্ঞান শিখিয়ে ছাড়বো সব ক'টা শয়তানকে!*

কফি নিয়ে আসার জন্য কাউকে পাঠাবে কি না, ভাবল সে। বিড়বিড় করে গালি বকল—মনে পড়ে গেছে, যখনই কফি আনার জন্য কাউকে পাঠায়, সে-লোক এমন কিছু-একটা নিয়ে আসে, যে-জিনিস খেলে ঘোড়ার-পেশাবের কথা মনে পড়ে যায়। তাই কফি আনার কাজটা নিজেই করার সিদ্ধান্ত নিল সে। রাস্তার ওপারে একটা রেস্তোরাঁ দেখেছে,

অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং থেকে বের হয়ে হাঁটা ধরল সেটার উদ্দেশে।

ওয়ান-টাইম কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে রাস্তায় যখন আবার হাজির হলো মার্লো, সুস্বাদু কফির কারণে খুশি হয়ে উঠেছে মন, অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তাই সানগ্লাস-পরা বিদেশি, দীর্ঘদেহী লোকটাকে খেয়াল করল না।

কিন্তু ওই লোক দেখামাত্র চিনতে পেরেছে মার্লোকে, বিপদঘণ্টা বেজে উঠেছে তার মনে। বুঝতে পেরেছে, এই সাতসকালে কেন সেলেনার অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এ হাজির হয়েছে প্যারিস-পুলিশের ইন্সপেক্টর। বুঝে গেছে, একা আসেনি ইন্সপেক্টর, তার সঙ্গে আরও লোক আছে। এবং তারা খুব সম্ভব সেলেনার অ্যাপার্টমেন্টেই আছে। তারপরও এমনকিছু করল না সে, যার ফলে চোখে পড়তে পারে কারও।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে বিল্ডিং-এর সদর-দরজা দিয়ে ঢুকে গেল সে।

ডোরবেল বেজে উঠল সেলেনার অ্যাপার্টমেন্টের।

ভেতরে থাকা দুই পুলিশ অফিসার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এত জলদি ফিরে এল ইন্সপেক্টর মার্লো? ভালো কফি পেলে সেটা তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া লোকটার অভ্যাস। কখনও কখনও সহকর্মীদের জন্যে কফি নিয়েও আসে সে।

লোকটা আজ ওই কাজ করছে নাকি?

ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে দিল এক অফিসার।

না, যা ভেবেছিল সে তা নয়—দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অপরিচিত এক লোক। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে পুলিশ দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে বলে মনে হলো না। বরং মিটিমিটি হাসছে।

'হ্যালো,' বলল লোকটা, 'একটু সাহায্য করতে পারবেন

আমাকে?'

যে-কোনও কাজ নিজে করতে পারলে সেটার মজাই আলাদা, কফির কাপে শেষ চুমুকটা দেয়ার সময় ভাবল মার্লো, হাজির হয়েছে সেলেনার অ্যাপার্টমেন্টের সদর-দরজায়। মনে মনে ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে—পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে ওর মাথাব্যথা। চাপ দিল ডোরবেলে।

কেউ খুলল না দরজা।

ভ্রূ কুঁচকে গেল মার্লোর। ভেতরে দুই-দুইজন অফিসার কী করছে?

আবারও ডোরবেলে চাপ দিল সে।

জবাব নেই।

দরজায় কিল মারতে গিয়ে কী মনে হলো মার্লোর...হাতল ধরে মোচড় দিল।

খুলে গেল দরজাটা। ভেতর থেকে লক করা নয় ওটা।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল মার্লো। হিপ হোলস্টার থেকে বের করে হাতে নিয়েছে ওর পয়েন্ট থ্রি এইট স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন। বিপদের আশঙ্কা করছে।

বাকি ঘরগুলো দ্রুত চেক করার পর হাজির হলো সে সেলেনার তথাকথিত ল্যাবরেটরিতে। এখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পেল ওর দুই সহকর্মীকে। মুখে কাপড় ভরে দেয়া হয়েছে ওদের, তাই টুঁ শব্দটাও করতে পারছে না কেউ।

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে পুরো ল্যাবরেটরি দেখল মার্লো।

অনতিদূরের একটা টেবিলের ওপর আনলোডেড অবস্থায় পড়ে আছে দুই পুলিশ অফিসারের ফায়ারআর্ম—আলগা করে ফেলা হয়েছে প্রতিটা পার্ট, ব্যারেলগুলো উধাও।

ভাড়া-করা গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রানা, নোটবুকটা বাড়িয়ে ধরল সেলেনার দিকে। 'নাও। প্রথম সুযোগেই

পুড়িয়ে ছাই করবে এটা।'

'ঠিক আছে।'

গাড়ি চালু করল রানা, একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে-রেস্টুরেন্ট থেকে কফি কিনেছে মার্লো, সেটার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল একটা লোক। গতকাল রাত থেকে নজর রাখছে সে সেলেনার অ্যাপার্টমেন্টের ওপর। সে পুলিশের কোনও অফিসার না, আইনপ্রয়োগকারী অন্য কোনও সংস্থার সদস্যও না। সে *ঈশ্বরের তরবারির* একজন সদস্য।

গাড়ি চালিয়ে উধাও হয়ে যেতে দেখল সে রানাকে। আনমনে মাথা ঝাঁকাল নিজের উদ্দেশেই। পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোন। বিশেষ একটা নম্বর টিপে জানিয়ে দিল, সেলেনা বার্নহার্টের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে কী দেখেছে এতক্ষণ।

মাসুদ রানা যে-গাড়ি ব্যবহার করছে, সেটার নিখুঁত বর্ণনা দিতেও ভুলল না।

মার্লোর মনে হচ্ছে, ধাঁধায় পড়ে গেছে সে।

সেলেনার ল্যাবরেটরি থেকে যে-দু'জন পুলিশ অফিসারকে উদ্ধার করা হয়েছে, তারা তাদের ওপর "হামলাকারীর" বর্ণনা দিয়েছে। এবং সে-বর্ণনা শোনামাত্র বুঝতে দেরি হয়নি মার্লোর, কে বন্দি করেছিল ওই অফিসারদের।

রেইলওয়ে দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত মার্সিডিযটাও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মার্লোকে। ওটার মালিকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নম্বরপ্লেটটা ভুয়া। ইঞ্জিন আর চেসিস থেকে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে নম্বর। ইণ্টারনাল লকিং সিস্টেমে যে-পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তা দেখলে মনে হয় কাউকে

কিডন্যাপ করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল গাড়িটা। এবং, আরও মনে হয়, কেউ একজন আটকা পড়েছিল ওই গাড়ির ভেতরে; কারণ খুব সম্ভব বাইরে আসার উদ্দেশ্যে গুলি করেছে সে একদিকের জানালায়, পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের কোনও একটা ফায়ারআর্মের বুলেট সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

আবারও সেই পয়েন্ট থ্রি এইট।

এবং আবারও সেই মাসুদ রানা।

তারমানে রানাই কি আটকা পড়েছিল লিমাযিনের ভেতরে?

নদীতীরের গোলাগুলির সঙ্গেও কি রানা জড়িত?

লোকটা আসলে কে?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, ওই প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বাতাসে মিলিয়ে গেছে রহস্যময় ওই লোক।

লিমাযিন দুর্ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে, সে-জায়গার কাছের একটা রেস্টুরেন্টের পার্কিংলটে পাওয়া গেছে পরিত্যক্ত একটা সিত্রোঁ...সামনের অংশটা দুমড়ে গেছে। ওই রেস্টুরেন্টের মালিক এবং কয়েকজন খদ্দেরকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ধারেকাছে কোনও গাড়ি-দুর্ঘটনা ঘটেনি গত কয়েকদিনে। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, ভাঙাচোরা ওই গাড়িটা ওই পার্কিংলটে এল কীভাবে? বাতাসে উড়ে গিয়ে হাজির হয়নি নিশ্চয়ই?

পুলিশের গোয়েন্দারা কাজ করেছে ওই ব্যাপারে। মার্সিডিযের বডি থেকে ওঠা চলটা পাওয়া গেছে সিত্রোঁর বডিতে।

সবচেয়ে বড় কথা, সিত্রোঁটা নিজের নামে ভাড়া নিয়েছিল সেলেনা বার্নহার্ট।

পরে এক লোক নাকি ফোন করেছিল রেণ্ট-আ-রাইডে, দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। অন্য আরেক লোক হাজির হয়েছিল রেণ্ট-আ-রাইডের অফিসে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেছে।

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একসূত্রে গাঁথতে পারছে না মার্লো।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে-জায়গায় লিমাযিনের সঙ্গে কোলাকুলি করছিল সিত্রোঁ, সেখানে কী করছিল কানাডিয়ান ওই বায়োলজিস্ট?

তারপর কী কাজে গিয়েছিল সে ওই রেস্টুরেন্টে?

মার্লোর ফরেনসিক টিম চিরুনি-অভিযান চালিয়েছে সেলেনার অ্যাপার্টমেন্টে। মেয়েটা দাবি করেছিল, ওর ওপর প্রাণঘাতী হামলা করা হয়েছিল এবং ওকে খুন করতে চেয়েছিল যে-লোক সে নিজেই নাকি মারা পড়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল মার্লো, বলেছিল সেলেনার মাথায় সমস্যা আছে। কিন্তু ফরেনসিক টিম আল্ট্রাভায়োলেট প্রযুক্তির সাহায্যে রক্তের উপস্থিতি পেয়েছে ওই অ্যাপার্টমেন্টে, হামলাকারীর মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিল বলে দাবি করেছে সেলেনা, ঠিক সেখানেই।

তারমানে, মেয়েটা যখন ওর তথাকথিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গিয়েছিল, তখন কেউ অথবা একাধিক লোক গিয়েছিল ওই অ্যাপার্টমেন্টে, সরিয়ে ফেলেছে লাশটা। শুধু তা-ই না, রক্তের আলামত গোপন করার উদ্দেশ্যে ধোয়ামোছাও করেছে তারা।

রক্তের ওই নমুনার ডিএনএ রিপোর্টও পেয়ে গেছে মার্লো। এবং, ওই রিপোর্ট, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া সেলেনার ব্যবহার্য কিছু জিনিসে যে-ডিএনএ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে ম্যাচ করেনি।

প্যারিসের একটা পার্ক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক লোকের কাটা-কব্জি। সেটার ডিএনএ প্রোফাইলের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে সেলেনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া রহস্যময় ডিএনএ'র প্রোফাইল।

কোথাকার জল কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে তা হলে?

পার্কে-পাওয়া কাটা-কব্জি যার ছিল, পুলিশের হিসেব অনুযায়ী সে একজন দাগী আসামি। নাম গুন্টার। যৌন হয়রানির একাধিক অভিযোগ আছে ওই লোকের বিরুদ্ধে। ধর্ষণের মামলায় অনেকবার হাজিরা দিতে হয়েছে তাকে আদালতে। চুরি এবং সশস্ত্র ডাকাতিও করেছে সে কয়েকবার। একটা কেসে তাকে ফাঁসাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। রেকর্ড বলছে, দুটো অমীমাংসিত হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত লোকটা, তবে কোনওটাই প্রমাণ করা যায়নি। তাই চোদ্দ শিকের বাইরেই রয়ে গিয়েছিল সে। আপাতত তার কোনও হদিস নেই; পুলিশের মর্গে শুধু আছে তার একটা কাটা-কব্জি। এবং সেলেনার অ্যাপার্টমেন্টে আছে আল্ট্রাভায়োলেট ব্লাড স্যাম্পল।

তারমানে মেয়েটা যা বলেছিল মার্লোকে, তা সত্যি?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গুন্টার কেন যাবে ওই মেয়ের অ্যাপার্টমেন্টে? চুরি করতে? উঁহুঁ...বিনাবাক্যে নাকচ করে দেয়া যায় সম্ভাবনাটা। চুরির অভিযোগ আছে বটে গুন্টারের বিরুদ্ধে, কিন্তু ছিঁচকে চোর না সে। তা ছাড়া চিরুনি অভিযানের পর নিশ্চিত হওয়া গেছে, তেমন দামি কিছু নেই কানাডিয়ান ওই বায়োলজিস্টের অ্যাপার্টমেন্টে...অন্তত অভিযানের সময় ছিল না।

তা হলে?

তা হলে...ভেবে নিলে ভুল হবে না সম্ভবত...বড় কিছু একটা সংঘটিত হচ্ছে প্যারিসের বুকে। ভেবে নিলে ভুল হবে না, কেউ একজন ভাড়া করেছিল গুন্টারকে—সেলেনাকে খুন করানো, অথবা ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কিছু-একটা চুরি করানোর জন্য।

আবার দুটোই হতে পারে।

নিজের পিছন দিকে লাথি মারতে ইচ্ছা করছে মার্লোর। কেন যে গুরুত্ব দিল না ওই বায়োলজিস্টকে!

আরও কথা আছে। ধরে নেয়া যাক সেলেনার কথা ঠিক—ওর অ্যাপার্টমেন্টে মরে পড়ে ছিল গুন্টার। সেক্ষেত্রে কে বা কারা গায়েব করল ওই লোকের লাশ?

এবং ওই লাশ গায়েবের সঙ্গে কি জে ফক্সের হত্যাকাণ্ডের কোনও সম্পর্ক আছে? যারা খুন করতে চেয়েছে সেলেনাকে, তারাই কি খুন করেছে বা করিয়েছে ফক্সকে?

এসবের সঙ্গে মাসুদ রানার সম্পর্ক কী?

সেলেনার বলা একটা কথা দোলা দিয়ে গেল মার্লোর স্মৃতির পর্দায়: *আমার মনে হয় আরেকজন লোককে খুন করতে চাইছে ওরা।*

এই *আরেকজন লোকটা* কে? মাসুদ রানা? নাকি জে ফক্স?

রেললাইনের ঘটনাটা যদি ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে, মানে, কেউ যদি রানাকে চিরবিদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পেতে থাকে সেখানে, তবুও একটা "কিন্তু" রয়ে যায়। অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও রানাকে দেখেছে মার্লো; নিশ্চিত মৃত্যু-এড়ানো মানুষের মতো মনে হয়নি লোকটাকে। ওই লোক যদি সাধারণ কেউ হতো, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলে প্রথম সুযোগেই প্যারিস ছাড়ত।

কিন্তু তা সে করেনি।

রানা এবং সেলেনা এখন কোথায়?

রানা কি একজন শিকারী, না শিকার?

পুরো ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে মার্লোর কাছে। আজব কোনও হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে।

কফির কাপ সামনে নিয়ে নিজের অফিসে বসে আছে সে, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে কাপে। সাইড ডেস্কে রাখা ফ্যাক্স মেশিনটা সচল হয়ে ওঠায় হুঁশ ফিরল ওর।

ফ্যাক্সের কাগজটা টেনে ছিঁড়ল সে মেশিন থেকে।

মাসুদ রানা। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কর্ণধার। পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরে শাখা আছে ওই এজেন্সির। এমনকী প্যারিসেও আছে। সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছে তারা। মাসুদ রানা আড়ালে থেকে কাজ করে যাচ্ছে তার প্রতিটা শাখার জন্য। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। কয়েকটা দেশের সরকারকেও সাহায্য করেছে সে। কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড পাওয়া যায়নি লোকটার বিরুদ্ধে। এমনকী ভুল পার্কিং-এর কারণে কখনও জরিমানাও দেয়নি ট্রাফিক পুলিশকে।

ফ্যাক্স মেসেজটা হাতে নিয়ে চুপ করে আছে মার্লো। ওর বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে।

নামীদামি একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কর্ণধার কী করছে একজন কানাডিয়ান বায়োলজিস্টের সঙ্গে?

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল মার্লো। ফরাসি পুলিশের বরাত দিয়ে বেসরকারি হুলিয়া জারি করতে হবে মাসুদ রানার নামে।

কী ঘটছে প্যারিসে, তা যদি ঠিকঠাক জানতে হয়, মাসুদ রানাকে নাগালে পাওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।

তেরো

হেলমুট ওয়ার্নারকে অনুসরণ করা ছাড়া রানারও অন্য উপায়

নেই, এবং সে-কাজই করেছে ও। সেলেনাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্সের ল্যাঙ্গুডকের উদ্দেশে।

হেনরিখ প্যানাসেলসাসের ডায়েরিটা এখনও পুরো পড়তে পারেনি ও। আসলে কী খুঁজছে, সে-ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা নেই ওর এখনও। নিরেট নয় এমন কিছু ক্লু আছে হাতে, সেগুলোই অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখনও ও নিশ্চিত না, এই কেসে সাফল্য আসবে কি না।

ওর পাশের সিটে বসে আছে সেলেনা, ঘুমাচ্ছে। বেচারির মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। গত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ঘুমাচ্ছে সে।

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই রানা টের পেয়েছে, ফলো করা হচ্ছে ওদেরকে। কিন্তু ওই ব্যাপারে কিছু বলে মেয়েটার ঘুম নষ্ট করতে চায়নি।

একটা নীল বিএমডাব্লিউ পিছু নিয়েছে ওদের। থেকে থেকে রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকিয়েছে রানা, এবং বেশিরভাগ সময়ই দেখতে পেয়েছে গাড়িটা। বার কয়েক ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছে ওই গাড়ির ড্রাইভারকে, খসিয়ে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আঠার মতো পেছনে সেঁটে আছে বিএমডাব্লিউ।

প্যারিস ছাড়ার পর অনুসরণের ব্যাপারটা ধরতে পারে রানা। তেল নেয়ার জন্য একটা পেট্রোল পাম্পে থেমেছিল, বিএমডাব্লিউটা তখন নজর কাড়ে ওর। ভেতরে চারজন লোক। চারজনই কেমন নার্ভাস। ওদেরকে যাতে দেখে না ফেলে রানা, সেজন্য অতিমাত্রায় সতর্ক। বাড়তি সেই সতর্কতাটুকু বেখাপ্পা মনে হয় রানার কাছে। সন্দেহ সওয়ার হয় ওর মনে।

সেটা ঠিক নাকি বেঠিক পরীক্ষা করে দেখে ও। তেল নেয়া শেষে রাস্তায় ওঠার পর ওভারটেক করতে শুরু করে একের পর এক গাড়িকে; খেয়াল করল, একই কাজ করছে

বিএমডাব্লিউ গাড়ির ড্রাইভার। কখনও আবার বিনা-প্রয়োজনে গতি কমায় ও, বিরক্তি উৎপাদন করে পেছনের ড্রাইভারদের; তখন খেয়াল করে, গতি কমে গেছে বিএমডাব্লিউ-রও।

একসময় ঘুম ভাঙল সেলেনার। খেয়াল করল, রিয়ারভিউমিররের দিকে বার বার তাকাচ্ছে রানা। জিজ্ঞেস করলা, 'কী হয়েছে?'

'চারজন লোক পিছু নিয়েছে আমাদের।'

ঘুমের ঘোর কেটে গেল সেলেনার। 'কোনওভাবে এড়ানো যায় না, রানা? আমি আর রক্তারক্তি দেখতে চাইছি না।'

'দেখতে না চাইলেও দেখতে হবে মনে হচ্ছে। রক্তারক্তি একটা কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেছ তুমি। কানাডায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলাম, শোনোনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সেলেনা। তারপর বলল, 'পেছনের ওই লোকগুলো আসলে কী চাইছে?'

'আমার ধারণা, হাইওয়ের নিরালা কোনও জায়গায় একা পেতে চাইছে আমাদেরকে।'

'তারপর?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে সেলেনার।

'তারপর কিছু একটা করবে।'

'রানা, তার আগে দয়া করে তুমিই কিছু একটা করো। আমি মরতেও চাই না, কারও মৃত্যু দেখতেও চাই না।'

'শক্ত হয়ে বসো তা হলে।' গিয়ার বদল করে একসেলারেটরে পা দাবাল রানা।

যেন লাফিয়ে আগে বাড়ল ওর গাড়ি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা ট্রাককে ওভারটেক করল রানা। ওটার হর্নের আওয়াজ শোনা গেল পেছন থেকে। গর্জন করছে রানার গাড়ির ইঞ্জিন, সে-শব্দে ভরে গেছে গাড়ির ভেতরটা।

রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকাল রানা। গতি বাড়িয়েছে বিএমডাব্লিউ। একসেলারেটরে চাপ বাড়াল রানা।

কমিয়ে মোচড় কেটে ঢুকে পড়ল গ্রামে যাওয়ার রাস্তায়।

ওর গাড়ি এখন ছুটে চলেছে মেইন স্কোয়্যার ধরে। স্টিয়ারিং এদিকওদিক ঘোরাচ্ছে বার বার, যাতে সহজে নিশানা করতে না পারে বিএমডাব্লিউর বন্দুকবাজ লোকটা। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে পাশ কাটাল ও একটা ফোয়ারা। রাস্তার একধারে বিক্রি করা হচ্ছে বিয়ার, ওখানে দাঁড়িয়ে পান করছে কয়েকজন গ্রামবাসী; রানার গাড়িটা পাগলের মতো ছুটে আসতে দেখে চিৎকার করে উঠল তারা, লাফিয়ে সরে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট কয়েক রাউণ্ড গুলি করা হলো বিএমডাব্লিউ থেকে; ওই লোকগুলোর চিৎকার আরও বাড়ল।

একটা জাংশন এগিয়ে আসছে। স্টিয়ারিং-এ তীক্ষ্ণ মোচড় দিল রানা, রাস্তার সঙ্গে ঘষা খেয়ে বিশ্রী আওয়াজ তুলল ওর গাড়ির টায়ার। হুট করে সামনে হাজির হয়ে গিয়েছিল একটা ট্রাক, সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য স্টিয়ারিং-এ মোচড় দিল ওটার ড্রাইভারও। কিন্তু রানার গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পারলেও রাস্তার একধারে পার্ক-করে-রাখা একটা ফিয়াটকে এড়াতে পারল না ড্রাইভার। ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে ছিটকে গিয়ে বিএমডাব্লিউর সামনে হাজির হলো ফিয়াট। স্টিয়ারিং-এ মোচড় দিতে গেলে পথচারীদের ওপর গাড়ি তুলে দিতে হবে, তাই যেভাবে চালাচ্ছিল সেভাবেই চালিয়ে গেল বিএমডাব্লিউর ড্রাইভার। শক্তিশালী গাড়িটার গুঁতো খেয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে গেল ফিয়াট, বাড়ি খেল একটা বাড়ির দেয়ালে।

ফিয়াটের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে কিছুটা হলেও ক্ষতি হয়েছে বিএমডাব্লিউর, গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে ওটার ড্রাইভার। সুযোগটা নিল রানা। গতি বাড়িয়ে চলে এল গ্রামের বাইরে। কাঁচা মাটির আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা ধরে ছুটছে এখন, দু'পাশে গাছের সারি। রিয়ারভিউমিররে তাকাল। বেশিদূরে নেই বিএমডাব্লিউ। ওটার দিকে তাকাতে গিয়ে

রাস্তার একটা গর্ত নজর এড়িয়ে গেল ওর। গাড়ির একদিকের চাকা পড়ল ওই গর্তে, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। সেলেনার মনে হলো, ওর পাকস্থলী এখনই বেরিয়ে আসবে নাক-মুখ দিয়ে।

নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিল মেয়েটা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। গর্তটা এড়াতে পারেনি বিএমডাব্লিউর ড্রাইভারও। একগাদা ধুলো ছিটকে উঠেছে গর্তের সামনে, অদৃশ্য হয়ে গেছে নীল গাড়ির সামনের অংশ।

সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক, স্টিয়ারিং-এ মোচড় দিতে বাধ্য হলো রানা। যা আশা করেনি তা-ই ঘটল এমন সময়—হঠাৎ সামনে হাজির হয়ে গেল একটা চলন্ত ট্রাক্টর। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য স্টিয়ারিং-এ আরেকবার মোচড় দিতে হলো রানাকে। কিন্তু ওর গাড়ির গুঁতোয় জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেল তক্তা দিয়ে বানানো একটা ফার্মহাউসের সীমানাপ্রাচীর।

উঁচুনিচু জমিনের ওপর দিয়ে ছুটছে রানার গাড়ি এখন, সমানে ঝাঁকুনি লাগছে। গতি সামলাতে গিয়ে এগিয়ে-আসা ঢালটা নজরে পড়ল না রানার। বেশ খানিকটা উড়ে গিয়ে ওই ঢালের নিচের দিকে আছড়ে পড়ল ও গাড়িসহ। নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। সমানে ধোঁয়া বের হচ্ছে রেডিয়েটর থেকে।

রানা বুঝতে পারছে, গাড়িটা নতুন করে চালু করার চেষ্টা এখন বিফল হবে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ও, মাথা নিচু করে রেখেছে। সেলেনার দিকে তাকাল একনজর। পতনের ধাক্কা এখনও সামলাতে পারেনি মেয়েটা, কেমন মাতালের মতো টলছে বসে বসেই।

রানার গাড়িটাকে উড়ে গিয়ে ঢালে পড়তে দেখেছে বিএমডাব্লিউর ড্রাইভার, তাকিয়ে ছিল সেদিকেই। রাস্তার একদিকের বড় গর্তটা ওর নজর এড়িয়ে গেল তাই। শেষমুহূর্তে খেয়াল করল সে গর্তটা, জোরে ব্রেক কষল। কিন্তু কিছুতেই গর্তে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারল না গাড়িটাকে।

একদিকে কাত হয়ে গেল গাড়ি, ওভাবেই থাকল কিছুক্ষণ। তারপর উল্টে গেল। জানালার কাচ নামিয়ে আঁচড়েপাছড়ে কোনওরকমে বেরিয়ে এল ওটার চার আরোহী।

কী ঘটবে এখন অনুমান করে নিয়েছে রানা, তাই খুলে দিয়েছে ড্রাইভিং সিটের সঙ্গের দরজা। খুলেছে ওটার ঠিক পেছনের দরজাটাও। ড্রাইভিং সিট আর তার পাশের সিটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলেছে সেলেনাকে। ওর কথামতো কাজ করেছে মেয়েটা।

বিএমডাব্লিউর ভেতর থেকে বেরিয়ে-আসা মোটা এক লোক গুলি শুরু করল সবার আগে। জায়গায় জায়গায় চলটা উঠে গেল রানার গাড়ির। খুলে-দেয়া দরজা দুটোয় বিদ্ধ হলো বেশ কয়েকটা বুলেট।

ওয়ালথার দিয়ে জবাব দিল রানা দু'বার। মোটা লোকটার কপাল ফুটো করে বেরিয়ে গেল ওর একটা বুলেট। শত্রুপক্ষের বাকি তিনজন আড়াল নেয়া ছাড়া উপায় দেখতে পেল না। দু'জন পজিশন নিল নীল গাড়িটার পেছনে, অন্যজন ছুটে যাচ্ছে একটা বোল্ডারের উদ্দেশে।

রানা আগেই অনুমান করেছিল, শত্রুপক্ষ সুযোগ পেলেই ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে ওদেরকে। তাই প্যারিস ছাড়ার আগেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে ও।

নিচু গলায় সেলেনাকে বলল, 'পেছনের সিটে একটা ব্যাগ রেখেছিলাম। ওটা বোধহয় গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছে। চেষ্টা করে দেখো তো, ব্যাগটা দিতে পারো কি না আমাকে।'

ড্রাইভিং সিট আর সেটার পাশের সিটের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল সেলেনা। ব্যাগটা তুলে আনার চেষ্টা করছে।

বিএমডাব্লিউর আড়ালে পজিশন নেয়া লোক দু'জন গুলি শুরু করল এমন সময়। রানাই ওদের টার্গেট। খুলে দেয়া

দরজা দুটোর কাচ চুরমার করে দিল প্রথম কয়েকটা বুলেট। পরের বেশ কয়েকটা বুলেট বিদ্ধ হলো খুলে-দেয়া দরজা দুটোয়।

ওই লোক দু'জন যখন রিলোডিং-এ ব্যস্ত, তখন সেলেনার বাড়িয়ে-দেয়া হাত থেকে ব্যাগটা নিল রানা। দ্রুত খুলল ওটা, ভেতর থেকে বের করল একটা এম-থার্টি থ্রি ফ্র্যাগমেন্টেশন হ্যাণ্ড গ্রেনেড। পিন খুলেই ছুঁড়ে মারল ওটা বিএমডাব্লিউ লক্ষ্য করে।

ওই গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে-থাকা দু'জনের মরণ আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল বিস্ফোরণের আওয়াজের কারণে।

বোল্ডারের আড়ালে পজিশন নিয়েছিল শত্রুপক্ষের চতুর্থ লোকটা। গ্রেনেড বিস্ফোরণে মরতে দেখল সে তার দুই সঙ্গীকে। একটা লোডেড শটগান হাতে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে। রানার গাড়ি লক্ষ্য করে ট্রিগারে টান দিচ্ছে থেকে থেকে।

দ্রুত পজিশন বদল করল রানা। খোলা দরজা দুটোর আড়ালে আড়ালে চলে এল গাড়ির পেছনদিকে। সুবিধামতো জায়গায় পজিশন নিল, গাড়ির মাডগার্ডের ওপর দিয়ে মেলে দিয়েছে ওয়ালথার ধরা হাত। শটগানওয়ালাকে লক্ষ্য করে টান দিচ্ছে ট্রিগারে।

ওকে দেখে ফেলেছে শটগানওয়ালা। নল ঘুরাল সে তার আগ্নেয়াস্ত্রের, চাপ দিল ট্রিগারে। ঠিক তখনই রানার একটা বুলেট গর্ত তৈরি করল লোকটার বুকের একপাশে। শটগান ফেলে দিল লোকটা, আস্তে আস্তে বসে পড়ছে।

শটগানের শেষ গুলিতে রানার গাড়ির বডি থেকে বড়সড়ো একখণ্ড স্টিলের টুকরো আলগা হয়ে ছিটকে এসে গভীর একটা ক্ষত তৈরি করল রানার বাম কাঁধে।

লড়াই শেষ। প্রতিপক্ষের চারজনই মারা পড়েছে। রানা আহত হয়েছে, ওর ভাড়া-করা গাড়িটা পরিণত হয়েছে বাতিল

মালে।

নাম ধরে ডাকল ও সেলেনাকে, বের হতে বলল গাড়ি থেকে।

রানার পাশে হাজির হলো মেয়েটা। রানার ক্ষতস্থান দেখে চমকে উঠল।

'একটা পট্টি বেঁধে দাও,' মেয়েটাকে বলল রানা। 'তারপর এখান থেকে যত জলদি সম্ভব কেটে পড়তে হবে। স্থানীয় পুলিশ হাজির হয়ে যাবে অল্পক্ষণেই।'

মেডিকেল কিট থেকে ব্যাণ্ডেজ, তুলো ও অ্যান্টিবায়োটিক মলম বের করে রানার ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিল সেলেনা। কাজ শেষে বলল, 'এই ব্যাণ্ডেজ কিন্তু তোমার রক্তপাত পুরোপুরি বন্ধ করতে পারবে না, রানা। ব্যাপারটা প্রাণঘাতীও হতে পারে।'

'সে দেখা যাবে। এখন চলো।'

'কোথায়?'

'সেইণ্ট বারনাবাসে।'

'কীভাবে?'

'হাইওয়েতে গিয়ে দাঁড়াবো দু'জন। কোনও ড্রাইভারের মন ভোলানো যায় কি না, সে-চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। দরকার হলে লোকটাকে মোটা বখশিশ দেবো আমি।'

ধুলো আর ডিযেল-ধোঁয়ার একটা মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ভ্যানটা। ড্রাইভারের মন খুব খুশি। কারণ তার পকেটে নগদ এক হাজার ইউরো চলে এসেছে। টাকাটা সে পেয়েছে এক কানাডিয়ান মেয়ে ও তার বয়ফ্রেণ্ডের কাছ থেকে। বয়ফ্রেণ্ড লোকটা কেমন চুপচাপ প্রকৃতির। আহত। অত টাকা খরচ করার একটাই উদ্দেশ্য তাদের—সেইণ্ট বারনাবাস গ্রাম পর্যন্ত পৌছে দিতে হবে তাদেরকে। ঘটনা কী, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করেছিল ড্রাইভারের, কিন্তু চুপ

মেরে গেছে সে। লাভ কী? ওই মেয়ে আর তার বয়ফ্রেণ্ডকে জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে কোনও পানশালায় ঢুকতে পারলে, এবং তারপর গলা পর্যন্ত গিলে বেহুঁশ হতে পারলে আর কী চাই।

সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে পৌঁছাতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল রানা-সেলেনার। দুপুরের সূর্যটা ততক্ষণে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়তে শুরু করেছে। গ্রামটা দেখতে কেমন পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে।

গ্রামের বাইরের একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ভ্যানের ড্রাইভার এখানেই নামিয়ে দিয়ে গেছে ওদেরকে।

রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে রানা। বড় একটা পাথরে ডান কাঁধের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে সামনে। দেখে মনে হচ্ছে, শক্তি বলতে কিছু নেই ওর শরীরে। রক্তপাতের কারণে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দেখা দিয়েছে সেলেনার চোখে। বলল, 'তুমি বরং এখানেই থাকো। আমি খুঁজে দেখি কারও সাহায্য পাওয়া যায় কি না।'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ওর দিকে এগিয়ে এল সেলেনা, একটা হাত বাড়িয়ে কপাল স্পর্শ করল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে রানার শরীর। 'খুঁজলে নিশ্চয়ই কোনও ডাক্তার পাওয়া যাবে এই গ্রামে।'

'ডাক্তারের দরকার নেই,' নিচু গলায় বলল রানা। 'যত জলদি সম্ভব খোঁজ করো ফাদার ম্যাকগিলের।'

রানাকে একা রেখে চলে গেল সেলেনা। একটা ব্যাপার টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল— নিজের অজান্তেই প্রার্থনা করছে সে সর্বশক্তিমানের কাছে, রানার সুস্থতা কামনা করে।

গ্রামের রাস্তা জনমানবহীন। শুধুই মাটি আর খোয়া দিয়ে তৈরি। তুমুল বৃষ্টির ফলে ছোট-বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে রাস্তায়।

যে-ক'টা বাড়ি চোখে পড়ছে, সবগুলোতেই কেমন প্রাচীন-প্রাচীন একটা ভাব। সবগুলোই ধূলিধূসরিত। চারদিকে কেমন একটা অবহেলার ছাপ।

'ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বলল সেলেনা, 'ফাদারকে খুঁজে পেতে সাহায্য করো আমাকে।'

মেয়েটার বুকের ভেতরে একটুখানি রক্ত যেন ছলকে উঠল। ফাদার যদি মারা গিয়ে থাকেন? যদি এই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকেন?

চলার গতি দ্রুত করল সেলেনা। গির্জার উদ্দেশে হাঁটছে।

গ্রামের একপাশে দেখা যাচ্ছে গির্জাটা। ওটার সামনে ছোট একটা কবরস্থান আছে। একপাশে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে পাথরের একটা কটেজ। একটা আউটবিল্ডিংও আছে, ওটার আড়াল থেকে ভেসে আসছে অনেকগুলো মুরগির কক-কক আওয়াজ। বহুল ব্যবহৃত আর ধুলোমাখা একটা গাড়ি পার্ক করে রাখা আছে একধারে।

কাছের অন্য একটা বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। দেখতে শ্রমিকদের মতো লাগছে তাকে। রোদে পুড়ে কাজ করতে করতে কেমন টান-টান হয়ে গেছে তার গায়ের চামড়া, গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করেছে। সেলেনাকে দেখতে পেল লোকটা, চলার গতি ধীর করল।

'মসিয়ে,' বলল সেলেনা, 'এক্সকিউয মি।'

সরু চোখে সেলেনার দিকে তাকাল লোকটা, কৌতূহল দেখা দিয়েছে দৃষ্টিতে। কিন্তু কিছু বলল না। সাহায্য করার, এমনকী সেলেনার সঙ্গে কথা বলারও কোনও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল হঠাৎ, অদৃশ্য হয়ে গেল আরেকটা বাড়ির ভেতরে। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সেলেনার মুখের ওপর।

থতমত খেয়ে গেছে সেলেনা। কী করবে, বুঝতে পারছে না। টের পেল, ওর মতো ভিনদেশি এক মেয়ে, ভ্যানের সিটে

রানার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসার কারণে যার শার্টে রক্তের দাগ ভরে গেছে, তার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহারই করবে এই গ্রামের মানুষ। এখানকার মানুষদের কেউ চাষা, কেউ মজুর; অ্যাডভেঞ্চারের কোনও সুযোগ নেই এদের জীবনে। এসব মানুষের জন্য অ্যাডভেঞ্চার মানে বিপদ। আর বিপদ মানে মৃত্যু।

তবুও পা চালাল সেলেনা, রানার কথা ভাবছে।

'মাদাম?' কোমল একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'আপনার কি সাহায্য লাগবে?'

শব্দের উৎসের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সেলেনা। বয়স্কা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন অনতিদূরে, পরনে কালো পোশাক। কাঁধে জড়িয়ে রেখেছেন একটা শাল। তাঁর ঘাড়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। সেখান থেকে ঝুলছে চেইনে-বাঁধা একটা ক্রুসিফিক্স।

'প্লিয...হ্যাঁ...আপনি হয়তো সাহায্য করতে পারবেন আমাকে,' ফরাসি ভাষায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, ওই ভাষাতেই হড়বড় করে বলল সেলেনা।

একটা ভ্রূ উঁচু করলেন বয়স্কা মহিলাটা।

'ফাদার ম্যাকগিল কি এখনও এই গ্রামে আছেন?'

'হ্যাঁ, আছেন,' মৃদু হাসলেন মহিলা। 'আসুন আমার সঙ্গে। আমি ফাদারের বাড়ি দেখাশোনা করি।'

পাথরের ওই কটেজের কাছে সেলেনাকে নিয়ে গেলেন মহিলা, ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। উঁচু গলায় বললেন, 'ফাদার, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য কেউ এসেছে।'

উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে সেলেনা, এদিকওদিক দেখছে।

কটেজটাও অনেক পুরনো, তারপরও ছিমছাম একটা ভাব আছে। যে-ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সেলেনা, অতি সাধারণ

আসবাবে সাজানো হয়েছে সেটা। একদিকের দেয়ালে ফায়ারপ্লেস আছে, সেটার পাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে লাকড়ি—সন্ধ্যাবেলায় আগুন জ্বালানো হবে হয়তো। পাইন কাঠে বানানো একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে একধারে, সেটার দু'পাশে দুটো কাঠের-চেয়ার। ঘরের আরেক কোনায় পুরনো কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে একটা কাউচ। একদিকের চুনকাম করা দেয়ালের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে আবলুস কাঠের বিশাল এক ক্রুসিফিক্স। সেটার পাশে ঝুলছে পোপের একটা ছবি।

মেঝেতে লাঠি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার লুকাস ম্যাকগিল। এখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়, লাঠি ব্যবহার করেন। ওটাতে ভর দিয়ে থেমে দাঁড়ালেন সেলেনার মুখোমুখি। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মেয়েটার দিকে। 'কী করতে পারি তোমার জন্য?'

কী বলবে, ভেবে পেল না সেলেনা হঠাৎ। 'আমার বন্ধু...অসুস্থ...দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের বাইরে...আপনিই কি ফাদার ম্যাকগিল?'

'হ্যাঁ।'

মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সেলেনা। 'ফাদার, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আসছিলাম আমরা। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমার বন্ধু।'

'গুরুতর ব্যাপার,' মন্তব্য করলেন ফাদার।

'আপনি হয়তো কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বলবেন আমার বন্ধুকে। কিন্তু...সে এই মুহূর্তে যেতে চাইছে না ডাক্তারের কাছে। আপনি কি সাহায্য করবেন?'

'করবো। তোমার বন্ধুর কাছে নিয়ে চলো আমাকে। লাঠি ঠুকে ঠুকে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন ফাদার। এগিয়ে যাচ্ছেন পুরনো ওই গাড়ির দিকে। 'আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে

বলতাম না তোমার বন্ধুকে। কারণ এই গ্রামে এখন কোনও ডাক্তার নেই। ডাক্তারি করার জন্য একজন মাত্র ছিলেন, বছর দুয়েক আগে মারা গেছেন তিনি। তারপর আর কেউ আসেনি। সরকারি কেউ আসতে চায় না সেইন্ট বারনাবাসের মতো অজপাড়াগাঁয়ে। ...গাড়ি চালাতে পারো?'

'হুঁ।'

'তা হলে উঠে বসো ড্রাইভিং সিটে। বয়ে আনার দরকার হতে পারে তোমার বন্ধুকে। সেক্ষেত্রে কাজে লাগবে আমার গাড়িটা।'

রানার কাছে গিয়ে যখন ব্রেক কষল সেলেনা, ততক্ষণে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে ও, পড়ে আছে মাটিতে।

'মাই গড,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন ফাদার, 'ছেলেটা তো সাংঘাতিক অসুস্থ!' লাঠি ঠুকে ঠুকে হাজির হলেন তিনি রানার কাছে, ওর পাশে বসে পড়লেন হাঁটু গেড়ে। রানার একটা হাত ধরলেন। 'শুনতে পাচ্ছ?'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না রানা...বলতে পারল না।

সেলেনার দিকে তাকালেন ফাদার। 'মাদমোয়াযেল, সাহায্য করো আমাকে। তোমার বন্ধুকে ধরাধরি করে তুলতে হবে গাড়িতে।'

রানাকে নিয়ে আসা হলো ফাদারের কটেজে। অতিথিদের জন্য বাড়তি একটা বেডরুম আছে, সেখানে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে।

রানার রক্তে-ভেজা শার্ট খুলে ফেললেন ফাদার। ওর কাঁধের ক্ষতটার দিকে চোখ পড়ামাত্র ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন। ক্ষতস্থানটা ছুঁয়ে দেখলেন তিনি। চামড়া-মাংস চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে ধারালো কিছু-একটা।

বাড়ির দেখাশোনা করেন যে-মহিলা, তাঁকে ডাকলেন

ফাদার। 'গরম পানি, ব্যাণ্ডেজ আর ডিসইনফেকট্যান্ট নিয়ে এসো। ক্ষত শুকানোর জন্য লতাপাতা ছেঁচে যে-রস বানাও তুমি, ওটাও বানিয়ে এনো।'

কাজে লেগে গেলেন মহিলা।

রানার পালস চেক করলেন ফাদার। 'খুব দ্রুত চলছে।'

'ও...ভালো হয়ে যাবে তো?' সেলেনার কণ্ঠে উদ্বেগ, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। উৎকণ্ঠা সামলাতে পারছে না।

ওর দিকে তাকালেন ফাদার। 'জাদুবিদ্যা জানি না আমি, তবে চেষ্টা করবো তোমার বন্ধুর জন্যে। ...মেরি'র...মানে লতাপাতা ছেঁচে রস বানাতে বললাম যাকে...ভেষজ ওষুধ বানানোয় হাত আছে। আশা করছি ক্ষত সেরে যাবে তোমার বন্ধুর।'

'উপকার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, ফাদার।'

'উপকার করা আমার কর্তব্য, বাছা। এবং সেটা করতে আমার ভালো লাগে। অসুস্থ মানুষের উপকার করবো বলেই বাড়তি একটা ঘর বানিয়েছি এখানে। বছর কয়েক আগে অন্য এক অসুস্থ লোককে নিয়ে এসেছিলাম এখানে, চিকিৎসাসেবা দিয়েছিলাম।'

'তার নাম কি হেলমুট ওয়ার্নার?'

ঝট্ করে সেলেনার দিকে তাকালেন ফাদার ম্যাকগিল।

'ঘুমাচ্ছে ছেলেটা,' বললেন ফাদার, রানা যে-ঘরে আছে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। টেনে দিলেন ঘরের দরজা। 'আপাতত বিরক্ত করার দরকার নেই ওকে।'

ইতিমধ্যে গোসল সেরে নিয়েছে সেলেনা। রক্তমাখা কাপড় বদলে মেরি'র দেয়া কাপড় পরেছে।

'নিশ্চয়ই খিদে লেগেছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার। 'চলো, খেতে বসি।'

সাধারণ খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। স্যুপ, রুটি, আর

ফাদারের নিজের আঙুরবাগানের আঙুর থেকে ঘরে-বানানো ওয়াইন।

খাওয়া চলছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। বাড়ির বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। দূরে কোথাও ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর।

খাওয়া হয়ে গেলে টেবিল পরিষ্কার করে ফেললেন মেরি, গুডনাইট জানিয়ে চলে গেলেন নিজের কটেজে।

কাঠের লম্বা একটা পাইপ ধরালেন ফাদার, ফায়ারপ্লেসের ধারে রকিংচেয়ারে গিয়ে বসলেন। কিছু লাকড়ি ফেললেন আগুনে। লালচে গোলাপি আভাটা যাতে উপভোগ করতে পারেন সেজন্য নিভিয়ে দিলেন ঘরের লাইট। নিজের মুখোমুখি একটা আর্মচেয়ার দেখিয়ে সেটাতে বসতে বললেন সেলেনাকে। 'আমার মনে হচ্ছে, শুধু তোমার বন্ধুর চিকিৎসা করানোর জন্য আমার এখানে আসোনি তুমি।'

বসল সেলেনা। রানার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে শুরু করে সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে আসা পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, বলল।

ওর কথা শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ফাদার। একসময় দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'রাত অনেক হয়েছে, তোমাকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি না হয় ওই কাউচেই শুয়ে পড়ো। ওটা দেখতে পুরনো, কিন্তু আরামদায়ক। তোমার জন্য বেডক্লথ এনে রেখেছি আমি।'

'ধন্যবাদ, ফাদার। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, রানার পাশে বসে থাকতে চাই আমি। ঘুম ভাঙলে হয়তো ও...'

উঠলেন ফাদার, এগিয়ে এসে সস্নেহে একটা হাত রাখলেন সেলেনার কাঁধে। 'তুমি আসলেই ওর ভালো বন্ধু।'

চুপ হয়ে গেল সেলেনা। ফাদারের কথাটা কেন যেন আঘাত করেছে ওকে।

'তারপরও তোমার অত কষ্ট করার দরকার নেই,' বলছেন ফাদার। 'আমি বসে থাকবো তোমার বন্ধুর পাশে। তুমি বরং শুয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে নাও।'

শুয়ে পড়ল সেলেনা।

বাইবেল হাতে নিয়ে রানার পাশে গিয়ে বসলেন ফাদার। ওটা খুলে পড়তে শুরু করলেন নিঃশব্দে।

ভোর চারটের দিকে চোখ মেলল রানা। প্রথমেই হাতঘড়ি দেখল, তারপর তাকাল ফাদারের দিকে। 'কোথায় আছি আমি?'

'বন্ধুদের সঙ্গে,' বললেন ফাদার। হাত বুলিয়ে দিলেন রানার কপালে। 'নিরাপদেই আছ তুমি। তোমার জন্য প্রার্থনা করছি আমি।'

আবার ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

চোদ্দ

শুয়ে থেকেই পা নাড়ানোর চেষ্টা করছে রানা।

ঘুম ভেঙেছে আগেই, তারপরও গত কয়েক ঘণ্টা ধরে বিছানায় আছে ও। এত লম্বা সময় ধরে শুয়ে থাকার কারণে ব্যথা হয়ে গেছে পিঠ আর কোমর। টনটন করছে কাঁধের ক্ষতস্থান। ব্যথাটা সহ্য করার জন্য দাঁতে দাঁত চাপতে হচ্ছে ওকে থেকে থেকে। বিছানার একপাশ থেকে ঝুলিয়ে দিল দুই পা, মেঝে স্পর্শ করল। উঠে দাঁড়াল সাবধানে। দেখল, কে

যেন ইতিমধ্যে ধুয়ে ফেলেছে ওর শার্ট। ওটা শুকিয়ে যাওয়ার পর মেলে রাখা হয়েছে একটা চেয়ারে।

ঘরের জানালা খুলে দিয়েছে কেউ। বাইরে তাকালে চোখে পড়ে গ্রামের আরও কয়েকটা বাড়ি। দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওটা ছাড়িয়ে আরও দূরে মাথা তুলে আছে একটা পর্বতসারি, যেন ছুঁতে চাইছে মেঘহীন আকাশটাকে।

বিরক্ত বোধ করছে রানা। ওর এই অবস্থার জন্য মনে মনে দোষারোপ করছে নিজেকেই। পিয়েরে উইনিং-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভুলই করল কি না, ভাবছে। সোহেলকে বলে ছুটিটা বাড়িয়ে না নিলে এ-ক'দিনে হয়তো নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট জুটে যেত। হয়তো...

দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা, মাথা নাড়ল। যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে ভেবে এখন আর লাভ নেই।

নিজেকে এখন একটা বাচ্চা ছেলে বলে মনে হচ্ছে ওর—দুর্বল, অসহায়, ইচ্ছা থাকলেও কিছু করার ক্ষমতা নেই। এখন শুধু বিশ্রাম আর..

কিছুই কি করার নেই?

প্যানাসেলসাসের ডায়েরিটার কথা মনে পড়ে গেল রানার। কয়েকটা দিন যদি শুয়ে-বসেই কাটাতে হয়, ওই ডায়েরি পড়ে শেষ করতে পারলে কাজ কিছুটা হলেও এগোবে।

ব্যাগের ভেতর থেকে ডায়েরিটা বের করল রানা।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা-ই হয়েছে—শিষ্য চ্যালেঞ্জ করেছে গুরুকে। দিনলিপি লিখছি এখন, অথচ আজ ল্যাবরেটরিতে আমাকে যা বলেছে আনসেল, তা যেন বাজছে কানে। ওর চোখ যেন জ্বলছিল তখন, দুই হাত মুঠি পাকিয়ে ফেলেছিল সে।

'কিন্তু, স্যর,' বলেছিল সে, 'আমরা যা করছি তা কি স্বার্থপরের মতো হয়ে যাচ্ছে না?'

'মানে?' ওর কথা বুঝিনি আমি।

'আপনি বলেছেন, এই গুপ্তবিদ্যা নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকারে আসতে পারে। তা হলে এটা গোপন রেখে লাভ কী? আপনি কি আপনার আবিষ্কার দ্বারা নিজেই উপকৃত হতে চাইছেন? একটাবার ভেবেছেন, এই আবিষ্কারের কথা জানাজানি হলে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে?'

'না, আনসেল, আমি স্বার্থপর নই। আমি আসলে সাবধানী। কোনও সন্দেহ নেই, আমার এই গুপ্তবিদ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার এই ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই, এটার কথা জানাজানি হলে বিপদ ঘটতে পারে আমাদের। অনুপযুক্ত কেউ এই বিদ্যা অর্জন করার অধিকার রাখে না।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আনসেল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'তা হলে এত কষ্ট করে লাভটা কী হলো? আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন, স্যর। গুপ্তধনের পেছনে ছুটেছেন সারাটা জীবন, কিন্তু সেটা যখন পেয়ে গেছেন, গোপন রাখতে চাইছেন। অর্থাৎ গুপ্তধন গুপ্তই রয়ে যাচ্ছে। তারচেয়ে বরং আপনার এই বিদ্যা মানুষের উপকারে ব্যবহার করুন।'

'আমি বুড়ো হয়েছি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তুমি কিন্তু এখনও নবীনই। গোয়ার্তুমি করছ—বুঝতে চাইছ না সহজ একটা কথা। মানুষের উপকার করতে চাইছ, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তোমার মতো সরল না। এই গুপ্তবিদ্যার কথা যদি জানাজানি হয়, এটা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে বেশিরভাগ লোক। ভালো উদ্দেশ্যের চেয়ে খারাপ উদ্দেশ্যে বেশি ব্যবহৃত হবে এই বিদ্যা।'

আনসেলের সঙ্গে যখন কথা বলছি, তখন আমাদের পাশের একটা টেবিলে চামড়ার টিউবে ছিল প্রাচীন ওই

পাণ্ডুলিপি; তুলে নিলাম টিউবটা, নাড়লাম নিকোলাসের উদ্দেশে। 'আমাকে এই গুপ্তবিদ্যার উত্তরাধিকারী বলতে পারো। আমার ক্যাথার পূর্বপুরুষরা জানতেন, এই বিদ্যা কতখানি গুরুত্ব বহন করে, এটা গোপন রাখাটা কেন জরুরি। আরও জানতেন, এই বিদ্যা যদি ভুল লোকের হাতে পড়ে, তা হলে কী মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এটা গোপন রাখার জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন তাঁরা।'

'জানি, স্যর, কিন্তু...'

'এই গুপ্তবিদ্যার একটা ক্ষমতা আছে,' আনসেলকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম আমি, 'আর যে-কোনও ক্ষমতাই বিপজ্জনক। কারণ ক্ষমতা মানুষকে কাণ্ডজ্ঞানহীনে পরিণত করে। সে-কারণেই বার বার বলছি, এই গুপ্তবিদ্যা শুধু জানলেই চলবে না তোমার, এটার ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্বশীলও হতে হবে।'

চুপ করে আছে আনসেল। আমার কথা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'তুমি কথা দিয়েছিলে, এই গুপ্তবিদ্যার ব্যাপারে কখনও কিছু বলবে না কাউকে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, যতটা জানানো উচিত ছিল তোমাকে, তারচেয়ে অনেক বেশি জানিয়ে ফেলেছি।'

'মানে?' খেঁকিয়ে উঠল আনসেল। 'আর কিছু শেখাবেন না আমাকে?'

মাথা নাড়লাম। 'দুঃখিত, আনসেল। তোমার বয়স কম, এবং তারচেয়েও বড় কথা, তুমি অপরিণামদর্শী। ইতিমধ্যে যা শিখিয়েছি তোমাকে তা তো আর ছিনিয়ে নিতে পারবো না, কিন্তু আর কিছু শেখাবো না...অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছ।'

কথাটা শোনামাত্র ছুটে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে গেল আনসেল। তবে তার আগেই দেখতে পেয়েছি, পানি টলমল

করছে ওর চোখে।

আমার বুকের ভেতরটা টনটন করছে। টের পাচ্ছি, আনসেলের সঙ্গে আমার শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা পরিণত হয়েছে শত্রুতায়।

কে যেন টোকা দিচ্ছে ঘরের ভেজানো-দরজায়।

তন্ময় হয়ে ডায়েরি পড়ছিল রানা, মুখ তুলে তাকাল।

আরও ফাঁক হয়ে যাচ্ছে পাল্লাটা। চৌকাঠ আর পাল্লার মাঝখানে উদয় হলো সেলেনার চেহারাটা।

'কেমন লাগছে এখন?' জানতে চাইল মেয়েটা, চেহারায় দুশ্চিন্তা। হাতে একটা ট্রে আছে।

ডায়েরি বন্ধ করল রানা। 'ভালো।'

'দেখো,' ট্রে'র দিকে ইঙ্গিত করল সেলেনা, 'তোমার জন্যে বানিয়েছি।'

তাকাল রানা। ট্রে'র ওপর বড় একটা বাটি, ধোঁয়া উড়ছে সেটা থেকে।

'চিকেন স্যুপ?' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সেলেনা। 'গরম থাকতে থাকতেই খেয়ে নাও।'

'ক'দিন অজ্ঞান ছিলাম আমি?'

'দু'দিন।'

'দুইদিন!'

'হুঁ। স্যুপটা খেয়ে নাও, রানা। শক্তি পাবে। তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ।'

কথা আর বাড়াল না রানা, হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিল।

রানা-সেলেনাকে খুঁজছে অ্যাল মার্লো। কাজটা করতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না ওর। যেখান দিয়েই গেছে ওরা, বুলেট, রক্ত আর লাশ রেখে গেছে।

মধ্য ফ্রান্সের এক গ্রামের জনৈক কৃষকের কাছ থেকে জানা গেছে, গ্রাম্য রাস্তায় নাকি গতি-প্রতিযোগিতায় নেমেছিল দুটো গাড়ি। গুলির শব্দও শুনেছে ওই লোক। যেখানে গোলাগুলি হয়েছে সেখানে নিজের লোকদের নিয়ে হাজির হয়েছিল মার্লো। পেয়েছে চারজনের লাশ, বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া দুটো গাড়ি, ফায়ারআর্মস্, আর প্রচুর বুলেটের-খোসা। একটা গাড়ি বিএমডাব্লিউ; দিন দু'-এক আগে চুরি হয়েছিল ওটা—রিপোর্ট আছে পুলিশের কাছে।

অন্য গাড়িটার ভেতর থেকে পাওয়া গেছে সেলেনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট।

সবচেয়ে বড় কথা, বুলেটের-খোসাগুলোর মধ্যে পাওয়া গেছে পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের কিছু খোসা। যেগুলো, নদীতীরে পাওয়া বুলেটের-খোসার নমুনার সঙ্গে হুবহু ম্যাচ করেছে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় গায়েব হয়ে যাওয়ার আগে নিজের নামটা যেন লিখে রেখে গেছে মাসুদ রানা।

ফাদারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা, মাঝ-দুপুরের রোদে হেঁটেচলে বেড়াল কিছুক্ষণ। দূরে দেখতে পাচ্ছে সেলেনাকে। ফাদারের মুরগিগুলোকে খুদ-কুঁড়ো খাওয়াচ্ছে মেয়েটা। রানাকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, মুচকি হাসল। জবাবে হাসল রানাও।

মেরি এক কাপ গরম চা দিয়ে গেলেন রানাকে। কাপটা হাতে নিয়ে বাড়ির একদিকের দেয়ালের আড়ালে চলে এল ও—নিজেকে বাঁচাল খররোদ থেকে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল একখণ্ড পাথরের ওপর। খুলল সঙ্গে আনা প্যানাসেলসাসের ডায়েরিটা।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

আনসেলকে বিশ্বাস করেছিলাম বলে যারপরনাই আফসোস হচ্ছে আমার এখন। নিজেকে বোকার হদ্দ বলে মনে হচ্ছে। এখন আমার একটাই সান্ত্বনা—সেই ক্যাথার আর্টিফ্যাক্ট থেকে যা জানতে পেরেছিলাম, তার সবটুকু জানাইনি আনসেলকে।

ছেলেটাকে নিয়ে যে-ভয় পাচ্ছিলাম, ঠিক তা-ই ঘটেছে গতকাল। এই জীবনে যে-কাজ করিনি কখনও, আনসেলের বেলায় তা-ই করতে হয়েছে—ক'দিন আগে একজন গোয়েন্দা লাগিয়েছি ছেলেটার পেছনে। সে কী করে না-করে, কোথায় যায় না-যায়...সব আমার কাছে রিপোর্ট করবে ওই লোক। গোয়েন্দা নিয়োগ করতে খারাপ লেগেছে আমার, মন থেকে সাড়া পাইনি ওই কাজে, কথাটা লিখতে লজ্জাও বোধ করছি এখন, তারপরও করেছি কাজটা। আমি চাই না, আমার এতদিনের সাধনা কারও হঠকারিতায় নষ্ট হয়ে যাক।

যা-হোক, আনসেলের ব্যাপারে কিছু রিপোর্ট এসেছে আমার কাছে। আপাতত মনে হচ্ছে, কোনও এক গুপ্তসংঘের সদস্য সে। ওই সংঘের কথা আগেও শুনেছি আমি, ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জানি। দার্শনিকতার চর্চা করে ওরা, দুর্বোধ্য কিছু বিদ্যার চর্চা করে বলেও শুনেছি। ওদের প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়েছে আনসেল, তা-ও জানি। সংঘটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজেদের বিদ্যা গোপন রাখার যে-ঐতিহ্য আছে অ্যালকেমিস্টদের মাঝে, তা ভেঙে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া।

আমার সেই গোয়েন্দা বলেছে, প্রতি মাসেই গোপন আলোচনায় মিলিত হয় ওই গুপ্তসংঘের সদস্যরা। স্থানীয় এক বইয়ের দোকানের দোতলায়, ছোট্ট এক ঘরে অনুষ্ঠিত হয় ওদের সেই বৈঠক। আলোচনার মূল বিষয়: আধুনিক বিজ্ঞানে কীভাবে কাজে লাগানো যায় অ্যালকেমির গুপ্তবিদ্যা।

আনসেলের মতো নওজোয়ানের কাছে পৃথিবীটা রঙিন, সে দেখেনি বাস্তব কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে; আমার

আশঙ্কা, এতদিনে ওর মগজ ধোলাই করে দিয়েছে ওই সংঘ।

তবে আমার বড় আশঙ্কা অন্য এক ব্যাপারে।

খবর পেয়েছি, ওই সংঘের মাধ্যমে গুস্তাভ নামের এক লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আনসেলের। ওদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ওরা দু'জনে ইদানীং বিভিন্ন ক্যাফেতে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। গতকাল বিকেলে আমার সেই গোয়েন্দা চুপিসারে ঢুকে পড়েছিল এক রেস্টুরেন্টে—গুস্তাভকে নিয়ে সেখানে আগেই গেছে আনসেল।

ওদের কাছাকাছি এক টেবিলে বসে পড়ে গোয়েন্দা লোকটা, কান পাতে। আনসেলকে তখন গ্লাসের পর গ্লাস শ্যাম্পেন খাওয়াচ্ছে গুস্তাভ—ছেলেটার পেট পাতলা বানাচ্ছে।

'নিজের বিদ্যার ওপর যদি আসলেই বিশ্বাস থাকত প্যানাসেলসাসের,' বলছে গুস্তাভ, 'তোমার মতো প্রতিভাবান ছেলের এগোনোর পথ এভাবে রুদ্ধ করত না।' কথা শেষ করে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল আনসেলের গ্লাস।

'এগোনো মানে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চায় আনসেল।

'আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজের গোপন বিদ্যা ভাগাভাগি করে নাম আর টাকা কামানো।'

'নাম বা টাকা কোনওটার প্রতিই তেমন আগ্রহ নেই আমার। আমি মানুষের উপকার করতে চাই। অথচ প্যানাসেলসাস তা করতে দিতে চান না আমাকে। কেন ও-রকম একগুঁয়েমি করছেন তিনি, বুঝতে পারি না।'

'নিঃস্বার্থ যে-মনোভাব দেখিয়েছ, তার জন্য প্রশংসা করতেই হয় তোমার, আনসেল। ...আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি তোমাকে।'

'কীভাবে?'

'প্রভাবশালী কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিতে পারি তোমাকে।'

'কিন্তু...প্যানাসেলসাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তিনি যা শেখাবেন, তার কিছুই প্রকাশ করবো না কারও কাছে।'

'তোমার অপরিণত প্রতিজ্ঞার চেয়ে মানুষের কল্যাণ কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়?'

'আমি...আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, গুস্তাভ।'

'কেউ যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে, তখন তার কী করা উচিত, জানো?'

'কী?'

'তার মন যা বলে, তা-ই করা উচিত।'

কিছু বলল না আনসেল।

'তুমি একটা মহৎ কাজ করতে চাইছ,' বলে চলল গুস্তাভ, 'সে-কাজে তোমাকে বাধা দেয়ার কোনও অধিকার নেই প্যানাসেলসাসের। পৃথিবীর কারওই নেই।'

তবুও চুপ করে রইল আনসেল।

মুচকি হাসল গুস্তাভ, আবারও কানায় কানায় ভর্তি করে দিল আনসেলের গ্লাস। 'এক লোকের সঙ্গে খাতির আছে আমার। তাঁকে...কল্পনাবিলাসী বলা যেতে পারে। কথাটা বললাম, কারণ মানুষের উপকার করার নিত্যনতুন চিন্তা ঘুরপাক খায় তাঁর মাথায়, কিন্তু উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনার অভাবে কোনওটাই বাস্তবায়ন করতে পারেন না। আনসেল, তোমার কথা তাঁকে বলেছি আমি। সব শুনে তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে মানবজাতির বৈপ্লবিক উপকার করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা পালন করতে পারো একমাত্র তুমি।'

কোনও মন্তব্য করল না আনসেল।

'আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করা উচিত তোমার।'

গ্লাসের সবটুকু মদ পেটে চালান করে দিল আনসেল। দম

নিল লম্বা করে। 'ঠিক আছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার। আমি যা জানি, তার সবটাই বলবো। আমি আসলেই মানবজাতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই।'

হাসল গুস্তাভ। 'কথাটা শুনে ভালো লাগল।'

টেবিলে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকল আনসেল। নিচু কণ্ঠে বলল, 'সবার আগে তোমাকেই বলি। দক্ষিণ ফ্রান্সের পুরনো এক দুর্গের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছেন প্যানাসেলসাস। গোপন দুটো বিদ্যা লেখা আছে ওই পাণ্ডুলিপিতে।'

'পাণ্ডুলিপির লেখা তোমাকে দেখিয়েছেন প্যানাসেলসাস?'

'একটা দেখিয়েছেন। এবং সে-বিদ্যা যে কত শক্তিশালী, নিজচোখে দেখেছি। ব্যাপারটা...এককথায় যদি বলি...অবিশ্বাস্য। ওই বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছি আমি। ওটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, শিখে গেছি। তোমাকে দেখাতেও পারবো।'

'আর দ্বিতীয়টা?'

'ওটা আরও অবিশ্বাস্য। কিন্তু...

'কিন্তু?'

'আমার ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে গুরুশ্রেষ্ঠ প্যানাসেলসাসের। তাই দ্বিতীয় বিদ্যাটা আমাকে শেখাতে চাইছেন না তিনি।'

আনসেলের কাঁধে হাত রাখল গুস্তাভ। 'আমার বিশ্বাস, সময় হলে সবই জানতে পারবে তুমি। ...এক কাজ করো। একদিন সময় করে আমার বাসায় আসো। যে-বিদ্যা শিখেছ বলে দাবি করছ, সেটা দেখিয়ো আমাকে।'

পাথরের ওপর একটানা বসে থাকার কারণে কোমর আর পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে রানার। ডায়েরিটা বন্ধ করে শিরদাঁড়া সোজা করল ও।

গুস্তাভ লোকটা আসলে কে? তাকে ঠিক কী বলেছিল আনসেল? কল্পনাবিলাসী ওই লোকটাই বা কে, যার সঙ্গে আনসেলকে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল গুস্তাভ?

ডায়েরিটা আবার খুলল রানা, শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উল্টাল। কিন্তু আর্দ্রতার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে বাকি সব পৃষ্ঠা, তাই আর কিছু জানা গেল না। অনেকগুলো পৃষ্ঠাও মনে হয় গায়েব হয়ে গেছে ডায়েরি থেকে।

ওটার একেবারে শেষে, চামড়ার কভারের ভেতরে, ভাঁজ করে রাখা আছে একটা পৃষ্ঠা; ওটা বের করল রানা। একনজর দেখেই বুঝল, সম্ভবত এ-ই শেষ, এরপর প্যানাসেলসাস সম্পর্কে আর কিছু জানা যাবে না।

রহস্যময় অন্তর্ধানের আগে নিজের শেষ কথাগুলো বলছেন তিনি:

৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৬

সব হারিয়ে ফেললাম।

আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে। আনসেলের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমাদের এতদিনের সাধনা এখন শত্রুপক্ষের হাতে। যা ঘটেছে, তার জন্য দোষ আমারও আছে—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ক্ষমা করে দেন আমাকে। এখন আমি নিজের জীবন নিয়ে যতটা না চিন্তিত, তারচেয়ে বেশি চিন্তিত আমার গুপ্তবিদ্যা নিয়ে। ওটা কাজে লাগিয়ে শত্রুপক্ষ কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, সেটা চিন্তা করলেও গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

কীভাবে কী করবো তা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি। যত জলদি সম্ভব প্যারিস ছেড়ে চলে যাবো, সঙ্গে নিয়ে যাবো আমার মেয়েকে। এখন এক মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নেই আমার। নিজের বলতে অন্য যা-কিছু ছিল, সব দিয়ে যাচ্ছি সাশা'র জিম্মায়। ওকে বলে দিয়েছি, যদি নিজের ভালো চায়,

সে-ও যেন পালায়।

আর কখনও প্যারিসে ফেরার ইচ্ছা নেই আমার...

প্যানাসেলসাসের দিনলিপি এখানেই সমাপ্ত।

ছেঁড়া পৃষ্ঠাটা জায়গামতো রেখে ডায়েরি বন্ধ করল রানা।

বোঝা যাচ্ছে, আনসেলের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিপর্যয় নেমে এসেছিল প্যানাসেলসাসের জীবনে। ফলে শেষপর্যন্ত আত্মগোপন করতে বাধ্য হন তিনি। গুস্তাভ নামের রহস্যময় লোকটা ছিল নষ্টের গোড়া। সে-ই কি খুন করেছে বা করিয়েছে প্যানাসেলসাসের স্ত্রীকে?

প্যানাসেলসাস ঠিক কোথায় চলে গিয়েছিলেন? প্যারিস ছেড়ে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি ডায়েরিতে, কাজটা কি করতে পেরেছিলেন শেষপর্যন্ত?

'বসতে পারি?'

আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল রানা, তাই চমকে উঠল কিছুটা। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার ম্যাকগিল।

'হ্যালো, ফাদার,' বলল রানা।

ওর মুখোমুখি আরেক খণ্ড পাথরের ওপর বসে পড়লেন ফাদার। 'তোমাকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ। আসলেই সুস্থ বোধ করছি।'

'ভালো। ...একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি তোমার সঙ্গে।'

কিছু বলল না রানা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'সেলেনা বলেছে, হেলমুট ওয়ার্নার নামের এক লোকের সম্বন্ধে জানার জন্য আমার কাছে এসেছ তোমরা।'

'লোকটা এখন কোথায়, জানেন?'

'শুরু থেকে বলি। ওই লোকের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল আমার, জানো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা নিউযপোর্টালে পড়েছি।'

'ওকে প্রথমবার দেখে আমার মনে হয়েছিল, কোনও কারণে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। সারা শরীরে কাটাকুটির দাগ ছিল। ওগুলো দেখে ভেবেছিলাম, শয়তান ভর করেছে লোকটার ওপর।' ক্রস করলেন ফাদার। 'ওর সেবাশুশ্রূষা করেছিলাম আমি।'

'জানি।'

'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় একটা মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে।'

'কোথায় সেটা?'

'বলছি। ...আমি আর ওই আধপাগল লোক ছাড়া আর কেউ জানে না, নিজের গায়ে বিচিত্র নকশা তৈরির কাজে কী ব্যবহার করেছিল সে।'

'কী?'

'একটা ছুরি...বিচিত্র এক খঞ্জর বলতে পারো।' ইঙ্গিতে অনতিদূরের জঙ্গলটা দেখালেন ফাদার। 'ওখানে পেয়েছিলাম লোকটাকে। ছুরিটা যখন বের করল সে, চমকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার ওপর হামলা চালাবে বুঝি।'

'তারপর?'

'সে-রকম কিছু করেনি সে। যা-হোক, হেলমুটকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পর মনে পড়ে গেল, ওর সেই ছুরিটা পড়ে আছে জঙ্গলের ভেতরে। গেলাম সেখানে, খুঁজে পেলাম জিনিসটা।' থামলেন ফাদার, স্মৃতি ঘাঁটছেন। 'ছুরিটা মধ্যযুগীয়, তবে ঠিকমতো সংরক্ষণ করায় নষ্ট হয়নি। দেখতে সাধারণ ক্রুসিফিক্সের মতো। বানানোর সময় মগজ খাটানো হয়েছে। ফলাটা, ইচ্ছা করলে, ভাঁজ করে রাখা যায় ক্রুসিফিক্সের ভেতরে। ওটার গায়ে অদ্ভুত চিহ্ন আর প্রতীক আছে। ফলায় খোদাই করা আছে আরও হাবিজাবি কীসব।'

রানার মনে পড়ে গেল, প্যানাসেলসাসের একটা হারানো-

গোল্ডক্রসের কথা বলেছিলেন লোরঁন। 'ছুরির গায়ে যেসব চিহ্ন আর প্রতীক আছে, নিজের গায়ে সেগুলোর নকশাই কেটেছিল হেলমুট, তা-ই না?'

আশ্চর্য হলেন ফাদার। 'তুমি জানলে কী করে?'

'অনুমান। ...শেষপর্যন্ত কী হলো ছুরিটার? ওটা কি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন?'

'না।'

'কেন?'

'হেলমুটের ঘটনাটার কোনও তদন্ত হয়নি আসলে। নিজের গায়ে কেন ওসব নকশা কেটেছিল সে, সে-ব্যাপারে কেউ কিছু জানতে চায়নি আমার কাছে। পুলিশও টুকটাক কিছু বর্ণনা লিখে নেয়া ছাড়া আর কিছু করেনি। লোকটাকে আসলে পাগল ঠাউরেছে সবাই।'

'তারমানে ছুরিটা এখনও আপনার কাছে আছে?'

'হুঁ। স্বীকার করতে লজ্জা লাগছে...ওটা নিজের সংগ্রহশালায় রেখে দিয়েছি আমি। ধর্মীয় যে-কোনও জিনিসের ওপর আমার দুর্বলতা আছে।'

'ওটা দেখতে পারি?'

মাথা ঝাঁকালেন ফাদার। 'হেলমুটের ঘটনাটা বলে নিই। ওকে ইন্সটিটিউটে নিয়ে যাওয়ার দু'-তিন মাস পর হঠাৎ এক অতিথি এসে হাজির হন আমার এখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে।'

'অপ্রত্যাশিত?'

'হ্যাঁ...তাঁর মত কেউ যে এই অজপাড়াগাঁয়ে, আমার মতো একজন দীনহীনের কাছে আসবেন, তা কল্পনাই করিনি।'

'কে?'

'ভ্যাটিকানের একজন বিশপ...উসবিলিয়ানো মাতিমাসি। হেলমুটের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেককিছু জিজ্ঞেস করেছেন তিনি আমাকে।'

'যেমন?'

'হেলমুটের পাগলামির ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। আমাকে কী কী বলেছে লোকটা, জিজ্ঞেস করেছেন। নিজের শরীরে কী কী নকশা কেটেছিল সে, জানতে চেয়েছেন। তবে...'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা।

'যে-কথাটা বার বার জানতে চেয়েছেন বিশপ তা হলো, হেলমুটকে যখন দেখতে পাই আমি, তখন ওর সঙ্গে কিছু ছিল কি না। ঠিক কীসের কথা জানতে চাইছিলেন বিশপ, তা পরিষ্কার করে বলেননি। আমার মনে হয়, আসলে ছুরিটার কথাই জানতে চাইছিলেন তিনি। ...ঈশ্বরের কাছে আবারও ক্ষমা চাই...ওটার ব্যাপারে কিছুই বলিনি বিশপকে। জিনিসটা আসলে এতই সুন্দর যে, বাচ্চাদের মতো লোভ জেগে উঠেছিল আমার মনে...হাতছাড়া করতে চাইনি।'

'বিশপ আর কী বলেছেন আপনাকে?'

'তেমন কিছু না। তবে...কেমন একটা মরিয়া ভাব ছিল তাঁর আচরণে। সেটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে। কারণ আধপাগল একটা লোকের জন্য অত উতলা হওয়ার কোনও কারণ দেখি না ভ্যাটিকানের একজন বিশপের। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন, হেলমুটের কাছে কোনও কাগজপত্র বা ডকুমেণ্ট ছিল কি না। একবার একটা পাণ্ডুলিপির কথাও বলেছেন।'

'কীসের পাণ্ডুলিপি?' উত্তরটা অনুমান করতে পারছে রানা, তারপরও জিজ্ঞেস করল।

'আমি আসলে বিশপের কথা বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন্ পাণ্ডুলিপি খুঁজছেন তিনি। জবাবে পরিষ্কার করে কিছু বলেননি তিনি। তাঁর ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল, উত্তরটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তাঁর আচরণ অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার কাছে।'

‘হেলমুটের কাছে কি কোনও পাণ্ডুলিপি ছিল?’

‘ছিল। কিন্তু...’

রানার পিঠ ওর অজান্তেই খাড়া হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ফাদার। তারপর বললেন, ‘পুলিশ নিয়ে গেল হেলমুটকে। তখন আমি গেলাম জঙ্গলের ওই জায়গায়, যেখানে পড়ে ছিল ছুরিটা। এদিকওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলাম, পুরনো একটা পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পাতা পড়ে আছে ওখানে—বৃষ্টির পানিতে ভিজে যাচ্ছেতাই অবস্থা। আমার ধারণা, হেলমুটের পরনে যে নোংরা জামা-কাপড় ছিল, সেটার ভেতরে করে কোনওরকমে নিয়ে এসেছিল ওই পাণ্ডুলিপি...অথবা ওটার কয়েকটা পাতা।’

বিড়বিড় করে কী যেন বলল রানা, ঠিক বোঝা গেল না।

‘যা-হোক, তুলবার চেষ্টা করলাম ভেজা কাগজগুলো, মোমের মতো গলে গিয়ে আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল মণ্ডে-পরিণত-হওয়া কাগজ। দু’-একটা পাতা ভালো ছিল, পড়ার চেষ্টা করলাম কী লেখা ছিল। কিন্তু পানিতে ধুয়ে উঠে গিয়েছিল কালি। তাই কিছুই পড়তে পারিনি। শেষে ওগুলো ওখানেই ফেলে রেখে চলে আসি। এতদিনে সব নষ্ট হয়ে গেছে।’

আশার আলো জ্বলে উঠেছিল রানার মনে, নিভে গেল সেটা। হেলমুট যা নিয়ে এসেছিল তা যদি প্যানাসেলসাসের সেই পাণ্ডুলিপি হয়, তা হলে ওটা উদ্ধারের চিন্তা বাদ দিতে হবে।

‘ওই কাগজগুলোর কথাও কাউকে বলিনি আমি,’ বলছেন ফাদার, ‘এমনকী বিশপ মাতিমাসিকেও না। আসলে আমার কেমন যেন ভয় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, তাঁকে যদি বলি ওই পাণ্ডুলিপির কথা, আমার ক্ষতি হতে পারে।’

‘হেলমুট এখন কোথায়? ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফাদার। 'ওর সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব।'

'কেন?'

'লোকটা মরে গেছে।'

হালকা ধাক্কার মতো লাগল রানার বুকে।

'প্রার্থনা করি, ওর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন ঈশ্বর।'

'মরে গেছে?' কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রানা।

'হুঁ। মাস চারেক আগে।'

'কীভাবে?'

'আত্মহত্যা করেছে।'

'আত্মহত্যা?'

'হুঁ। ...যে মেন্টাল ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়েছিল ওকে, তুমি আর সেলেনা কেন দেখা করতে এসেছ আমার সঙ্গে শুনবার পর ফোন করেছিলাম সেখানে। তুমি তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে। তখনই হেলমুটের আত্মহত্যার খবর জানতে পারলাম।'

রানা কিছু বলল না, গম্ভীর হয়ে গেছে।

'এবার একটা ভালো খবর দিই। ফোনে নিজের পরিচয় জানালাম আমি। হেলমুটের দেখাশোনা করেছে অথবা ওর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলেছে—এমন কেউ আছে কি না ইন্সটিটিউটে, জানতে চাইলাম। আমাকে বলা হলো, হেলমুটের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইত না কেউ। সে-ও নিজের কাছে ঘেঁষতে দিতে চাইত না কাউকে...একশ'টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে একটার উত্তর দিত।' থামলেন ফাদার, দম নিলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'কখনও কখনও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত ওর আচরণ। তখন ভাঙচুর শুরু করে দিত সে। অশ্রাব্য গালিগালাজ করত।'

'ভালো খবরটা কী?'

'ওর সঙ্গে মাঝেমধ্যেই দেখা করতে যেত বিদেশি এক মেয়ে। সে মারা যাওয়ার দু'-তিন আগেও নাকি দেখা হয়েছে ওদের, কথা হয়েছে। ওই মেয়ের সঙ্গে যতক্ষণ থাকত হেলমুট, ততক্ষণ পাগলামির কোনও লক্ষণই দেখা যেত না তার মধ্যে...সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবহার করত।'

'হেলমুটের মতো পাগলাটে লোকের সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলত ওই বিদেশি মেয়ে?'

মাথা নাড়লেন ফাদার। 'ওদের আলোচনার বিষয় বুঝতে পারেনি নার্সদের কেউই।'

চুপ করে আছে রানা। ভাবছে, হেলমুট ওয়ার্নার নামের শেষ সূত্রটাও ফসকে বেরিয়ে গেল হাত থেকে।

'নিজের টেলিফোন নম্বর জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি ইন্সটিটিউটে। বলেছিলাম, বিদেশি ওই মেয়ে যদি আবার আসে, ওকে যেন আমার নম্বরটা দিয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়।'

'যোগাযোগ করেছে সে?'

হাসলেন ফাদার। 'করেছে। আজ সকালে।'

আবারও কান খাড়া হয়ে গেল রানার।

'তখনও ঘুম থেকে ওঠোনি তুমি। এমনকী সেলেনাও ঘুমাচ্ছিল।'

'কী বলল মেয়েটা?'

'প্রথমেই নিজের নাম-পরিচয় জানাল।'

'কী নাম ওর?'

'এমা মিরিয়াম। ইটালির নাগরিক। লেখিকা। ইতিহাস নিয়ে গবেষণাও করে। ইটালির একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিল। গবেষণানির্ভর একটা বইয়ের কাজ করার জন্য এক বছরের ছুটি নিয়েছে, চলে এসেছে ফ্রান্সে। এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটা ভিলা ভাড়া নিয়েছে থাকার জন্য।'

‘এমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।’

‘ওর কথা শোনামাত্র তুমি যে দেখা করতে চাইবে, জানতাম। তাই আগ বাড়িয়ে তোমার আর সেলেনার কথা বলেছি ওকে।’

‘সে কী বলল?’

‘তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আপত্তি নেই ওর। আগামীকাল বিকেলে ফ্রি আছে সে, চাইলে যেতে পারো ওই ভিলায়।’

আবারও আশার আলো জ্বলে উঠল রানার মনে। ‘আমরা কি আপনার গাড়িটা ব্যবহার করতে পারি, ফাদার?’

‘কেন নয়?’

উঠে দাঁড়াল রানা। ‘চলুন, ছুরিটা দেখি।’

‘ওটা যে চুরি করেছি আমি, বোলো না সেলেনাকে।’

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ফাদারের কাঁধে হাত রাখল রানা। ‘আপনার গোপন কথা গোপনই থাকবে, ফাদার। তা ছাড়া আপনি তো নন, আপনার ভেতরের ছোট্ট শিশুটা করেছিল কাজটা। ওর কী দোষ?’

মিষ্টি হাসলেন ফাদার।

‘খুবই সুন্দর,’ বলল সেলেনা, ছুরিটা আরেকবার উল্টেপাল্টে দেখে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

ওটা নিল রানা, দেখছে আবারও।

ক্রসটা আঠারো ইঞ্চির মতো লম্বা। ফলাটা যখন ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে, জিনিসটা তখন চমৎকার এক সোনার-ক্রুসিফিক্সের মতো দেখায়। হাতলের একজায়গায় স্বর্ণখচিত একটা সাপের প্রতিকৃতি আছে। সেটার চোখের জায়গায় বসানো হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির পদ্মরাগমণি। স্প্রিংক্যাচ হিসেবে কাজ করছে ওই সাপের-মাথা। অর্থাৎ, মাথায় চাপ দিলেই বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে আসে ইস্পাতের বারো-ইঞ্চি-লম্বা

চকচকে ফলা। ওটা তেমন প্রশস্ত না, তবে সাংঘাতিক ধারালো। আজব কিছু প্রতীক আর চিহ্ন খোদাই করা আছে ফলার জায়গায় জায়গায়।

যে বা যারা বানিয়েছে এই ছুরি, ভাবছে রানা, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে বানিয়েছে। ক্রুসিফিক্স শোভা পায় যাজকদের গলায়, ঈশ্বর আর ধর্মের কথা শোনান তাঁরা মানুষকে; ও-রকম কেউ যদি এই ছুরির মতো অস্ত্র বয়ে বেড়ান, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না ব্যাপারটা। বুদ্ধিটা ভয়ঙ্কর, অথচ প্রয়োজনের সময় দারুণ কাজের।

ওই ছুরি যেন নিঃশব্দে মনে করিয়ে দিচ্ছে রানাকে মধ্যযুগীয় এক কালো অধ্যায়ের কথা। একপক্ষে তখন চার্চের স্বঘোষিত সৈনিকেরা...তারা যাদেরকে শত্রু বলে গণ্য করছে তাদের পিঠে অবলীলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে প্রতিশোধের খঞ্জর। অন্যপক্ষে আছেন সাধারণ যাজকরা...ঘুমানোর সময়ও একটা চোখ খোলা রাখতে হয় যাঁদেরকে, পথেঘাটে চলার সময় যাঁরা বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন কেউ পিছু নিয়েছে কি না। অন্ধকার সেই সময়ে অ্যালকেমি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ...শয়তানি কোনও বিদ্যা; তখন অ্যালকেমিস্ট মানেই একজন জাদুকর, মানে, শয়তানের চেলা। আর যে-কোনও জাদুকরের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড...আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার মাধ্যমে।

ফলাটার দিকে ইঙ্গিত করলেন ফাদার। 'ওই যে...পরস্পরছেদী দুটো বৃত্ত দেখতে পাচ্ছ? ও-রকম একটা প্রতীক আঁকার চেষ্টা করছিল হেলমুট নিজের বুকের মাঝখানে।'

প্রতীকটার দিকে তাকাল রানা। দুটো বৃত্ত...একটা ছেদ করেছে আরেকটাকে, একটা অন্যটার ওপরে অবস্থান করছে। ওপরের বৃত্তটার পরিধি ছুঁয়েছে একটা তারার ছ'টা কোণ। নিচের বৃত্তের পরিধি স্পর্শ-করা তারার চোখা প্রান্তের সংখ্যা পাঁচ—খোদাই করা হয়েছে পেন্টাগ্রামের আকারে।

এই প্রতীকের মানে কী? ভাবছে রানা। এটার কি কোনও মানে আছে আসলেই? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সেলেনার দিকে।

রানার দৃষ্টির মানে বুঝতে সময় লাগল না মেয়েটার। মাথা নাড়ল সে। 'বলতে পারবো না। অ্যালকেমিস্টরা গোপনীয়তার ব্যাপারে এমনই বাড়াবাড়ি করতেন বেশিরভাগ সময়ে। ছুরির ফলায় এমন কোনও ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করা হয়েছে, যা আমার পরিচিত না।'

আর কিছু না বলে ফাদারের বাড়ির বাইরে চলে এল রানা। গিয়ে দাঁড়াল ফাঁকা একটা জায়গায়। পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোন। পিয়েরে উইনিং-এর নম্বরে কল দিয়ে কথা বলল কিছুক্ষণ।

তারপর ফোন করল রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায়। জরুরি নোট নিতে বলল ও-প্রান্তের সহকারীকে। ওই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে বলল ওকে যত জলদি সম্ভব।

পনেরো

এমা মিরিয়ামের ভিলাটা হলুদ গিরিমাটি দিয়ে তৈরি, দেখতে চমৎকার। বড় বড় জানালা আছে সেখানে, দেয়াল বেয়ে গজিয়ে-ওঠা লতাগাছ আছে। সামনের দিকে টানা বারান্দা আছে। সারি সারি টেরাকোটা পাত্রে যেন উপচে পড়ছে বহু বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল। ভিলার ভেতরে-বাইরে সারি করে লাগানো হয়েছে বেশকিছু গাছ, ডালপালা সুন্দর করে ছেঁটে

রাখা হয়েছে। একধারের একটা ফোয়ারা থেকে নিঃশব্দে ছিটকে বের হচ্ছে পানি। আকর্ষণহীন গ্রাম্য পটভূমিতে ওই ভিলা মরূদ্যানের মতো দেখাচ্ছে।

রানা-সেলেনাকে স্বাগত জানানোর জন্য ভিলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এমা। ওর পরনে রেশমের পোশাক, গলায় শোভা পাচ্ছে প্রবাল-পাথরের নেকলেস। চামড়ার রঙ ধবধবে ফর্সা না, আবার রোদেপোড়া বাদামিও না; বরং ও-দুটোর মাঝামাঝি। ওকে সূর্যের আলোয় দেখলে মনে হয়, কেউ যেন মধু মেখেছে গায়ে। ক্লাসিক ইটালিয়ান সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি সে। দক্ষিণ ফ্রান্সের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেমানান মেয়েটা—একদল রুক্ষ মানুষের ভিড়ে ভিনগ্রহের কোনও আগন্তুক যেন।

গাড়ি থেকে নামল রানা-সেলেনা। রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল এমা, আর সেলেনাকে জড়িয়ে ধরল এমন কায়দায় যেন দীর্ঘদিনের পরিচয় ওদের।

'তোমাদের দু'জনকে দেখে খুব ভালো লাগছে,' ইটালিয়ান উচ্চারণের ইংরেজিতে, কোমল কণ্ঠে বলল সে। রানার দিকে তাকাল। 'মিস্টার রানা, আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসে ভালো করেছেন।'

'আমাকে শুধু রানা বললেই চলবে। আর...' আড়চোখে তাকাল সেলেনার দিকে, 'ও আমার স্ত্রী নয়। আমরা আসলে একসঙ্গে কাজ করছি।' সেলেনার পরিচয় জানাল। 'ও একজন প্রথম সারির বায়োলজিস্ট, ডক্টর সেলেনা বার্নহার্ট।'

হাসল এমা। 'সরি। দেখলে যে-কেউ স্বামী-স্ত্রী বলবে তোমাদেরকে। ভেতরে চলো।'

এমার লিভিংরুমের বাতাসে টাটকা ফুলের সুবাস। একধারের একটা কাউচে পাশাপাশি বসল রানা-সেলেনা। কাছের একটা টেবিলে শেরির বোতল আছে, ওটা থেকে দুটো আলাদা গ্লাসে শেরি ঢালল এমা। দুটো করে বরফের টুকরো

দিল, তারপর গ্লাস দুটো দিল সেলেনা ও রানার হাতে। আরেকটা গ্লাস ভর্তি করল নিজের জন্য। বসে পড়ল রানা-সেলেনার মুখোমুখি একটা আর্মচেয়ারে।

'তোমার ইংরেজি উচ্চারণ চমৎকার,' বলল রানা। 'ইটালিয়ান টানটা ধরতে না পারলে যে-কেউ ভাববে, তুমি ইংরেজ।'

'ধন্যবাদ,' প্রশংসায় খুশি হয়েছে এমা। 'ইংল্যাণ্ডে বছর তিনেক কাজ করেছি আমি। আমার শিক্ষকতা পেশার শুরুর দিকে ওখানেই ছিলাম।' মিষ্টি হাসল।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে সেলেনা। লিভিংরুমের একধারে একটা বুকশেল্ফ আছে, ওটার একটা বইয়ে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। '*দ্য ক্যাথার স্টোরি...*' শব্দ করে উচ্চারণ করল বইটার নাম, '*আনকাভারিং আ ফরবিডেন সিক্রেট*...এমা মিরিয়াম।' তাকাল এমার দিকে। 'এখানে আসার আগে ধারণা ছিল না, একজন এক্সপার্টের সঙ্গে দেখা হবে।'

'আমি কোনও এক্সপার্ট নই,' বিনয় করল এমা। 'যেসব বিষয় নিয়ে খুব কম রিসার্চ হয়েছে, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পছন্দ করি।'

'যেমন অ্যালকেমি?' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল এমা। 'হ্যাঁ। পাশাপাশি আছে মধ্যযুগীয় ইতিহাস আর ক্যাথারিযম। এসব নিয়ে গবেষণা করি বলেই পরিচিত হয়েছিলাম হেলমুটের সঙ্গে।'

'ওর ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি আমরা,' বলল রানা।

শেরির গ্লাসে চুমুক দিল এমা। 'ওর আত্মহত্যার খবর শুনে খুব খারাপ লেগেছে। তবে আশ্চর্য হইনি। সাংঘাতিক বিক্ষিপ্ত ছিল ওর মানসিক অবস্থা।'

সেলেনা বলল, 'তুমি নাকি বেশ কয়েকবার মেণ্টাল ইন্সটিটিউটে গিয়ে দেখা করেছিলে হেলমুটের সঙ্গে। ব্যাপারটা ওরা অ্যালাও করল কী করে, ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।'

'ওদেরকে বলেছিলাম, অ্যালকেমি নিয়ে গবেষণা করছি আমি, কারও সাহায্য দরকার। ইন্সটিটিউটের ডাক্তাররা তখন মানা করেননি।'

'লোকটা কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি তোমার সঙ্গে?'

'না। যখন কথা বলতাম ওর সঙ্গে, আমাকে পাহারা দিয়ে রাখত কয়েকজন নার্স।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল এমা, তারপর বলল, 'তোমরা কি জানো, ধারালো কিছু দিয়ে নিজের-গায়ে অ্যালকেমির প্রতীক আঁকার পাগলাটে প্রবণতা ছিল লোকটার?'

মাথা ঝাঁকাল সেলেনা। 'ওসব চিহ্ন দেখিয়েছে সে তোমাকে?'

'হুঁ...একবার। একদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অস্থির হয়ে পড়ে হঠাৎ করেই, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে পরনের শার্ট। নিজের বুকের ওপর আঁকা বিশেষ একটা চিহ্নের গায়ে হাত বোলাচ্ছিল...যেন আদর করছিল।'

'চিহ্নটা কী-রকম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পরস্পরছেদী দুটো বৃত্ত। ওপরের বৃত্তের পরিধি ছুঁয়ে আছে ছ'মাথার একটা তারা, নিচেরটায় পাঁচ মাথার।'

সঙ্গে করে আনা ব্যাগের ভেতর থেকে সোনার ক্রুসিফিক্সটা বের করল রানা। সাপের মাথায় চাপ দিয়ে ফলাটা বের করল। 'এটার মতো?'

ওটা হাতে নিল এমা, চোখ বড় হয়ে গেছে। ছুরিটা উল্টেপাল্টে দেখে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ...অবিকল। এই ছুরিটা কার?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারবো না,' বলল সেলেনা। 'তবে আমাদের ধারণা, হেনরিখ প্যানাসেলসাস নামের এক অ্যালকেমিস্ট ওটার মালিক ছিলেন। প্যানাসেলসাসের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'হুঁ।'

'প্যারিসের এক লোকের কাছে ছিল ওই ছুরি,' বলছে সেলেনা, 'তাঁর কাছ থেকে ওটা চুরি করেছিল্ল হেলমুট। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল এই এলাকায়।'

এমা বলল, 'আমি অ্যান্টিক-বিশেষজ্ঞ নই। তবে এই ছুরি দেখে বুঝতে পারছি, এটা দশ কি এগারো শতকের জিনিস। হেলমুটের মতো একটা লোক এটা চুরি করতে গেল কেন, ভেবে আশ্চর্য লাগছে।'

রানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সেলেনা বলল, 'ওই ব্যাপারে আমাদেরও কোনও ধারণা নেই।'

'এটা বিক্রি করে দুটো পয়সা কামাই করার উদ্দেশ্য ছিল না হেলমুটের নিশ্চয়ই?' বলল এমা। 'যদি তা-ই হতো, ছুরিটা তোমাদের কাছে থাকত না। মেন্টাল ইন্সটিটিউটে কপর্দকহীন অবস্থায় জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে লোকটা। ...এটা পেলে কোথায় তোমরা?'

প্রশ্নটা আশা করছিল রানা। এখানে আসার আগে ফাদার ম্যাকগিলের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, ছুরি পাওয়ার ব্যাপারটা গোপন রাখবে। বলল, 'ওটা যে-কোনওভাবেই হোক পড়ে গিয়েছিল হেলমুটের কাছ থেকে। পরে খুঁজে পাওয়া গেছে। যা-হোক, পরস্পরছেদী বৃত্ত দুটোর মানে কী?'

'জানি না,' বলল এমা। 'তবে এটা বুঝতে পারছি, ওই প্রতীকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বিশেষ কোনও কারণ ছিল হেলমুটের। লোকটা হয়তো পাগল ছিল, কিন্তু বোকা ছিল না। কোনও কোনও বিষয়ে ওর জ্ঞান কত গভীর ছিল, জানলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তোমরা।' কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। 'আমি যদি এই প্রতীকের একটা কপি করে নিই, আপত্তি করবে তোমরা?'

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল রানা।

ট্রেসিং পেপার আর চোখা শিষের একটা পেন্সিল নিয়ে কাজে লেগে গেল এমা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এঁকে

ফেলল ডায়াগ্রামটা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল নিজের ড্রইং-এর দিকে। তারপর বলল, 'নোটবুকের সঙ্গে হুবহু মিলছে না।'

'নোটবুক?' বলল রানা।

'ওহ্...দুঃখিত, ওটার কথা আগেই বলা উচিত ছিল আমার।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর সেলেনা।

'হেলমুট নাকি কী-সব আজব স্বপ্ন দেখত,' বলছে এমা। 'ওর চিকিৎসা করতে সুবিধা হবে ভেবে ইন্সটিটিউটের ডাক্তাররা একটা নোটবুক দেন ওকে, স্বপ্নগুলোর বর্ণনা লিখে রাখতে বলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, ওই নোটবুক পড়লে বোঝা সম্ভব হবে, হেলমুটের মানসিক সমস্যাটা ঠিক কী ধরনের।'

'হেলমুট তার স্বপ্নের বর্ণনা লিখেছিল নোটবুকে?'

'না। বরং, আজব কিছু আঁকিবুঁকি করে আর প্রতীক এঁকে ভরিয়েছে সে ওই নোটবুকের পাতা। অর্থহীন কতগুলো সংখ্যা লিখেছে। আর লিখেছে আজগুবি কিছু কবিতা বা ডায়ালগ। সে আত্মহত্যা করার পর ডাক্তাররা যখন ওই নোটবুক ঘেঁটেছেন, কী বলতে চেয়েছে সে তার কোনও মানেই বের করতে পারেননি।'

আরেকবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সেলেনা।

'যতক্ষণ ওটা নিয়ে মেতে থাকত হেলমুট,' বলছে এমা, 'ধ্বংসাত্মক কোনও কাজ করত না।'

'ওটা এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার কাছে।' একটুখানি হাসল এমা। 'হেলমুট আত্মহত্যা করার পর আমাকে একদিন ডাকলেন ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর। বললেন, "ফালতু" ওই নোটবুক দিয়ে কোনও কাজ নেই তাঁদের, আমি যদি ইচ্ছা করি তা হলে ওটা নিতে পারি। হেলমুটের কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর

খোঁজ পাওয়া যায়নি...তেমন গরজও দেখায়নি ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ, লাশটা দাফন করতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে ওরা। আমি তখন ভেবে দেখলাম, যে-লোক আমার গবেষণায় সাহায্য করেছে, তার কোনও জিনিস...সেটা যতই আজগুবি হোক...হাতে পেলে মন্দ হয় না। ...ওপরতলায় আছে ওটা, নিয়ে আসছি।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় গেল এমা, ফিরে এল মিনিটখানেক পর। হাতে একটা পলিথিন ব্যাগ। 'নোটবুকটা এই ব্যাগের ভেতরে রেখেছি। কারণ ওটা নোংরা করে ফেলেছিল হেলমুট। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল ওটা।' ব্যাগটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর।

ব্যাগের ভেতর থেকে নোটবুক বের করল রানা।

প্রথম দেখায় মনে হয়, জিনিসটা ক্ষয়ে গেছে। কুঁচকে আছে—মানসিক অসুস্থতার কোনও এক মুহূর্তে ওটা হয়তো দলা পাকাতে চেয়েছিল হেলমুট। কেমন খয়েরি-হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। নিজের রক্ত আর পেশাব ওটাতে ভরিয়েছে কি না পাগলাটে লোকটা, কে জানে!

নোটবুকটা খুলল রানা।

প্রথম ত্রিশ-চল্লিশটা পাতা বাদে বাকিগুলো খালি। নিজের রক্ত আঙুলে ভরিয়ে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট দিয়েছে হেলমুট কোনও কোনও পাতায়, কোথাও আবার রক্ত দিয়ে তীরচিহ্ন এঁকেছে। ওসব পাতায় যা লিখেছিল, সেগুলো পড়া যাচ্ছে না।

তবুও লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল রানা। এমা যেমনটা বলেছে ঠিক তা-ই—উদ্ভট কিছু কবিতা বা ডায়ালগ, অর্থহীন কিছু বর্ণ আর সংখ্যা ছাড়া আর তেমন কিছু লেখেনি হেলমুট। কখনও ল্যাটিন, কখনও আবার ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় নোট লিখেছে কোথাও কোথাও।

এসব লেখা নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে, পাগল-ছাগল যা-ই হোক, হেলমুট আসলে শিক্ষিত লোক ছিল। ওর আঁকার

হাতও মন্দ ছিল না। যা এঁকেছে সে, তার কোনও-কোনওটা সাধারণ স্কেচ। কোনওটা আবার ধারাবাহিক স্কেচিং—একের পর এক স্কেচের মাধ্যমে বিশেষ কিছু বোঝাতে চেয়েছে। ইন্টারনেটে অ্যালকেমি নিয়ে যখন ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল রানা, ও-রকম স্কেচ দেখেছিল।

পাতা উল্টাচ্ছে ও। বিশেষ একটা পাতায় এসে থেমে যেতে বাধ্য হলো।

এখানে পরস্পরচ্ছেদী দুটো বৃত্ত এঁকেছে হেলমুট। তবে কোনও বৃত্তের সঙ্গেই তারা আঁকেনি। বরং বৃত্ত দুটো যে-ফাঁকা জায়গায় ছেদ করেছে একটা আরেকটাকে, সেখানে প্রসারিত ডানার আর লম্বা চঞ্চুর কালো একটা পাখি এঁকেছে।

'দাঁড়কাক,' বলল রানা। 'এই প্রতীক আগে কোথাও দেখেছি আমি।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সেলেনা।

'প্যারিসে, নটরডেম ক্যাথেড্রালের সেন্ট্রাল পোর্চে।'

'কিন্তু...ফলায় যে-রকম প্রতীক আছে, সেটা অদলবদল করে নতুন একটা প্রতীক আঁকতে গেল কেন হেলমুট?'

জবাব দিল না রানা।

এমা বলল, 'কে জানে কী ছিল লোকটার মনে!'

'নোটবুকটা দেখতে পারি?' রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেলেনা।

ওর হাতে জিনিসটা দিল রানা, তাকাল এমার দিকে। 'বেশ কয়েকবার দেখা করেছ তুমি হেলমুটের সঙ্গে, এবং প্রায় প্রতিবারই লম্বা সময় ধরে কথা বলেছ। বিশেষ কিছু কি বলেছে সে তোমাকে?'

'প্রশ্নটার জবাবে হ্যাঁ বলতে পারলে ভালো লাগত আমার।'

'মানে?'

'মানে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেনি লোকটা। বকবক

করার জন্য কাউকে দরকার ছিল তার, আমাকে পেয়ে বর্তে গিয়েছিল। বিদ্যে বলতে যা ছিল ওর পেটের ভেতরে সব উগলে দেয়ার চেষ্টা করত। তার বেশি কিছু না। তবে...'

'কী?'

'ইন্সটিটিউটের কাউকেই না জানিয়ে এমন একটা কাজ করেছি, যা হয়তো উচিত হয়নি আমার।'

অপেক্ষা করছে রানা, তাকিয়ে আছে এমার দিকে।

'যখনই দেখা করতে যেতাম হেলমুটের সঙ্গে, কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে একটা মিনি টেপরেকর্ডার নিয়ে যেতাম। ওর সঙ্গে আমার যা-যা কথা হয়েছে, সব রেকর্ড করে রেখেছি।'

'শুনতে পারি?'

'অসুবিধা নেই। কিন্তু আমার মনে হয় না, ওর সেই অর্থহীন বকবকানি কোনও কাজে লাগবে তোমাদের।' আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠল এমা, গিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে, খানিক বাদে ফিরে এল একটা মিনি টেপরেকর্ডার নিয়ে। 'এটার মেমোরি চিপের ধারণক্ষমতা অনেক বেশি, তাই হেলমুটের পুরো বকবকানিই এঁটে গেছে।' চাপ দিল প্লে বাটনে।

হেলমুটের নিচু কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

সেলেনা টের পেল, শীতল একটা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

কিছুক্ষণ শোনার পর রানা বলল, 'এমা, লোকটা কি সবসময়ই জার্মান ভাষায় কথা বলেছে তোমার সঙ্গে?'

'না, সবসময় না। যখন শুধু সংখ্যা উচ্চারণ করত, তখন।'

টেপ রেকর্ডারের ভলিউম বাড়াল রানা।

হেলমুট বলছে, '*এন-যেক্স, ই-ফিয়ের, ই-যেক্স-অন-যোয়ানযি...*'

'সিক্স, ফোর,' বিড়বিড় করছে রানা, 'সিক্স অ্যাণ্ড টোয়েন্টি...'

'আ-এল্‌ফ্‌,' বলছে হেলমুট, 'ই-ফুনযেন...এন-যেক্স, ই-ফিয়ের...'

'শান্ত হও, হেলমুট,' রেকর্ডারের স্পিকারে শোনা গেল এমার কণ্ঠ।

'ইগনে নেতুরা রেনুভাতুরি ইনতেগ্রা...' এবার ল্যাটিন বলছে হেলমুট। *'ইগনে নেতুরা রেনুভাতুরি ইনতেগ্রা...ইগনে নেতুরা রেনুভাতুরি ইনতেগ্রা...'*

'প্রকৃতি আগুন দ্বারা পুনরায় সৃষ্ট,' ল্যাটিন কথাটার মানে জানিয়ে দিল এমা। হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিল রেকর্ডার, মাথা নাড়ছে। 'যখন এসব অর্থহীন বকবকানি পেয়ে বসত হেলমুটকে, তখন কয়েকজন পুরুষ নার্স ঢুকত ওর ঘরে। দু'-তিনজনে শক্ত করে ধরত ওকে। একজন দিত ঘুমের ইনজেকশন।'

'ওর সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছিল তোমার?'

'দিন-তারিখ মনে নেই। তবে এটা মনে আছে, সেদিন খুবই উত্তেজিত আর বিচলিত দেখাচ্ছিল ওকে। সে আত্মহত্যা করার কয়েকদিন আগের ঘটনা এটা।'

সেলেনার হাত থেকে নোটবুকটা নিয়েছে রানা, উল্টাচ্ছে। বিশেষ একটা পাতায় দৃষ্টি আটকে গেল ওর। সে-পাতার একদিকে লেখা আছে:

ইগনে নেতুরা রেনুভাতুরি ইনতেগ্রা...

লেখাটার ঠিক নিচে আঁকা হয়েছে দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ লোককে। অনতিদূরে আগুন লেগেছে অথবা লাগানো হয়েছে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে চারদিক, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন বৃদ্ধ দৃশ্যটা।

রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল সেলেনা, দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের ছবিটা দেখছে।

এমার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার কাছে তা হলে এই নোটবুক আর হেলমুটের রেকর্ডিং ছাড়া অন্যকিছু নেই?'

'না।' ভেতরের ঘরে ফোন বেজে উঠল। 'এক্সকিউয মি,' কল রিসিভ করার জন্য উঠে গেল এমা।

রানার দিকে তাকাল সেলেনা। 'এখানে এসে কী জানতে পারলাম আমরা তা হলে?'

'বিশেষ কিছু না।'

পাশের ঘরে কথা বলছে এমা, শোনা যাচ্ছে ওর উত্তেজিত কণ্ঠ, '...তোমাকে আর যোগাযোগ করতে মানা করেছিলাম, ভিক্টর...না, না, আজ রাতে এখানে আসার কোনও দরকারই নেই তোমার...জবাবদিহি করতে বাধ্য না আমি...অতিথি আছে আমার এখানে...না, আগামীকালও না...'

কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেলেনার। উঠে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

ফোনালাপ শেষ করে ফিরে এল এমা। 'সরি।'

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল এমা। 'তেমন কিছু না।'

'এমা?' ডাকল সেলেনা। 'এটা কী?'

ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে, একদিকের দেয়ালে ঝুলছে কাচের একটা ফ্রেম। ওটার ভেতরে আছে বাদামি পার্চমেন্টের প্রাচীন এক ম্যাপ—দক্ষিণ ফ্রান্সের। পুরনো কিছু শহর আর দুর্গ দেখা যাচ্ছে ম্যাপে। ওটার চার কোনায় পুরনো ল্যাটিন আর মধ্যযুগীয় ফ্রেঞ্চে খুবই উজ্জ্বল রঙে ক্যালিগ্রাফি করেছে সুদক্ষ কেউ।

'এটা যদি আসল হয়ে থাকে,' বলল সেলেনা, 'তা হলে দাম নিশ্চয়ই অনেক।'

হেসে ফেলল এমা। 'এক আমেরিকান লোকের কাছ থেকে পেয়েছি ওই ম্যাপ। তোমার মতো সে-ও ভেবেছিল, জিনিসটা খুব দামি। আসল ভেবে দশ হাজার ডলার দিয়ে কিনেছিল ওটা।'

'তার মানে এটা আসল না?'

'না। ওটার বয়স আর এই ভিলার বয়স প্রায় সমান। জিনিসটা আসলে একটা ফাঁকিবাজি ছাড়া আর কিছু না।'

'তুমি কিনেছ কত দিয়ে?'

'ওটা যে নকল, প্রথমবার দেখেই বলে দিয়েছিলাম আমি। আমেরিকান লোকটা তখন ওটা দিয়ে দেয় আমাকে, বিনিময়ে এক ডলারও চায়নি। নিজের বোকামির প্রমাণ নিজের কাছে রাখতে চাইছিল না সে আসলে।'

ম্যাপটার কাছ থেকে সরে গেল সেলেনা, এগিয়ে যাচ্ছে বেশ চওড়া একটা বুককেসের দিকে। ওটার সামনে গিয়ে থামল, এমার কালেকশন দেখছে। ইতিহাস, প্রত্নবিদ্যা, স্থাপত্য, কলা, বিজ্ঞান...বিভিন্ন বিষয়ে বিশাল সংগ্রহ এমার।

'যদি কোনওদিন সময় নিয়ে আসতে পারি এখানে,' বিড়বিড় করছে সেলেনা, 'তা হলে...'

ওর মনে পড়ে গেল, গাড়িতে ওর পার্সের ভেতরে একটা নোটবুক আছে। তাকাল এমার দিকে। 'তোমার বইয়ের কালেকশন আসলেই ইণ্টারেস্টিং। আমি যদি কয়েকটা বইয়ের নাম লিখে নিতে চাই, আপত্তি করবে?'

হেসে ফেলল এমা। 'অবশ্যই না।'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল সেলেনা।

রানার দিকে এগিয়ে গেল এমা, মিটিমিটি হাসছে। 'একটা জিনিস দেখাতে চাই তোমাকে।' হাত বাড়িয়ে ধরল রানার একটা হাত। 'চলো আমার সঙ্গে।'

হাত ধরাধরি করে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা, হাজির হলো বাগানে। অনতিদূরে পাথুরে একটা পথ এগিয়ে গেছে অনুচ্চ একটা টিলা অভিমুখে। ওখানে গিয়ে দাঁড়াল ওরা দু'জন।

এদিকওদিক তাকিয়ে চমৎকৃত হয়ে গেল রানা। যেন বিশাল কোনও ছবির মতো সামনে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে এক

দৃশ্যপট। মাইলের পর মাইল বিছিয়ে রয়েছে ল্যাঙ্গুডকের পাহাড়শ্রেণী। শেষবিকেলের সোনালি রোদে ঝলমল করছে মেঘশূন্য সুবিস্তৃত আকাশ। পুব দিগন্তে লালচে-নীল একটা আভা তৈরি হয়েছে।

ইশারায় দূরের এক উপত্যকা দেখাল এমা রানাকে। ওখানে কয়েক মাইলের ব্যবধানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুটো দুর্গ দেখা যাচ্ছে।

'ক্যাথারদের দুর্গ,' বলল মেয়েটা। 'ওদের ইতিহাস নিয়েই কাজ করছি এখন। তাই কাজ যখন শুরু করেছি, তখনই ভাবলাম, এমন কোথাও চলে যাই, যেখানে এককালে ঘাঁটি গেড়েছিল ক্যাথাররা।'

'তোমার কাজটা ইন্টারেস্টিং।'

মিষ্টি হাসল এমা। 'পৃথিবীর এই কোনায় এককালে বসতি গড়েছিল ক্যাথাররা। দুর্গব্যবস্থা তৈরি করেছিল ওরা, গড়ে তুলেছিল কয়েকটা গির্জা আর আশ্রম। কিন্তু ধর্মান্ধ কিছু লোক চার্চের দোহাই দিয়ে ধ্বংস করে দেয় ওদেরকে।'

'ঘটনাটা তেরো শতকের, না?'

চমৎকৃত হলো এমা। 'তুমি জানো?'

'অল্পবিস্তর।'

'পৃথিবীর বুক থেকে ও-রকম নৃশংস হত্যার ফলে কত ইতিহাস যে মুছে গেছে, কে জানে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এমা। 'জানো, কোনও কোনও ইতিহাসবিদ মনে করেন, বিরাট এক রহস্য লুকিয়ে আছে এই এলাকায়।'

'কীসের রহস্য?'

'জানি না...প্রাচীন কিছু একটা হবে। তবে এটা জানি, সে-রহস্য ভেদ করতে জ্ঞান আর শক্তি দুটোই দরকার।'

মৃদু বাতাসে উড়ছে এমার খোলা চুল। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

'রানা, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সব কথা বলোনি

তুমি আমাকে। মনে হচ্ছে, কিছু একটা খুঁজছ তুমি। ঠিক বলেছি?'

ইতস্তত করছে রানা, তবে সত্যি বলার সিদ্ধান্ত নিল। 'হ্যাঁ।'

খুশিতে নেচে উঠল এমার পটলচেরা চোখ। 'এবং সেটার সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে অ্যালকেমি ও প্যানাসেলসাসের?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি আসলে একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজছি। আমার ধারণা, ওটা কোথায় আছে তা জানা ছিল হেলমুটের।'

'তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারি আমি, রানা,' কোমল গলায় বলল এমা। 'হয়তো...ওই ব্যাপারে একসঙ্গে কাজ করতে পারি আমরা।'

চট করে কিছু বলল না রানা, তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমার সাহায্য যদি পাই, খুব খুশি হবো।'

পছন্দসই বেশ কয়েকটা বইয়ের নাম টুকে নিল সেলেনা, তারপর বেরিয়ে এল বাগানে। রানাকে খুঁজছে। দূরের একটা ঢালে দেখতে পেল ওকে। এমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ধীর পায়ে এদিকেই আসছে রানা। হাসছে দু'জনই...রানা যতটা না, এমা তারচেয়ে অনেক বেশি। উচ্ছলতার কোনও কমতি নেই এমার হাসিতে। কথা বলছে ওরা দু'জন। বার বার তাকাচ্ছে নিজেদের দিকে। রানা কথা বলছে কম। এমার কথা যেন ফুরোতেই চাইছে না।

কালো হয়ে গেল সেলেনার চেহারা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা-এমার দিকে। অদ্ভুত কোনও আবেগের উপস্থিতি টের পাচ্ছে বুকের ভেতরে। ওটা পরশ্রীকাতরতা নয়...নিখাদ ঈর্ষা। মনে মনে নিজেকে বলল, এমা মেয়েটা সত্যিই অপূর্বসুন্দরী...ওকে এড়িয়ে চলা যে-কোনও পুরুষের পক্ষে

প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

নিজের ওপরই বিরক্ত হলো সেলেনা। এসব কী ভাবছে সে? রানা কার হাত ধরল, কার সঙ্গে হেসে কথা বলল তাতে ওর কী? রানা ওর কে? ও-ই বা কেন রানাকে...

অসহ্য সত্যটা হঠাৎই টের পেয়ে অসাড় হয়ে গেল সেলেনার সারা শরীর। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

ভালোবেসে ফেলেছে সে।

ষোলো

সেইন্ট বারনাবাসের ধূলিধূসরিত রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে রানা। বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর মন। কেবলই মনে হচ্ছে, একটা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে যেন; সে-গলি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু আর এগোতে পারবে না।

যখন ও ফোন করেছিল উইনিংকে, প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপিটা যে নষ্ট হয়ে গেছে, ইচ্ছা করেই বলেনি সে-কথা। ভেবেছিল, এমার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু-না-কিছু জানা যাবে। কিন্তু সে-রকম কিছুই জানা যায়নি।

রানার অস্থির লাগছে অন্য কারণে। ছুটি ফুরিয়ে আসছে, হাতে আছে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপর যে-কোনও সময় ফোন আসবে হেডঅফিস থেকে, হয়তো ফিরে যেতে বলবে বাংলাদেশে।

কেমন যেন চুপ মেরে গেছে শত্রুপক্ষও—সাড়াশব্দ নেই ওদের। অথচ রানা যেন নিজের আশপাশে ওই লোকগুলোর

নিঃশব্দ উপস্থিতি টের পাচ্ছে।

কী করা যায়, ভাবছে রানা। আবার ফোন করবে পিয়েরে উইনিংকে? বলবে, খোঁজ পাওয়া গেছে প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির, তবে ওটা নষ্ট হয়ে গেছে? প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির খোঁজ আদৌ পাবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ ছিল রানার মনে শুরু থেকেই, এখন জানিয়ে দেবে সত্যটা?

কিন্তু তারপর? সেলেনাকে কানাডাগামী কোনও ফ্লাইটে তুলে দিয়ে সুবোধ বালকের মতো বাংলাদেশে ফিরে যাবে রানা?

হ্যাঁ, অনায়াসেই ওসব কাজ করতে পারে ও, কিন্তু পরাজয় মেনে নিতে ইচ্ছা করছে না ওর।

এই কেসে পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় আছে বলেও মনে হচ্ছে না। প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব হয়তো ছিল, কিন্তু যে-গুপ্তবিদ্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি নিজের দিনলিপিতে, সে-রকম কিছু আদৌ লিপিবদ্ধ ছিল কি না ওই পাণ্ডুলিপিতে, সন্দেহ আছে। যদি থাকত, হেলমুট সেটার সুবিধা নিল না কেন? কেন পাগলাটে ওই লোক ও-রকম একটা পাণ্ডুলিপি ওভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দিল?

হাঁটতে হাঁটতে একটা মূর্তির কাছে এসে দাঁড়াল রানা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে ওটা। অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামের একমাত্র বার—ভাঙাচোরা একটা ঘর আর সেটার সামনে একচিলতে টেরেস। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রানা, বারে ঢুকবে কি ঢুকবে না, ভাবছে। এত তেষ্টা পায়নি যে, বারে যেতেই হবে। আবার এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে এভাবে হাঁটতেও ইচ্ছা করছে না।

টেরেসের কাছে হাজির হলো রানা। হাড় জিরজিরে জনাকয়েক বৃদ্ধ বসে আছেন টেরেসে, ডমিনো খেলছেন। রানার উপস্থিতি টের পেয়ে ওর দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকালেন দু'-একজন। তাঁদের উদ্দেশে মাথা নোয়াল রানা। কিন্তু পাল্টা

সম্ভাষণ পাওয়া গেল না কারও কাছ থেকে।

বারে ঢুকে পড়ল রানা। ভেতরে বাসি বিয়ার আর তামাকপোড়া ধোঁয়ার গন্ধে দূষিত হয়ে আছে। এদিকওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অল্প কয়েকটা চেয়ার-টেবিল, বেশিরভাগই খালি। বোঝা গেল, সন্ধ্যার আগে এখানে জমায়েত হয় না গ্রামের কেউ।

মালিক নিজেই বারটেণ্ডারের ভূমিকা পালন করে, তবে এখন অলস ভঙ্গিতে উল্টাচ্ছে একটা পত্রিকার পাতা। তার ঠিক পেছনে, দেয়ালের সঙ্গে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে একটা পোস্টার—পনেরো বছর বয়সী এক ছোকরার নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি।

বার-সংলগ্ন একটা টুলে বসল রানা, উইস্কির অর্ডার দিল। জানে, সেইন্ট বারনাবাসের মতো প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয় উইস্কি হিসেবে যা বিক্রি হয় তা আসলে উইস্কি নামের কলঙ্ক। ওসবে গলা যতটা না ভেজে, তারচেয়ে অনেক বেশি জ্বালাপোড়া করে নাড়িভুঁড়ি। তারপরও...সময় কাটানোর জন্য অপরিচিত একটা বার এবং একগ্লাস নির্জলা উইস্কি নেহাৎ মন্দ নয়।

উইস্কির গ্লাসে ছোট একটা চুমুক দিল ও। বিষ নাকি! টের পেল, ওর গলা বেয়ে নিচে নামছে তরল আগুন। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল গ্লাসের দিকে।

প্যানাসেলসাসের গুপ্তবিদ্যা তা হলে মিথ্যে কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়? ওটা কি শুধুই মিথ? কল্পনাবিলাসী মানুষের নিছক হেঁয়ালি?

প্রশ্নগুলোর জবাব যদি হ্যাঁ হয়, এমাকেও স্বপ্নবিলাসী বলতে হয়। স্বীকার করে নিতে হয়, প্রতিভাবান একজন শিক্ষক ও ইতিহাসবিদ মিথের পেছনে ব্যয় করছে নিজের মূল্যবান সময়। বিজ্ঞানী সেলেনা তার গবেষণায় অ্যালকেমির ফর্মুলা ব্যবহার করে যে-যুগান্তকারী ফল পেয়েছে বলে দাবি

করেছিল, বলতে হবে, সেটাও মিথ্যা, বানোয়াট—যেমনটা বলেছে *দ্য সাইন্স*।

কিন্তু এমা মিরিয়াম অথবা সেলেনা বার্নহার্টের কাউকেই স্বপ্নবিলাসী বা সামান্যতম মিথ্যুক মনে হয়নি রানার।

আরেক চুমুক উইস্কি খেল রানা।

হেলমুট যে-পাণ্ডুলিপি চুরি করেছিল, যদি ধরে নেয়া হয় সেটা নষ্ট হয়নি, তা হলে?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। পাণ্ডুলিপিটা নিজচোখে নষ্ট হতে দেখেছেন ফাদার ম্যাকগিল। তারপরও...আরও একটা সূত্র হয়তো এখনও হাতে আছে—হেলমুটের নোটবুক। ওটা হয়তো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি রানা।

আবারও উইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল রানা। প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা ছিল, একই জিনিস কি থাকতে পারে হেলমুটের নোটবুকে?

কীভাবে সম্ভব সেটা? নোটবুকটা হেলমুটকে দেয়া হয়েছিল মেণ্টাল ইন্সটিটিউটে...সে সেখানে ভর্তি হওয়ার পর। লোকটা কবে কখন ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়েছিল সেটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ নয়...সে তার নোটবুকে কী লিখেছে সেটাই হয়তো...

যদি ধরে নেয়া হয় হেলমুট তার নোটবুকে প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপি কপি করেছে, তা হলে?

চোখ পিটপিট করল রানা, আরও একটা চুমুক দিল গ্লাসে, কিন্তু জ্বলুনি টের পেল না।

হেলমুট হয়তো মুখস্থ করে ফেলেছিল পুরো পাণ্ডুলিপি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কথা থেকে যায়। নোটবুকটা ঘেঁটেছে রানা। ওটার প্রায় পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে আজব কিছু কবিতা আর ডায়ালগ, ফালতু কিছু আঁকিবুঁকি, উদ্ভট জ্যামিতিক নকশা, মাথা খারাপ করে দেয়া অঙ্ক ও সংখ্যা এবং ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চে কিছু মন্তব্য ছাড়া অন্য কিছু লেখেনি হেলমুট। ওই নোটবুক

যদি প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির কপি হয়ে থাকে, নিজের পাণ্ডুলিপিতে নিশ্চয়ই একই জিনিস লেখেননি বা আঁকেননি প্যানাসেলসাস?

আরও কথা আছে। প্যানাসেলসাস যা-ই লিখে থাকুন না কেন নিজের পাণ্ডুলিপিতে, সব হুবহু মনে রাখা কি সম্ভব ছিল হেলমুটের পক্ষে?

হয়তো ছিল। তার কাছে লম্বা একটা সময় ধরে ছিল ওই পাণ্ডুলিপি; ওটা হয়তো এত বেশিবার ঘেঁটেছে সে যে, যা লিখেছিলেন প্যানাসেলসাস সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। গানের প্রতি যাদের গভীর আগ্রহ থাকে, কোনও গান দুয়েকবার শুনলেই সেটার কথা ও সুর ঠোঁটস্থ হয়ে যায় তাদের। হেলমুট বলতে গেলে প্রচণ্ডভাবে মোহাচ্ছন্ন ছিল অ্যালকেমির প্রতি।

তবুও প্রশ্ন রয়ে যায়। মানসিক অসুস্থতার কারণে যে-লোককে ভর্তি করা হয়েছিল মেণ্টাল ইন্সটিটিউটে, তার স্মরণশক্তি কি নির্ভরযোগ্য?

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক...উইস্কির গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে রানা...কিন্তু অসম্ভব না। নিউরোবায়োলজির ভাষায় ও-রকম স্মৃতিশক্তিকে বলা হয় আইড্যাটিক মেমোরি। কেউ কেউ বলে, ফটোগ্রাফিক মেমোরি। ওটা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই কাজ করে...শৈশবে। এবং বেশিরভাগ মানুষ যখন কৈশোরে পা দেয়, ওই বিশেষ স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

তবে কারও কারও বেলায় রয়ে যায় আজীবন।

হেলান দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে রানার মনে পড়ে গেল, টুলে বসে আছে ও। একদিকে একটুখানি কাত হলো, ভর দিল বারে। আরেক চুমুক উইস্কি খেল।

ওর মনে পড়ে যাচ্ছে, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিযঅর্ডার নামের একজাতের মানসিক অসুখের কথা শুনেছিল। যে বা

যারা ওই অসুখে ভোগে, তারা আসলে ভীষণ অন্যমনস্ক থাকে—কোনও কাজ করার পর মনে করতে পারে না সেটা করেছে কি না, তাই আবারও...কখনও কখনও বার বার একই কাজ করে। কাউকে কাউকে দেখা যায় বার বার হাত ধুচ্ছে, কেউ আবার দরজায় তালা লাগিয়ে সেটা ঠিকমতো লাগল কি না তা পরীক্ষা করে বার বার। যে বা যারা আক্রান্ত হয় ওই অসুখে, তারা বুঝতে পারে অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করছে, কিন্তু ওই ব্যাপারে কিছু করার থাকে না তাদের। অথচ, আশ্চর্যের ব্যাপার, অত অন্যমনস্ক মানুষদের কারও কারও স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক প্রখর হয়—কোনওকিছু যদি আটকে যায় তাদের মাথায়, সেটা সহজে ভোলে না।

হেলমুটের ব্যাপারটাও কি তা-ই?

ওসিডি'র প্রকট লক্ষণ ছিল ওই লোকের মধ্যে; *ইগনে নেতুরা রেনুভাতুরি ইনতেগ্রা*'র মতো কথা বার বার বলেছে এবং লিখেছে সে, ওকে একই কাজ বার বার করতে দেখেছে এমা। অথচ...এ-কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট...অ্যালকেমির প্রতীক-চিহ্ন-সংকেত কোনওকিছুই ভোলেনি সে, ভোলেনি ল্যাটিনের মতো কঠিন ভাষাও।

শুধু হেলমুটই নয়, মানসিক বিকারগ্রস্ত এমন কিছু লোকের কথা জানে রানা, যারা গাণিতিক সমীকরণ, দুর্বোধ্য ছবি, এমনকী বিশাল বিশাল টেকনিকাল টেক্সট হুবহু মনে রাখতে পেরেছে। হেঁয়ালি বা রহস্য যা-ই বলা হোক, ওটা প্রকৃতিরই দান।

বিল চুকিয়ে বারের বাইরে চলে এল রানা, কিছুদূর হেঁটে গিয়ে বসল পথের একধারের একটা বেঞ্চে, গাছের ছায়ায়। হেলমুটের ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে ওকে।

হেলমুটের স্বপ্নের বিবরণ লেখার জন্য ওকে নোটবুক দিয়েছিলেন ইন্সটিটিউটের ডাক্তাররা। এটাও একজাতের সাইকোথেরাপি। কিন্তু স্বপ্নের বিবরণের বদলে আজব

কায়দায় নিজের স্মৃতিকথা লিখেছে লোকটা। সে কী করছে, কল্পনাও করতে পারেননি সাইকিয়াট্রিস্টরা। তাঁরাও হয়তো পাগলের কাজ ভেবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন ওসব প্রতীক-চিহ্ন-সংকেত।

কিন্তু হেলমুটের ওই নোটবুক...যা এখন আছে এমার কাছে...যদি প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির কপি না হয়?

সেক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করে নিতেই হবে রানাকে।

কারণ ওর হাতে অন্য আর কোনও ক্লু নেই।

আবারও এমার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল ও।

লেখালেখিতে মন দেয়ার চেষ্টা করছে এমা, কিন্তু পারছে না। নতুন যে-ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কাজ করছে, সেটার প্লট গুছিয়ে নিয়েছে অনেকখানি; এমনকী ভূমিকায় কী লিখবে তা-ও ভাবা হয়ে গেছে, তারপরও কাজ এগোতে পারছে না মনের মতো করে। যা লিখতে চাইছে, সেগুলো আসলে ওর মন থেকে কলমের ডগায় আসছে না ঠিকমতো।

দু'-চারটে লাইন লেখার পরই বিস্মিত হয়ে টের পাচ্ছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বার বার মনে পড়ছে মাসুদ রানার কথা।

কী পুরুষালি সুদর্শন চেহারা লোকটার! কঠোরতা আছে সেখানে, অথচ সামান্যতম অমার্জিত বা অশোভন আচরণ করেনি। অ্যালকেমি নিয়ে গবেষণা করছে না সে, বরং এমন কিছু একটা খুঁজছে যেটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে অ্যালকেমির।

এমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে গেছে যুবক।

কিছু একটা যেন খোঁচাচ্ছে এমাকে। কিন্তু সেটা কী, বুঝতে পারছে না সে। ওর মনে যেন চাপা পড়ে আছে কিছু একটা। সেটা উঠে আসতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। রাইটিং ডেস্কের এককোনায় পড়ে-থাকা নোটবুকটার দিকে তাকাল সে আড়চোখে।

হেলমুটের নোটবুক। ওটাতে হয়তো এমন কিছু আছে,

যা আগে কল্পনাও করেনি এমা। উদ্ভট কিছু প্রতীক-চিহ্ন-সংকেতের আড়ালে হয়তো...

সুইভেল চেয়ারে হেলান দিল এমা, ঘাড় ঘুরাল। জানালার কাচ ভেদ করে তাকাল বাইরে। প্রকৃতিতে মিলিয়ে যাচ্ছে শেষ-গোধূলির ম্লান আলোর রেশটুকু, একটা-দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। অনেক দূরের একটা পর্বতের ওপরের কালচে-নীল আকাশটা কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে। সেদিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলল এমা, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। পিঠ সোজা করে মন দিল কাজে।

ক্যাথোলিকদের টাকা-খাওয়া আট শ' ক্রুসেডার ঘেরাও করে রেখেছে শ' তিনেক ক্যাথারকে। অস্ত্র বলতে প্রায় কিছুই নেই অসহায় ওই লোকদের কাছে। অবরুদ্ধ হয়ে থাকার কারণে ঠিকমতো খাবারও জোগাড় করতে পারছে না তারা...

বেশ কিছুক্ষণ একটানা লেখার পর কলম নামিয়ে রাখল এমা। আজ আর লিখবে না। একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে ওর। খেয়াল করেছে, যেদিন লিখতে মন চায় না, সেদিন বিছানায় শুয়ে এপাশওপাশ করলে ভাবনাগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে মাথায়, প্লট আরেকটু পাকাপোক্ত হয়।

এখন গরম পানিতে গোসল করবে সে, তারপর একটা ড্রিঙ্ক বানাবে। ওটা নিয়ে সোজা চলে যাবে বিছানায়। আগামীকাল সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবে, আশা করছে মনটা তখন একদম ফুরফুরে হয়ে যাবে।

এতই যখন মনে পড়ছে মাসুদ রানাকে, আগামীকাল না হয় ফোন করবে লোকটাকে, আসতে বলবে...

আর ভাবতে চাইল না এমা।

আসলে...এসবের মানে কী? ভাবছে মেয়েটা। সোনার

একটা ক্রুসিফিক্স...একটা ছুরি। সুপরিচিত এক অ্যালকেমিস্ট, হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণে রহস্যময় হয়ে আছেন যিনি পৃথিবীর কাছে...তাঁর পাণ্ডুলিপি। কথিত আছে, ওই লোক নাকি ক্যাথারদের বংশধর। আর সেই ক্যাথারদের নিয়েই, ওদের গুপ্তধন নিয়েই গবেষণা করছে এমা; ওদের সেই মিথ পুঁজি করে চমৎকার কিছু-একটা লিখে ফেলার পরিকল্পনা করেছে। ওর আগে একই কাজ করার চেষ্টা করেছেন আরও কয়েকজন ইতিহাসবিদ, কিন্তু সফল হতে পারেননি তাঁরা। ফলে প্রাচীন এক কিংবদন্তি আজও রহস্য হয়েই আছে পৃথিবীর কাছে।

আজব কোনও অনুভূতি হচ্ছে এমার। এমনটা আগে হয়নি কখনও। কেন হচ্ছে এ-রকম, বুঝতে পারছে না। আপনমনেই হাসল। ও বোধহয় ভয়ানক তৃষ্ণার্ত ছিল, প্রথম সাক্ষাতেই ওকে এলোমেলো করে দিয়ে গেছে মাসুদ রানা। ও-রকম রমণীমোহন কারও সঙ্গে আগে পরিচয় হয়নি এমার।

স্টাডিরুমের দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে, করিডোর ধরে হাঁটছে বেডরুমের উদ্দেশে। বাথরুমে ঢুকল, খুলে দিল বাথটাবের কল। কাপড় ছেড়ে একটা বাথরোব পরল, চুল বাঁধছে। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকাল। ভালোমতো দেখতে পাচ্ছে না নিজেকে—গরমপানির ভাপ লেগে ঘোলা হয়ে গেছে আয়না।

মৃদু একটা আওয়াজ কানে এল এমন সময়।

শক্ত হয়ে গেল এমার শরীর। নিচতলা থেকে এসেছে নাকি শব্দটা?

কল বন্ধ করল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে বাথরুমের দরজার দিকে। কান খাড়া।

কিন্তু আর কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না।

আবার কল খুলল এমা। নিজের অতি-সতর্কতার কারণে বিরক্তি লাগছে নিজের ওপরেই। বাথরোবটা প্রায় খসিয়ে

ফেলেছিল শরীর থেকে, এমন সময় আবার শুনতে পেল অদ্ভুত শব্দটা।

বাথরোবটা ঠিকমতো পরল এমা, বেল্ট বাঁধল। বাথরুমের দরজা খুলে বের হলো, হাজির হলো বেডরুমে। সেখান থেকে ল্যাণ্ডিং-এ। একদিকে একটুখানি কাত হয়ে আছে ওর মাথা, কুঁচকে আছে ভ্রূ।

সবকিছু স্বাভাবিক।

মন মানতে চাইছে না এমার। কিছু একটা অবশ্যই শুনেছে সে...এবং শব্দটা স্বাভাবিক নয়। কাঠের একটা শোকেস আছে ল্যাণ্ডিং-এ, ওটার ভেতর থেকে ব্রোঞ্জের একটা আনুবিস-মূর্তি বের করে নিল।

নগ্ন পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নামছে মেয়েটা, বাড়ি মারার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রেখেছে শেয়ালমাথার দেবতাকে। নিজের অজান্তেই দ্রুত হয়ে গেছে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি। মূর্তিটা চেপে ধরায় সাদা হয়ে গেছে আঙুলের ডগা।

সিঁড়ির একটা একটা করে ধাপ নামছে এমা, আর অন্ধকার নিচতলাটা একটু একটু করে উদ্ভাসিত হচ্ছে যেন।

শব্দটা আবারও শুনতে পেল মেয়েটা।

'কে?' চিৎকার করে উঠল এমা, ঘাবড়ে গেছে। টের পেল, চেঁচাতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠেছে।

সদর-দরজায় জোরে টোকা দিল কে যেন।

যেন লাফ দিয়ে উঠল এমার হৃৎপিণ্ড। 'কে?' আবার চেঁচাল।

'এমা?' বাড়ির বাইরে থেকে শোনা গেল একটা পুরুষকণ্ঠ। 'আমি...ভিক্টর।'

হাঁপ ছাড়ল এমা, আকস্মিক অবসাদে ঝুলে পড়ল ওর দুই হাত। তবে আনুবিসের মূর্তিটা ধরে রেখেছে এখনও। নিচতলার লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে একছুটে হাজির হলো সদর-দরজার কাছে, খুলে দিল ওটা। ভেতরে ঢুকতে দিল

ভিক্টরকে।

ভিক্টর ধরে নিয়েছিল, ওকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেবে না এমা। অথবা যদি দেয়ও, তার আগে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হবে তাকে। তাই মেঘ-না-চাইতেই বৃষ্টি আসায় কিছুটা থতমত খেয়ে গেল সে। বিস্ময়ের ঘোর যখন কেটে গেল, টের পেল, ভিলার একতলার হলে দাঁড়িয়ে আছে এমার মুখোমুখি।

এমার হাতের আনুবিসের-মূর্তিটা একনজর দেখল ভিক্টর, বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। 'ওটা দিয়ে কী করছ?'

মূর্তিটার দিকে তাকাল এমা, নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছে। কাছের একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল শেয়ালমাথার দেবতাকে। 'আসলে...ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছি...একাধিকবার।'

আবারও হাসল ভিক্টর। 'এ-রকম পুরনো বাড়িতে ওসব অদ্ভুত আওয়াজ হরহামেশাই শোনা যায়। আমারও মনে হয়েছে, আজব কোনও আওয়াজ শুনেছি, কিন্তু পাত্তা দিইনি। ...তোমার এখানে ইঁদুরের উপদ্রব আছে?'

'জানি না।'

এমাকে আপাদমস্তক দেখল ভিক্টর। 'তুমি...গোসল করছিলে মনে হয়?'

'গোসল করার জন্য বাথরুমে ঢুকেছিলাম। শব্দটা তখনই শুনতে পাই। ...তুমি বরং এক কাজ করো। ড্রিঙ্ক বানিয়ে নাও নিজের জন্য। আমি গোসল সেরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

'ঠিক আছে।'

আবার বাথরুমে ঢোকার সময় এমা টের পেল, মেজাজ বিগড়ে গেছে ওর।

নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করতে চায় না সে ভিক্টরের সঙ্গে। এককালে প্রেমের সম্পর্ক ছিল, বেশ কিছুদিন আগে ব্রেকআপ হয়ে গেছে। আসলে ওই ছাড়াছাড়ির পরই লম্বা ছুটি কাটানোর জন্য ফ্রান্সে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এমা।

ওর ইচ্ছা ছিল, ভিক্টর যতই কাকুতি-মিনতি করুক, ওকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু তুচ্ছ এক কারণে এত বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, ভিক্টর এসেছে বোঝামাত্র...

এমা যে লোকটাকে ঘৃণা করে, তা নয়। যখন প্রেম করত ওরা, তখন ভাল লাগার মতো অনেককিছুই খুঁজে পেয়েছিল সে ওই লোকের মধ্যে। লোকটাকে সে-সময় সুদর্শন মনে হতো ওর। দিলদরিয়া মনে হতো। প্রেমের সম্পর্কে ভাটা পড়েছে আস্তে আস্তে, একসময় ভিক্টরের ওপর থেকে মন উঠে গেছে ওর।

একদিন হঠাৎ করেই এমা টের পায়, ভিক্টরের হাসিঠাট্টা হ্যাংলামি মনে হচ্ছে ওর কাছে। ভিক্টরকে দেখামাত্র বিরক্তি ভর করছে ওর মনে। এমনকী ভিক্টরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সুখ পাচ্ছে না।

এবং একদিন হঠাৎ করেই ইতি ঘটে যায় ওদের দু'জনের দীর্ঘ দুই বছরের প্রেমের।

তারপর, কখনও কখনও, ভিক্টরের জন্য খারাপ লেগেছে এমার। লোকটার হয়তো কোনও দোষ ছিল না। সে হয়তো আজও ভালোবাসে এমাকে। হয়তো...

নিচতলায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ভিক্টর। ওর মনে পড়ে গেল, গাড়িতে শ্যাম্পেন আর ফুল রেখে এসেছে—এমার জন্য নিয়ে এসেছিল। যখন টোকা দিয়েছিল এমার দরজায়, ইচ্ছা করলে তখনই নিয়ে আসতে পারত, কিন্তু ভয়ে আনেনি। এমা দরজা খুলবে কি না, খুললেও ওকে ভেতরে ঢুকতে দেবে কি না, সেসব নিয়ে শঙ্কা ছিল ওর মনে।

ভিক্টরকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে এমা। শুধু তা-ই না, আচরণ দেখে ভিক্টরের মনে হয়েছে, সে আসায় যেন আশ্বস্ত হয়েছে মেয়েটা।

তা হলে কি ওই শ্যাম্পেন আর ফুল নিয়ে আসা যায় এখন?

এমার মন জয় করার একটা চেষ্টা অন্তত করা দরকার।

রান্নাঘরটা কোন্‌দিকে? শ্যাম্পেনের বোতলটা নিয়ে এসে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখবে ভিক্টর। যতক্ষণে গোসল শেষ হবে এমার, ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে শ্যাম্পেন। খেতে ভালো লাগবে।

একগুচ্ছ টাটকা ফুল, বরফশীতল শ্যাম্পেন...এসবেও কি মন গলবে না এমার?

ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল ভিক্টর। অন্যমনস্ক আর কিছুটা উত্তেজিত হয়ে আছে। এগিয়ে যাচ্ছে ওর গাড়ির দিকে।

বাথরুম থেকে বের হলো এমা। তোয়ালে দিয়ে ভালোমতো মুছে ফেলল ভেজা গা। জগিং প্যান্ট আর ব্লাউয পরল। ওর বেডরুমের স্টেরিয়ো সিস্টেমে বাজছে মোৎসার্টের সিম্ফনি। গুনগুন করে সুরটা ভাঁজল কিছুক্ষণ সে। গুনগুন করতে করতেই নামল নিচতলায়। আসলে বিরক্তি চেপে রাখার জন্য সুর ভাঁজছে সে। কীভাবে কথা বলবে ভিক্টরের সঙ্গে, কী বলবে...ইত্যাদি নিয়ে ভাবেনি এখনও। লোকটাকে বিদায় করবে কীভাবে তা-ও বুঝতে পারছে না।

হাঁ হয়ে খুলে আছে সদর-দরজাটা।

ভ্রূ কুঁচকে গেল এমার। এমনটা তো হওয়ার কথা না!

ভিক্টর কি বাইরে কোথাও গেছে? বাগানে হাঁটাহাঁটি করছে নাকি? এই রাতের বেলায়?

'ভিক্টর?' চেঁচিয়ে ডাকল এমা।

সাড়া নেই।

সদর-দরজায় এসে দাঁড়াল এমা।

ওই যে...দেখা যাচ্ছে ভিক্টরকে। ওর গাড়ির একদিকের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে মাথা আর ঘাড়, কিছু একটা বের করে আনার চেষ্টা করছে সম্ভবত।

'কী করো?' আবারও চেঁচাল এমা, পোর্চের সিঁড়ি বেয়ে নামছে। বাগানের ফুলগুলোর সুবাস ধাক্কা মারছে ওর নাকে।

ভিক্টরের হাঁটু বেঁকে আছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, গাড়ির জানালায় ভর দিয়ে আছে সে। নড়ছে না।

'ভিক্টর, তুমি ঠিক আছ?'

মদ খেয়েছে নাকি লোকটা? এমা গোসল সেরে আসতে আসতেই এতখানি গিলে ফেলল যে, মাতাল হয়ে গেল?

ভিক্টরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। একটা হাত বাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিল তার কাঁধে।

আরও ভাঁজ হয়ে গেল ভিক্টরের হাঁটু দুটো, জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ওর ঘাড় আর মাথা। নুড়িবিছানো ড্রাইভওয়েতে আছড়ে পড়ল ওর নিথর শরীর।

চেঁচিয়ে উঠল এমা।

নিস্তব্ধ রাতে সে-চিৎকার অনেক জোরে বাজল ওর নিজেরই কানে।

জবাই করা হয়েছে ভিক্টরকে। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ফাঁক হয়ে আছে ওর গলা। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে পুরো শরীরটা।

পাঁই করে ঘুরল এমা, ছুট লাগিয়েছে ভিলার উদ্দেশে। একদৌড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে, দড়াম করে লাগিয়ে দিল সদর-দরজাটা। দৌড় দিল আবার, হাজির হলো হলওয়েতে। থামল টেলিফোনের সামনে। কাঁপছে। ওই অবস্থাতেই তুলে নিল রিসিভার—ফোন করবে পুলিশ স্টেশনে।

ডায়াল টোন নেই।

আজ বিকেলেও যে-ফোন ভালো ছিল, সেটা এখন ডেড।

হতবিহ্বলের মতো রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে এমা।

অদ্ভুত সেই শব্দটা আবার শুনতে পেল সে এমন সময়, আরও স্পষ্ট, আরও জোরালোভাবে।

যেন ইস্পাতের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে ইস্পাত। ভিলার ভেতর থেকেই আসছে আওয়াজ...খুব সম্ভব লিভিংরুম থেকে।

কেউ একজন ইচ্ছাকৃতভাবে একটা ছুরির ফলা ঘষছে এমার পাখির-খাঁচার শিকের সঙ্গে।

রিসিভার ফেলে দিয়ে ওপরতলায় যাওয়ার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল মেয়েটা। ওর পায়ের তলায় পড়ে ভর্তা হয়ে গেল নরম, গরম আর ভেজা-ভেজা কিছু একটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এমা। তাকাল নিচে।

পাখির খাঁচায় কয়েকটা ক্যানারি পুষত সে, ওগুলোর একটা। পাখিটার পুরো শরীর রক্তাক্ত।

আবারও চেঁচিয়ে উঠল এমা। নিজেকে সংবরণ করতে হাত তুলে চাপা দিল মুখ। মরে গেল চিৎকারটা।

লিভিংরুমের আধখোলা দরজা দিয়ে ভেসে এল ভরাট কিন্তু ফ্যাঁসফেঁসে কোনও পুরুষকণ্ঠের অট্টহাসির আওয়াজ।

লোকটা খেলছে এমাকে নিয়ে, এবং এই খেলার প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছে।

সিঁড়ির গোড়ায় নজর পড়ল এমার। টেবিলের ওপর এখনও রাখা আছে আনুবিসের সেই মূর্তি। ঝট করে নামল সে, কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নিল মূর্তিটা। ভারী পায়ের-আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে...আসছে লোকটা।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল এমা, ছুট লাগিয়েছে সিঁড়ির দিকে। বেডরুমে আছে ওর মোবাইল ফোন। ওটা যদি নিতে পারে, তারপর বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে যদি লক করে দিতে পারে দরজাটা...

দুই কি তিন ধাপ উঠতে পেরেছে কেবল মেয়েটা, এমন

সময় কে যেন পেছন থেকে হ্যাঁচকা এক টান মারল ওর চুল ধরে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এমা সিঁড়ির উপর, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

পেশিবহুল লোকটা যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। চেহারাটা গ্র্যানেটের মতো। চুল ধরে টেনে এমাকে নিজের পায়ের কাছে ফেলল সে। নিচু হয়ে ঝুঁকে গ্লাভস-পরা হাতে প্রচণ্ড একটা থাবড়া মারল ওর নাকেমুখে।

সমানে পা ছুঁড়ছে এমা। একের পর এক লাথি লাগছে লোকটার গায়ে। কিন্তু ওই আঘাতে তার কিছু হচ্ছে বলে মনে হলো না। আবারও ঝুঁকল সে, আঁকড়ে ধরতে চায় এমার চুলের মুঠি। বাঁ কনুইয়ে ভর দিয়ে একটুখানি উঠে বসল এমা, ডান হাতে গায়ের জোরে বাড়ি মারল লোকটাকে আনুবিসের মূর্তি দিয়ে। চোয়ালে লাগল আঘাত, হাড় ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল খট্ করে।

ঘাড় কাত হয়ে গেছে ফ্র্যাযোর। এমার কাছ থেকে সরে গেল কিছুটা দূরে। হাত বুলাচ্ছে চোয়ালে। কেটে গেছে ওই জায়গার চামড়া, রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

অনেক বছর পর নিজের রক্ত দেখল ফ্র্যাযো। হাসল। খেলাধুলা অনেক হয়েছে, আর না। যে-কাজে এসেছে সে এখানে, সেটা সারতে হবে এবার।

এগিয়ে এসে খপ করে ধরল এমার একটা কব্জি, জোরে মুচড়ে দিল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটা, আনুবিসের মূর্তি আপনাআপনি পড়ে গেছে হাত থেকে। ওটা এক লাথি মেরে দূরে পাঠিয়ে দিল ফ্র্যাযো। তারপর ছেড়ে দিল এমার হাত।

হামাগুড়ি দিয়ে দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে মেয়েটা। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ফ্র্যাযো। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল মেয়েটা। ওর পিছু নিল ফ্র্যাযো। সিঁড়ির

শেষমাথায় যখন পৌঁছে গেছে মেয়েটা, তখন আবারও ওর চুলের মুঠি ধরল ফ্র্যাযো; মাথাটা সজোরে ঠুকে দিল রেলিং-এর সঙ্গে। চোখের সামনে হাজার তারা দেখতে পেল মেয়েটা। পড়ে গেল চিৎ হয়ে, রক্তের স্বাদ পাচ্ছে মুখে।

এমার ওপর ঝুঁকে পড়ল ফ্র্যাযো, একটুও তাড়াহুড়ো নেই ভাবভঙ্গিতে। কোমরের খাপ থেকে একটানে বের করল একটা ছোরা। এমার গলায় চেপে ধরল ওটা, কিন্তু এখনই জবাই করার ইচ্ছে নেই। ফলার তীক্ষ্ণ অংশটা দিয়ে মৃদু একটা গুঁতো দিল মেয়েটার গলায়। ওটা আস্তে আস্তে নামাচ্ছে নিচের দিকে—যেন ওটা দিয়ে বিরামহীন চুমু খাচ্ছে এমার বুক থেকে তলপেট পর্যন্ত।

'কী জানতে এসেছিল বিদেশি ওই লোক?' জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাযো।

'কার কথা বলছ? বুঝতে পারছি না।'

ছুরি দিয়ে হালকা একটা পোচ দিল ফ্র্যাযো এমার গালে।

চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। টের পাচ্ছে, রক্ত গড়িয়ে নামছে ওর গাল থেকে গলায়।

'ওই লোকটাকে কী বলেছ তুমি? বলো, নইলে টুকরো টুকরো করে ফেলবো তোমাকে।'

কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল এমা। 'পুরনো একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজছিল লোকটা।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্র্যাযো। ওকে দেয়া তথ্যের সঙ্গে, এমা এইমাত্র যা বলল তা মিলে গেছে। 'কোথায় আছে ওই পাণ্ডুলিপি?'

দ্রুত ভাবছে এমা। বলল, 'ফায়ারপ্লেসের সঙ্গের দেয়ালে কাচের একটা ফ্রেম আছে, ওটার ভেতরে।'

মেয়েটার চোখে চোখে তাকিয়ে আছে ফ্র্যাযো। সত্যি কথা বলছে কি না, ভাবছে। ছুরিটা নামিয়ে রাখল এমার পাশে, পরমুহূর্তেই বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি মারল মেয়েটার

নাকেমুখে।

এমার চোখের সামনে দুলে উঠল গোটা ভিলা।

ওকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাযো, ছুরিটা তুলে নিয়েছে। খাপবন্দি করল ওটা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে হাজির হলো লিভিংরুমে। এদিকওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল ফ্রেমটা। এগিয়ে গিয়ে একটানে আলগা করে ফেলল ওটা দেয়াল থেকে। ম্যাপটা দেখল একনজর, তারপর কাচ ভেঙে বের করে আনল ওটা। কয়েক ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল জিনিসটা।

তারমানে, ভাবছে ফ্র্যাযো, বিদেশি ওই লোকের হাতে "আসল জিনিস" তুলে দেয়নি এমা মিরিয়াম। তারমানে, এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে যখন মাতিমাসির কাছে যাবে সে, তখন ওর ওপর যার-পর-নাই খুশি হবেন তিনি।

এবার মেয়েটাকে জবাই করতে হবে।

মানুষ জবাই করতে খুব ভালো লাগে ওর।

কিন্তু লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে যখন সিঁড়ির কাছে হাজির হলো ফ্র্যাযো, তখন কিছুটা হলেও চমকে উঠতে হলো তাকে।

যেখানে পড়ে ছিল এমা, সেখানে নেই সে।

গায়েব হয়ে গেছে।

সতেরো

আছড়ে-পাছড়ে কোনওরকমে স্টাডিরুমে উঠে এসেছে এমা। নিচতলা থেকে কাচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেল সে। শুনতে পেল, মেঝেতে আছড়ে ফেলা হলো ফ্রেমটা।

গালের কাটা-জায়গা থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে, ভিজে গেছে ওর ব্লাউজের সামনের দিক, চটচট করছে। মাথা ঘুরছে ওর, তারপরও এগিয়ে চলেছে রাইটিং ডেস্কের দিকে। কখন যেন কেটে গেছে ডান হাতের দুটো আঙুল, তাই ডেস্কের ওপর রাখা হেলমুটের-নোটবুকের দিকে যখন বাড়িয়ে দিল কাঁপা কাঁপা হাতটা, কয়েকটা ফোঁটা রক্ত টপটপ করে পড়ল ওর রিসার্চ নোটের ওপর।

পলিথিনের ব্যাগে এখনও প্যাঁচানো আছে নোটবুকটা। ওটা আঁকড়ে ধরল এমা। ব্যথায় অসাড় হয়ে আসতে চাইছে ওর শরীর। টলমল পায়ে রওয়ানা হলো করিডোরের দিকে—ওটা পেরিয়ে ঢুকবে বেডরুমে।

ওপরের দিকে তাকাল ফ্র্যাযো। বেডরুমের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ধীরেসুস্থে। এসব কাজে কখনওই তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতি নয় সে। মদখোর যেমন তারিয়ে তারিয়ে মদ খায়, ফ্র্যাযোও তেমনই রয়ে-সয়ে খুন করে। তা না করলে আর দশজন খুনির সঙ্গে ওর পার্থক্য কী?

সে ভেবেছিল, মেয়েটা লক করে দিয়েছে বেডরুমের দরজা। ভেবেছিল, ওটা বাইরে থেকে ভাঙতে লাথি মারতে হবে ওকে। কিন্তু হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো অথবা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, লক করা হয়নি দরজাটা।

ভেতরে ঢুকল ফ্র্যাযো। বেডরুম খালি। একটু দূরে, ঘরের আরেকদিকে অন্য একটা দরজা দেখা যাচ্ছে—সম্ভবত অ্যাটাচড বাথরুমের। এগিয়ে গিয়ে ওটার হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিল ফ্র্যাযো।

এই দরজা ভেতর থেকে লক করা।

এমার ভিলার ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থামাল রানা।

'দেখো,' দূরে থেমে-থাকা কালো একটা গাড়ির প্রতি রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেলেনা, 'কেউ এসেছে এমার সঙ্গে দেখা করতে। ফোন করে আসা উচিত ছিল আমাদের। মেয়েটা বিরক্ত হতে পারে।'

কিছু বলল না রানা, নামল গাড়ি থেকে। সেলেনা বলার আগেই কালো গাড়িটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওর। আরও একটা কিছু দেখতে পেয়েছে ও, যা এড়িয়ে গেছে মেয়েটার নজর।

কেউ একজন পড়ে আছে ড্রাইভওয়েতে, গাড়িটা আড়াল করে দিয়েছে তাকে। শুধু দেখা যাচ্ছে রক্তাক্ত একটা হাত।

বিপদঘণ্টা বাজছে রানার মনে। রক্তাক্ত হাতওয়ালার পাশে হাজির হলো একদৌড়ে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মরে গেছে মানুষটা। জবাই করা হয়েছে তাকে।

একনজর দেখেই বুঝতে পারছে রানা, অচেনা এই লোককে যে বা যারা খুন করেছে তারা প্রফেশনাল। একহাতের উল্টোপিঠ দিয়ে একটুখানি ছুঁল ও লাশটা। এখনও গরম।

‘কী ব্যাপার, রানা?’ হাজির হয়ে গেছে সেলেনা।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল রানা, দ্রুত এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে, ওকে সরিয়ে নিয়ে এল জোর খাটিয়ে। ‘তোমার দেখার দরকার নেই।’

কিন্তু যা দেখার দেখে ফেলেছে সেলেনা। চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, ওর মুখ চেপে ধরল রানা। নিচু গলায় বলল, ‘বেশিক্ষণ হয়নি খুন করা হয়েছে লোকটাকে। খুনি কাছেপিঠে থাকতে পারে। সে হয়তো গিয়ে ঢুকেছে এমার ভিলায়। ...টুঁ শব্দও করা যাবে না। আমার পেছনে থাকো।’

ড্রাইভওয়ে ধরে দৌড়ে গেলে নুড়িপাথরের কারণে আওয়াজ হতে পারে, তাই বাগানের ঘেসো জমিনের ওপর দিয়ে ছুট লাগাল রানা ভিলার উদ্দেশে। নিঃশব্দে উঠে পড়ল পোর্চে।

সদর-দরজাটা ভেতর থেকে লক-করা।

পোর্চ থেকে নেমে পড়ল ও, ছুটে যাচ্ছে ভিলার এক কোনার দিকে।

ওকে নিঃশব্দে অনুসরণ করছে সেলেনা।

বাথরুমের দরজা আটকে দিয়ে ভেতরে সমানে কাঁপছে এমা। নিখাদ আতঙ্ক ভর করেছে ওর মনে। ফোন করতে গিয়ে মনে পড়ে গেছে, ক্রেডিট নেই ওর মোবাইলে।

ফোনটা ফেলে দিল সে হাত থেকে, কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মনে: নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে চলেছে ও আর কিছুক্ষণের মধ্যে।

জবাই হয়ে মরার আগেই আত্মহত্যা করে ফেলবে নাকি? বাথরুমের জানালা দিয়ে লাফ দেবে? কিন্তু দোতলা থেকে নিচে পড়লে মরার সম্ভাবনা খুব কম, বড় জোর হাত-পা ভাঙতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজ সহজ হয়ে যাবে ওই খুনির।

বিস্ফোরণের মতো একটা বিকট আওয়াজ হলো,

আপাদমস্তক চমকে উঠল এমা। বিশাল লোকটার এক লাথিতেই খুলে হাঁ হয়ে গেছে বাথরুমের দরজা, সজোরে বাড়ি খেয়েছে দেয়ালের সঙ্গে।

এগিয়ে এসে এমাকে প্রচণ্ড এক চড় মারল ফ্র্যাযো। ঝড়ো বাতাসে যেভাবে উড়াল দেয় গাছের ঝরা-পাতা, সেভাবে ছিটকে গেল মেয়েটা, ওর মাথা বাড়ি খেল দেয়ালের সঙ্গে। মেঝেতে পড়ে গেল সে। টের পেল, নড়তে পারছে না।

ওর হাত থেকে পলিথিনের ব্যাগসহ নোটবুকটা কেড়ে নিল ফ্র্যাযো। 'এটা নিশ্চয়ই লুকাতে চাইছিলে আমার কাছ থেকে? বাহ্, তোমার সাহস তো কম নয়!' জ্যাকেটের আরেক পকেটে ব্যাগসহ ঢুকিয়ে রাখল নোটবুকটা। তারপর, কী মনে করে, খুলে ফেলল জ্যাকেট; ঝুলিয়ে রাখল বাথরুমের হুকে। এখন দেখা যাচ্ছে ওর শোল্ডার হোলস্টার। ছোট একটা সেমি অটোমেটিক পিস্তল আছে সেখানে, বাড়তি ক্লিপও আছে।

কিন্তু পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল না সে, কোমরের খাপ থেকে বের করল প্রিয় সেই ছুরিটা।

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোটা আটকানো, কিন্তু লক করা না। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা-সেলেনা। ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে রানার হাতে। ছাইবর্ণ হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। ওকে ইশারায় শান্ত থাকতে বলল রানা, আওয়াজ করতে নিষেধ করল।

লিভিংরুমের কাছে, মেঝের একজায়গায় পড়ে আছে একটা ক্যানারি পাখি—মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। রক্তাক্ত শরীরটা দেখলে মনে হয়, কেউ ইচ্ছা করেই শেষ করে দিতে চেয়েছিল ওটাকে। সাবধানে টপকাল রানা পাখিটা, ওটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেলেনার।

সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে আছে ছোট একটা মূর্তি।

শেয়ালমাথার মিশরীয় দেবতা আনুবিস। ওপরতলা থেকে আলো আসছে। শোনা যাচ্ছে মোৎসার্টের সিম্ফনির মৃদু সুর।

চোয়াল শক্ত হলো রানার। প্রতিবারে তিনটে করে ধাপ টপকে রওয়ানা হলো ও ওপরতলার উদ্দেশে। কোনও আওয়াজ করছে না।

নিঃশব্দেই অফ করল ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ।

চরম সুখ অনুভব করছে ফ্র্যাযো।

প্রথমেই একটা লাথি মেরেছে সে মাটিতে পড়ে থাকা এমাকে, গুটিয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না মেয়েটার—বাধা দেয়ার শক্তি শেষ। এরপর ছুরিটা কাজে লাগিয়ে মেয়েটার ব্লাউযের বোতাম একটা একটা করে কেটেছে। কাজটা করার সময় কয়েকবার চেপে ধরেছে মেয়েটার দুই স্তন—পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছে যৌনাকাঙ্ক্ষা বলে কিছু জাগে কি না ওর ভেতর। না, তলপেটের নিচে আদিম কোনও অনুভূতি নেই।

এমার ব্লাউযটা খুলে ফেলল ফ্র্যাযো। তাকিয়ে আছে মেয়েটার উন্মুক্ত স্তনের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ অংশটা রাখল মেয়েটার দুই স্তনের শীর্ষে, হালকা পোচ দিল। চামড়া কেটে গিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত, ছড়িয়ে পড়ল মেয়েটার বুকের ওপর, আস্তে আস্তে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে পিঠের দিকে।

রক্ত...ফ্র্যাযোর মুখের ভেতরে পানি চলে এসেছে...ওর কাছে গড়িয়ে-পড়া রক্ত দেখা নগ্ন যুবতী দেখার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দদায়ক।

হ্যাঁচকা এক ঠেলায় উঁচু করে দিল সে এমার থুতনি, ধরে রাখল ওভাবেই।

এবার মেয়েটাকে জবাই করবে সে।

বাথরুমের দরজায় হাজির হয়ে থমকে দাঁড়াল রানা। একনজর দেখেই বুঝে নিল ভেতরের পরিস্থিতি। ফাঁকা গুলি করল ও। বাথরুমের একদিকের টাইলস চুরমার হয়ে গেল।

ভীষণ চমকে উঠল ফ্র্যাযো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মাত্র একটা মুহূর্ত, তারপরই অবিশ্বাস্য রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখাল সে। সরে গেল এমার একপাশে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, প্রচণ্ড শক্তিতে মুঠি করে ধরেছে মেয়েটার চুল। ওকে হ্যাঁচকা এক টানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিয়ে এল নিজের সামনে।

ব্যথা পেয়ে চিৎকার করে উঠল এমা।

মেয়েটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ফ্র্যাযো। চুল আঁকড়ে ধরে রেখেছে এখনও, ছুরি ধরে রেখেছে গলায়। কিন্তু নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে গোবরাটে দাঁড়ানো রানাকে। এই লোকের নিখুঁত টিপ সম্পর্কে শুনেছে ও।

রানাও দেখছে ফ্র্যাযোকে। দেখছে, দৈত্যাকার ওই লোকের জন্য ঢাল হিসেবে খুব ছোট হয়ে গেছে এমা।

'সরো,' শান্ত গলায় হুমকি দিল ফ্র্যাযো রানাকে, 'আমাকে বেরিয়ে যেতে দাও। নইলে এই মেয়ে মরবে।'

ইচ্ছা করলেই ফ্র্যাযোকে গুলি করতে পারে রানা, এত কম রেঞ্জে এমার কোনও ক্ষতি না করেও বুলেট লাগাতে পারবে ফ্র্যাযোর শরীরে। তারপরও ঝুঁকিটা নিল না ও। ও জানে, লোকটাকে মেরে ফেলা সম্ভব, কিন্তু ওই লোকও মরার আগে শেষ করে দিতে পারে এমাকে।

পিছিয়ে গেল রানা। ওয়ালথার নামায়নি।

এগিয়ে আসছে ফ্র্যাযো। টলমল পায়ে এগোতে বাধ্য হচ্ছে এমাও। মেয়েটাকে নিয়ে বেডরুমে ঢুকল ফ্র্যাযো।

ছুরিটা হাতবদল করল সে, বাঁট ধরল বাঁ হাতে। এমার পিঠের পিছন দিয়ে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে বাড়িয়ে দিল ডান হাত। বের করতে যাচ্ছে ওর বেরেটা পয়েন্ট থ্রি এইট যিরো।

কী করতে যাচ্ছে ওই লোক, বুঝে গেল রানা। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

লোকটা যেহেতু ডানহাতি, বাঁ হাতে ছুরি ধরতে গিয়ে অনভ্যাসের কারণে নিজের কনুই রেখেছে এমার বাঁ কাঁধের ওপর। মেয়েটার কাঁধ ছাড়িয়ে ইঞ্চি দুয়েক উঁচু হয়ে আছে বাঁ কনুইটা।

ওয়ালথারের ট্রিগারে টান দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে টুকরো হয়ে গেল ফ্র্যাযোর বাঁ হাতের রেডিয়াস।

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বীভৎস এক চিৎকার ছাড়ল লোকটা, ছুরিটা আপনাআপনি পড়ে গেছে হাত থেকে। বেরেটা বের করে ফেলেছিল শোল্ডার হোলস্টার থেকে, পড়ে গেল সেটাও।

এমার মাথা ছাড়িয়ে কমপক্ষে এক হাত ওপরে রয়েছে ফ্র্যাযোর মাথা, নিশানা একটুখানি সরিয়ে আবারও গুলি করল রানা। অদৃশ্য হয়ে গেল ফ্র্যাযোর বাঁ কান। আবারও চেঁচিয়ে উঠল সে, পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো এক পা।

বাঁচার শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে চাইল এমা। দৌড় দিল সে রানার দিকে।

গুলি করে ব্যাটাকে খোঁড়া বানিয়ে ফেলার ইচ্ছা ছিল রানার, কিন্তু লাইন-অভ-ফায়ারে চলে এসেছে এমা, টলমল পায়ে দৌড়ে আসছে। ওয়ালথারের ট্রিগারে টান দিতে পারছে না রানা।

সুযোগটা নিল ফ্র্যাযো, ছুট লাগাল খোলা দরজার উদ্দেশে। ওর বিশাল শরীরের রিফ্লেক্স-অ্যাকশন দেখে আরেকবার অবাক হতে হলো রানাকে।

ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমা। ওকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। ডান হাতে প্রস্তুত অবস্থায় আছে ওয়ালথার।

ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে সিঁড়িতে। এমাকে

সরিয়ে দিল রানা, সাবধানে কিন্তু দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়াল বেডরুমের দরজায়। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে।

করিডোরে কেউ নেই।

সিঁড়ির মাথায় হাজির হলো রানা। ওয়ালথারের ট্রিগারে তৈরি ডান হাতের তর্জনী।

নিচতলার কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। চলে গেছে দানব, শুধু ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে সিঁড়িতে।

সদর-দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা। দৌড় দিয়েছে সে, ড্রাইভওয়ের নুড়িপাথরে শোনা যাচ্ছে ওর ভারী পায়ের ছুটন্ত শব্দ। একটু পর শোনা গেল চালু হলো একটা গাড়ির ইঞ্জিন।

লোকটাকে অনুসরণ করবে কি না, ভাবল রানা। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিতে হলো। ফাদার ম্যাকগিলের গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছে ও; কাউকে ধাওয়া করার জন্য মোটেও উপযুক্ত নয় ওটা। তা ছাড়া রানা এখনও জানে না, লোকটার সঙ্গে আরও কেউ আছে কি না...ও যদি ভিলার বাইরে চলে যায়, আহত এমাকে নিয়ে এখানে একা হয়ে যাবে সেলেনা। তা ছাড়া এমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়াটাও খুব জরুরি।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতপায়ে নিচতলায় নামল রানা, আটকে দিল সদর-দরজা আর ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। তারপর দৌড় দিল এমার বেডরুমের উদ্দেশে।

এমা অজ্ঞান হয়ে গেছে সম্ভবত, পড়ে আছে মেঝেতে। ওদিকে সাদা হয়ে গেছে সেলেনার চেহারা। কাঁপছে সে, ওই অবস্থাতেও অন্য একটা ব্লাউয পরিয়ে দিচ্ছে এমাকে। রানার উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। 'ওই ভয়ঙ্কর লোকটা কে?'

মাথা নেড়ে রানা বুঝিয়ে দিল উত্তরটা জানা নেই ওর।

এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এমার পাশে, হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল ওয়ালথার। পালস চেক করল মেয়েটার। ওর ক্ষতস্থানগুলো দেখল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে বাড়িয়ে ধরল সেলেনার দিকে। 'অ্যাম্বুলেন্সে খবর দাও। বোলো, একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এখানে। আর কিছু বলার দরকার নেই ওদেরকে। পুলিশের নামও উচ্চারণ কোরো না। এখানকার কোনওকিছুতে হাত লাগিয়ো না।'

মাথা ঝাঁকাল সেলেনা, মোবাইল হাতে নিয়ে চলে গেল করিডোরে।

উঠে বাথরুমে গেল রানা, একটা টাওয়েল নিয়ে এল। ওটা গোল করে পাকিয়ে কুশনের মতো বানাল, এমার মাথার নিচে দিল সযত্নে। চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা।

'আর কোনও ভয় নেই,' মেয়েটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'অ্যাম্বুলেন্স চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

নড়ে উঠল এমার ঠোঁট...কিছু বলতে চায় সম্ভবত।

'থাক,' ওকে থামিয়ে দিল রানা। টের পাচ্ছে, অসহ্য কোনও আবেগে কাঁপছে ওর বুকের ভেতরটা...গরিলাসদৃশ ওই লোককে খুঁজে বের করে খুন করতে ইচ্ছা করছে।

নিজেকে সামলাল রানা। এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

ছুরি আর বেরেটা পড়ে আছে মেঝেতে। পড়ে আছে ওয়ালথারের দুটো খালি শেল।

বুলেটের খোসাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে ঢোকাল রানা। বেরেটা থাকল যেখানে আছে সেখানেই। তাকাল ছুরিটার দিকে। রক্তের দাগ লেগে আছে ওটার ফলায়। সিদ্ধান্ত নিল, ফাদারের গাড়িতে নিজের যে-ব্যাগ রেখে এসেছে, ওটাতে ঢুকিয়ে নিয়ে যাবে ছুরিটা...কোনও কাজে লাগুক বা না লাগুক।

দৃষ্টি সরাল রানা।

বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভেতরে

একটা হুকে ঝুলছে বড়সড় একখানা কালো জ্যাকেট।

গাছপালার আড়ালে রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে হোটেলটা; উদ্ভাসিত হয়ে আছে ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোয়, যেন সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, থামল সদর-দরজা থেকে কিছুটা দূরে, একটা ট্যুরিং কোচ আর কয়েকটা গাড়ির পেছনে। সেলেনাকে বলল, 'তোমার ব্যাগটা বের করে নাও।'

'হোটেলে নিয়ে এলে কেন?'

'আজ রাতে যা ঘটল, ফাদার ম্যাকগিলের বাড়িতে ফিরে যেতে পারি না আমরা আর।'

'ফাদার হয়তো দুশ্চিন্তা করবেন।'

'তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেব আমি। গাড়িটা কোথায় আছে, সেটাও জানিয়ে দেব।'

সেলেনাকে নিয়ে হোটেলে ঢুকল রানা, গিয়ে দাঁড়াল রিসেপশন ডেস্কে। রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, ক্যাথারদের দুর্গ-ব্যবস্থা দেখার জন্য একদল ইংরেজ এসেছে, ফলে দখল হয়ে গেছে হোটেলের সব রুম। একটা মাত্র রুম খালি আছে—হানিমুন স্যুইট। ভাড়া যদিও বেশি।

'ওটাই নিতে চাই আমরা,' বিনা দ্বিধায় বলল রানা। 'এখনই কি পে করতে হবে?' হাত ঢোকাল পকেটে। বের করল নিজের পাসপোর্ট আর একগাদা নোট।

ওই পরিমাণ টাকায় পুরো হোটেল একমাসের জন্য ভাড়া নেয়া যায়, তাই চোখ কপালে উঠল রিসেপশনিস্টের। 'না, মসিয়ে, থাক।' বেল বাজিয়ে ডাকল বুড়ো এক হোটেল-কর্মচারীকে, ইশারায় দেখিয়ে দিল রানা ও সেলেনাকে। 'হানিমুন স্যুইটে নিয়ে যাও এঁদেরকে।'

হোটেলকক্ষের এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে সেলেনা,

এদিকওদিক তাকাচ্ছে। প্রাচীন-প্রাচীন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এই ঘরে। চেষ্টা করা হয়েছে কোমলতার ছোঁয়া দেয়ার। সোফা আছে, আর্মচেয়ার আছে, কফি টেবিল আছে। খাটটা বিশাল, সেটার দুধসাদা চাদরে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে শোভা পাচ্ছে বড় একটা লাল হৃদয়চিহ্ন। একধারের একটা ওয়ালনাট টেবিলে শোভা পাচ্ছে তাজা ফুল। ওগুলোর পাশে রাখা আছে রিবনে-বাঁধা কয়েকটা চকলেট। বর আর কনের যুগলবন্দি মূর্তিও আছে। বরের পরনে টাক্সিডো, কনে পরেছে বিয়ের সাদা পোশাক।

বিছানায় বসে জুতো খুলে ফেলল রানা। ভাবছে, সেলেনা যদি সঙ্গে না থাকত, তা হলে এই হানিমুন স্যুইটে উঠত না। হয়তো জঙ্গলের ভেতরে সুবিধাজনক কোনও জায়গায় গাড়ি রাখত, গাড়ির ভেতরেই ঘুমিয়ে পার করে দিত রাতটা। আগামীকাল সকালে হয়তো ফিরে যেত সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে, দেখা করত ফাদার ম্যাকগিলের সঙ্গে...

জ্যাকেট আর শোল্ডার হোলস্টার খুলে ফেলল ও, রাখল সোফার হাতলে। ক্লান্তি এড়ানোর জন্য সোফায় বসে টান টান করে দিল হাত-পা।

'এমা ঠিক হয়ে যাবে তো?' সেলেনার প্রশ্নটা বাস্তবে ফিরিয়ে আনল রানাকে।

'কয়েকটা সেলাই পড়বে ওর শরীরে। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে বেচারি, সেটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। সকালে ফোন করে জেনে নেবো কোন্ হাসপাতালে ভর্তি করা হলো ওকে।'

'মস্ত ওই লোক যদি আবার হামলা চালায় ওর ওপর?'

'লোকটা আবার সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না। এমাকে হাসপাতালে নেয়ামাত্র যোগাযোগ করা হবে পুলিশের সঙ্গে...হয়তো ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। পুলিশও হয়তো পৌঁছে গেছে হাসপাতালে। যতক্ষণ পুলিশ থাকবে সেখানে,

কিছু করার সাহস পাবে না কেউ।’

‘লোকটা এমার খোঁজ পেল কী করে?’

‘জানি না।’

‘সে কী চাইছিল এমার কাছে?’

‘তা-ও জানি না। ...এমার সঙ্গে কথা না বললে জানা যাবে না।’

‘ভিলার বাইরে এক লোকের লাশ দেখেছি আমরা। কে সে?’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘এমার কোনও বন্ধু হতে পারে। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে বেচারা।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেলেনা। ‘এসব নিয়ে ভাবলেই কেমন যেন অস্থির লাগছে আমার, গা গুলিয়ে উঠছে।’

‘শাওয়ার নিয়ে এসো। ভালো লাগবে।’

সোফায় বসে আছে রানা। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। বাথরুম থেকে পানি-পড়ার আওয়াজ আসছে।

নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করছে ও। ওর বোঝা উচিত ছিল, শত্রুপক্ষ হামলা করতে পারে এমার ওপর। ভিলায় পৌঁছাতে যদি আর পাঁচটা মিনিট দেরি হতো, তা হলে হয়তো...

শত্রুপক্ষ মরিয়া হয়ে উঠেছে, টের পাচ্ছে রানা। ওরা এখন রানা এবং ওর পরিচিত লোকদের শেষ না-দেখে ছাড়বে না।

চোয়াল শক্ত হলো ওর। শেষ না দেখে ছাড়বে না ও-ও।

ইন্টারকমের মাধ্যমে ডিনারের অর্ডার দিল রানা, সার্ভ করতে বলল রুমেই।

নিঃশব্দে খাওয়া সারল রানা ও সেলেনা। রেডিও চলছে, কোমল জ্যাযের সুর ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।

শ্যাম্পেনের বোতলটা যখন খালি হলো, ততক্ষণে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বিছানা থেকে একটা বালিশ তুলে নিল রানা, রাখল ঘরের আরেক পাশের একটা কাউচের ওপর। ওয়ার্ডরোব থেকে বের করল বাড়তি কম্বল। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেলেনাকে ইশারায় দেখিয়ে দিল বিছানাটা। 'শুয়ে পড়ো। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সেলেনা, কিছু বলতে চাইছে সম্ভবত। অপেক্ষা করছে রানা। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই বলল না মেয়েটা, গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘরের লাইট নিভিয়ে রানাও শুয়ে পড়ল কাউচে। ওয়ালথার ঢুকিয়ে রাখল বালিশের নিচে।

'রানা?' কিছুক্ষণ পর ডাকল সেলেনা।

'উঁ?' বুজে ফেলা চোখের পাতা একটুখানি খুলল রানা।

'এ-রকম কোনও বিছানায় আগে কখনও শুইনি আমি।'

'শোবে কী করে? বিয়ে করেছ যে হানিমুনে যাবে?'

'কাউচে বোধহয় কষ্ট হচ্ছে তোমার।'

'না।'

'না! কেন?'

'এর চেয়েও জঘন্য জায়গায় ঘুমানোর অভ্যাস আছে আমার।'

'তোমার চালচলন দেখলে বিশ্বাস হয়, সত্যিই একসময় সেনাবাহিনীতে ছিলে। তুমি কি মেজর ছিলে?'

'হুঁ।'

'চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেন?'

'সেলেনা, ঘুমাও। সকালে নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'তোমার সবসময় এত তাড়া কীসের, রানা?'

জবাব দিল না রানা। বুঝতে পারছে, বকবকানিতে পেয়ে বসেছে সেলেনাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটা। তারপর বলল, 'এই বিছানায় এত জায়গা আছে যে, ছ'জন লোক ঘুমাতে পারবে।'

চোখ খুলল রানা, অন্ধকারেই তাকাল বিছানার দিকে। 'তুমি কি তোমার পাশে শুতে বলছ আমাকে?'

'আমি...মানে...শুরু থেকেই আমার জন্যে কষ্ট করছ তুমি, অথচ...আমার কারণে অত কষ্ট পাওয়া উচিত হয়নি তোমার। আমি...আসলে...কেমন যেন নার্ভাস লাগছে, তুমি পাশে থাকলে হয়তো...' কথা শেষ না করে থেমে গেল সেলেনা।

কিছুক্ষণ দ্বিধা করল রানা। তারপর নামল কাউচ থেকে, বালিশ আর কম্বল তুলে নিল। আবারও ইতস্তত করল—ওয়ালথারটা নেবে কি নেবে না, ভাবছে। ওটা যেখানে আছে, সেখানেই রেখে দিল। অপরিচিত অন্ধকার ঘরে অন্ধের মতো হেঁটে হাজির হলো বিছানার কাছে। সেলেনা যেখানে শুয়ে আছে, সে-জায়গা থেকে যথেষ্ট দূরে খাটের আরেক পাশে শুয়ে পড়ল। কম্বল টেনে নিল গায়ের ওপর।

অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে আছে রানা আর সেলেনা। কেউ কোনও কথা বলছে না। এখনও ঘুমায়নি কেউই। এতক্ষণ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল চাঁদ, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে মেঘ, একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছে ঘর।

রানার দিকে পাশ ফিরল মেয়েটা। কাঁপা কাঁপা একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে, যেন স্পর্শ করতে চাইছে রানাকে। ফিসফিস করে বলল, 'রানা?'

জবাব না দিয়ে চোখ বুজল রানা।

আঠারো

ভোর হওয়ার ঘণ্টা দেড়েক আগে ভেঙে গেল রানার ঘুম।

সন্তর্পণে বিছানা ছাড়ল ও। দেখতে পেল, উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে সেলেনা, সরে গেছে কম্বলটা। কম্বল টেনে দিল মেয়েটার গায়ে, তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কেমন অসহায় আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে বেচারিকে। দম নেয়া-ছাড়ার তালে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে কোমল শরীরটা।

মেয়েটির প্রতি অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করল রানা। শব্দ করে ছাড়তে গিয়েও গোপন করল দীর্ঘশ্বাস।

কাউচের কাছে হাজির হলো ও, তুলে নিল ওয়ালথারটা। এই হানিমুন-স্যুইটের সঙ্গে ছোট্ট আরেকটা ঘর আছে, গেল সেখানে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে জ্বালল সাইড ল্যাম্প।

হেনরিখ প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপি খোঁজার যে-অভিযানে নেমেছিল রানা, তা পরিণত হয়েছে বিপজ্জনক এক মরণ-খেলায়, এবং খেলাটা শেষ হয়নি এখনও। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, ওই পাণ্ডুলিপির পেছনে লেগেছে আরও একাধিক লোক...খুব সম্ভব সংঘবদ্ধ কোনও চক্র, এবং ওটা যে-কোনও মূল্যে হাসিল করতে চায় তারা। ওটা পাওয়ার জন্য কতদূর কী করতে পারে তারা, ইতিমধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে।

এমার ভিলা থেকে চলে আসার সময় দৈত্যের মত ওই হামলাকারীর কালো জ্যাকেটটা সঙ্গে করে এনেছে রানা।

ওটার পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল ও। হেলমুটের নোটবুক আর ওই নকল ম্যাপ ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

কিছুটা হলেও হতাশ হয়েছে রানা। ভেবেছিল, জ্যাকেটটা ঘাঁটলে সেটার মালিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

লোকটা আসলে কে? ভাবছে রানা। খুব সম্ভব কোনও ভাড়াটে খুনি। ও-রকম লোক জীবনে অনেক দেখেছে রানা, কিন্তু আজ যাকে দেখল তার মতো আর কাউকে দেখেছে কি না, মনে করতে পারছে না। কী নির্বিকার ভাবে, অবলীলায় অত্যাচার চালাচ্ছিল লোকটা এমার ওপর! ওই লোকের মানসিক বিকৃতি আছে, সন্দেহ নেই।

নকল ম্যাপটাও ভাবিয়ে তুলেছে রানাকে। ওটা কেন নিতে গেল খুনে লোকটা? হয়তো বুঝতে পারেনি, জিনিসটা নকল। হয়তো ভেবেছে, হেলমুটের নোটবুকের মতোই কোনও-না-কোনও মূল্য আছে ওই জিনিসের।

তারমানে, অন্য যে বা যারা খুঁজছে প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপি, ঠিক কী খুঁজতে হবে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত নয় তারাও।

প্লাস্টিকের প্যাকেটের ভেতর থেকে নোটবুকটা বের করল রানা। ল্যাম্পের পাশে একটা কাউচে বসে পড়ল ওটা নিয়ে।

এই নোটবুক ভালোমতো দেখার সুযোগ পায়নি এখন পর্যন্ত। এটার ব্যাপারে যা অনুমান করেছে রানা, তা কি সত্যি? এই নোটবুক কি প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির নকল?

নোটবুকটা খুলল রানা। সময় নিয়ে একটা একটা করে পাতা উল্টাচ্ছে। প্রতিটা লেখা, প্রতিটা ড্রইং-এর ওপর নজর বোলাচ্ছে।

সবকিছু অর্থহীন মনে হচ্ছে ওর কাছে এখনও। কারণ এমন কিছু অদ্ভুত বর্ণ আর সংখ্যা লিখে রেখেছে হেলমুট, যার

মানে সে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে কি না, সন্দেহঃ

g 81 m 62 h 21 h 71 i 51 42 y
30 i 51 ÿ
P 21 y 91 v 21 v 62 h 81 b 42 h 81 bb
311 †‡‡ 81 32 w
42 W 51 g

এ-রকম উদ্ভট লাইন আরও অনেক আছে।

এসবের মানে কী?

বিশেষ কোনও জাতের কোড? নাকি অ্যালকেমিকাল ফর্মুলা?

হেলমুটের এই লেখার যদি কোনও মানে থেকে থাকে, কোড বা ফর্মুলা ছাড়া অন্যকিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সে-সম্পর্ক, আপাতত মনে হচ্ছে রানার, খুবই দুর্বোধ্য।

আপাতত যেসব লেখা কোড বা ফর্মুলা বলে মনে হচ্ছে রানার, সেগুলো উপেক্ষা করে নোটবুকের পাতা উল্টিয়ে চলল ও। বিশেষ একটা পৃষ্ঠায় এসে থমকে গেল কেন যেন।

ওই পৃষ্ঠায় কলমের স্কেচে একটা ফোয়ারা এঁকেছে হেলমুট। ওটার ভিত্তির কাছে আঁকা হয়েছে আজব কিছু প্রতীক। ড্রয়িং-এর নিচে চার লাইনে কিছু লেখা আছে ল্যাটিন ভাষায়।

সব কথা বুঝতে না পারলেও রানা অনুমান করে নিল, যিশুখ্রিস্ট, তাঁর ক্ষত, মাতা মেরি এবং দুধ-রক্তের সংস্পর্শে সৃষ্ট জীবনের-ফোয়ারা সম্পর্কে লেখা হয়েছে কিছু।

জীবনের ফোয়ারা। অর্থাৎ মধ্যযুগের বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে অ্যালকেমিস্টদের বিশ্বাস অনুযায়ী অমৃতসুধা, যার খোঁজ পাওয়ার জন্য রানাকে অনুরোধ করেছেন পিয়েরে উইনিং।

কিন্তু এসব রানার কষ্টকল্পনা হতে পারে...এই ব্যাপারে আসলে নিশ্চিত নয় ও।

বিরক্তি লাগছে রানার—আগেও যে-অন্ধকারে ছিল, এখনও সেখানেই আছে। তারপরও পাতা উল্টিয়ে চলল।

সাধারণ কিছু অ্যালকেমিকাল প্রতীক দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পাতায়:

♄ ♃ ☉ ☼ ♀ ☿

= ⊛ ☽ ☉

নিজের রক্তে আঙুল ডুবিয়ে কোনও কোনও প্রতীকের ওপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছে হেলমুট।

ইগনে নেতুরা রেনুভাতুরি ইনতেগ্রা কথাটা কয়েক জায়গায় লিখেছে সে।

কোথাও আবার লিখেছে নীতিবাক্য অথবা হেঁয়ালিমূলক কোনও কথা:

Vincit qui se vincit
সে-ই আসল বিজয়ী, যে নিজেকে জয় করতে পেরেছে

Non ducor, duco
আমি অনুসরণ করি না, অনুসরণ করাই

Aqua vitae
জীবনের পানি

Astra inclinant, sed non obligant
তারাগুলো নত হয়েছে আমাদের দিকে,

কিন্তু বেঁধে রাখেনি আমাদেরকে

Flectere si nequeo superos,
Acheronta movebo
আমি যদি স্বর্গের ইচ্ছা বাঁকাতে না-পারি,
তা হলে নরক তোলপাড় করে দেবো

Oderint dum metuant
তাদেরকে ঘৃণা করতে দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ভয় পায়

হাই তুলল রানা, আরও কয়েকটা পাতা উল্টাল।

আবার একটা পৃষ্ঠায় থামতে হলো ওকে। এখানে ফরাসি ভাষায় হেলমুট লিখেছে:

Considérons le symbole du corbeau,
car il cache un point important de notre science
দাঁড়কাকের প্রতীকটা বিবেচনা করা উচিত আমাদের,
আড়ালে লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

কীসের দাঁড়কাক? একটা দাঁড়কাক বিজ্ঞানের কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কীভাবে আড়াল করে রাখতে পারে?

এই কথাটাও পাগলাটে হেলমুটের হেঁয়ালি ভেবে পাতা উল্টাতে যাচ্ছিল রানা, কথাটার নিচে ছোট ছোট করে লেখা কিছু সংখ্যা দৃষ্টি কেড়ে নিল ওর:

3-10
10-19
19-25
25-4

মানে?

ফ্রেঞ্চ ওই বাক্য এবং সংখ্যাগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। কিছুক্ষণ পর খেয়াল করল, এই পৃষ্ঠার আগে-পরের কয়েকটা পৃষ্ঠায় দাঁড়কাকের কয়েকটা ছবি এঁকেছে হেলমুট।

ওর উদ্ভট আঁকিবুঁকি আর লেখাজোখা যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন সারা নোটবুকের একমাত্র ইংরেজি বাক্যটা লিখেছে সে একজায়গায়:

I think of the English
see, it is a sea
take a row, but don't row
it seldom falls from a tree during storm

হেলমুটের হেঁয়ালি ভেবে কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করল না রানা, পাতা উল্টাচ্ছে। শেষ পাতা পর্যন্ত দেখল ও, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পেল না আর।

হাতঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। দুই চোখ জ্বলছে ওর। কাউচে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

জঙ্গলের যে-গাছের নিচে বসে আছে ফ্র্যাযো, বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে সেটার ডাল-পাতা। ওর সামনে বেঁটে একটা ঝোপ, তাই দূরের রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে না ওকে। সারারাত ঘুমায়নি সে, বসে থেকেছে মূর্তির মতো—যেন শিকারের আশায় ওঁৎ পেতে আছে কোনও মাংসাশী জানোয়ার। বাঁ হাতে কোনও সাড়া পাচ্ছে না সে। ওর যে-কানের লতি উড়ে গেছে, অসহ্য ব্যথা করছে সেখানে। তারপরও বসে আছে সে। অপেক্ষা করছে।

মুখ আর ডান হাতের সাহায্যে মোটা একটা ব্যাণ্ডেজ

বেঁধে নিয়েছে সে বাঁ হাতে। আহত কান নিয়ে ভাবছে না। নিজের ভিতর সে শুধু টের পাচ্ছে তরল ইস্পাতের মতো টগবগে নির্ভেজাল ক্রোধ।

ব্যর্থতা ফ্র্যাযোর কাছে বিষের মতো। বিশেষ করে যখন সাফল্য পাওয়ার কথা ছিল অনায়াসে। সে টের পাচ্ছে, ওর পুরস্কার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অনেকদিন পর কেউ একজন...ওই দীর্ঘদেহী বিদেশি, ঘাবড়ে দিয়েছে ওকে। হারিয়ে দিয়েছে।

এবং পরাজয়টা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ফ্র্যাযো।

গতকাল রাতে ওর চোখের সামনে সাইরেন বাজিয়ে হাজির হয়েছিল অ্যাম্বুলেন্সটা...সে তখন লুকিয়ে ছিল এমা মিরিয়ামের ভিলার কাছেই। গাড়ি চালিয়ে বেশিদূর যায়নি...গাড়ি নিয়ে রওয়ানা দেয়াটা ছিল আসলে একটা ধোঁকাবাজি।

অ্যাম্বুলেন্সটা নিয়ে গেল এমাকে...তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না ফ্র্যাযোর। তারপর ওই কানাডিয়ান মেয়েকে নিয়ে রওয়ানা হলো বিদেশি ওই লোক।

এমাকে আর দরকার ছিল না ফ্র্যাযোর, তাই নিজের গাড়িতে করে অতি সন্তর্পণে পিছু নেয় সে বিদেশি লোকটার। কোন্ হোটেলে উঠল ওরা, তা দেখল সে ষাট-সত্তর মিটার দূর থেকে। তারপর হোটেলের ড্রাইভওয়েতেই পার্ক করল নিজের গাড়ি। বেরিয়ে এসে ঢুকল কাছের জঙ্গলে।

অন্য কোথাও পার্ক করার উপায় ছিল না ফ্র্যাযোর—লোকে সন্দেহ করত। গাড়িটা ড্রাইভওয়েতে দেখলে যে-কেউ ভাববে, হোটেলে থাকছে এমন কেউ ওটার মালিক। কিন্তু সে-লোক যে লুকিয়ে আছে অনতিদূরের জঙ্গলে, কল্পনাও করবে না কেউ।

মাঝরাতের অনেক পরে, হোটেলের সব ঘরের বাতি যখন নিভে গেছে, আড়াল ছেড়ে বের হয়েছিল ফ্র্যাযো,

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়েছিল হোটেলের দিকে। হাজির হয়েছিল একতলার রান্নাঘরের পেছনের-দরজায়।

হাতল ধরে মোচড় দিতেই আশ্চর্য হয়ে যায় সে—লক করা হয়নি দরজাটা। তখন চুপিসারে ঢুকে পড়ে সে হোটেলের ভেতরে। রান্নাঘর থেকে জোগাড় করে নেয় বড় একটা ধারালো ছুরি।

অত রাতে শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ করছিল হোটেলের ভেতরটা। মাসুদ রানা আর সেলেনা বার্নহার্ট কোন্ তলার কোন্ ঘরে আছে, জানা আছে ফ্র্যাযোর—ঝোপের আড়াল থেকে ওদের ছায়ামূর্তি দেখেছে হোটেল কামরার জানালায়।

হানিমুন স্যুইটের দরজার কাছে, করিডোরে, হাজির হয়ে এদিকওদিক দেখে নেয় ফ্র্যাযো; তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বের করে বিশেষ একজাতের তার। ছুরিটা হাতেই ছিল। ও-দুটো নিয়ে কারিগরি ফলাতে শুরু করে দরজার লকের ওপর।

কিন্তু কেরামতি দেখানোর সুযোগ পায়নি সে বেশিক্ষণ। হঠাৎ করেই আলো জ্বলে উঠল ওই কামরার ভেতরে। দরজার নিচে কারও ছায়া দেখতে পেল ফ্র্যাযো। সঙ্গে সঙ্গে সব সাহস উবে গেল ওর।

বিদেশি লোকটা যতক্ষণ জেগে আছে, ততক্ষণ তার মুখোমুখি হতে চায় না ফ্র্যাযো...কিছুতেই না। বিশেষ করে একটা অব্যর্থ পিস্তল যখন আছে লোকটার কাছে। ওই লোক ভয় ধরিয়ে দিয়েছে ফ্র্যাযোর মনে।

তাই জঙ্গলে, সেই ঝোপের আড়ালে ফিরে আসতে হলো ফ্র্যাযোকে।

তারপর থেকে অপেক্ষা করছে সে।

সে জানে, সবুরে মেওয়া ফলে।

হোটেলের লবিতে বুটিক কাপড়ের একটা দোকান আছে,

ওখান থেকে কাপড় কেনার উদ্দেশ্যে নিচে নেমেছে সেলেনা। রানা তখনও ঘুমাচ্ছে। ওকে ঘুম থেকে তুলতে চায়নি মেয়েটা। ভেবেছে, কেনাকাটা সারতে বড়জোর আধ ঘণ্টা লাগবে ওর।

সকাল ন'টার আগে দোকান খোলে না। দোকানের জানালার কাচ ভেদ করে ভেতরে তাকাল সেলেনা। ডিসপ্লেতে থাকা একটা জাম্পার আর একটা কালো জিন্স পছন্দ করল নিজের জন্য। ঘড়ি দেখল। নষ্ট করার মতো কিছু সময় আছে হাতে।

হোটেলের বাইরে বের হলো সেলেনা। সকালটা সুন্দর। বাতাস ঠাণ্ডা, তাজা। অনতিদূরে ছোট কিন্তু সুন্দর একটা বাগান করেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ, ফুটে-থাকা নয়নাভিরাম ফুলগুলো চোখ জুড়িয়ে দেয়। সেদিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। গত রাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। মনে পড়ে যাচ্ছে, কীভাবে ডেকে নিয়েছিল সে রানাকে নিজের বিছানায়। অথচ...

আত্মচিন্তায় এতই বিভোর ছিল সেলেনা যে, ওর পেছনে চুপিসারে হাজির হওয়া লোকটার উপস্থিতি টের পেল না। ওর মুখ যখন বাঁ হাতে চেপে ধরল লোকটা, অন্য হাতে ছুরি ধরল গলায়, তখন আঁৎকে উঠল।

'টুঁ শব্দও যদি করো...' নির্ভেজাল শাসানি লোকটার ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে, 'স্রেফ জবাই করে ফেলবো। হাঁটো।'

লোকটার পরিচয় অনুমান করে নিতে কষ্ট হলো না সেলেনার। টের পেল, ওর শরীরের সব রক্ত যেন জমে গেছে। অসাড় হয়ে গেছে মগজ, বাধা দেয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে সে।

ওকে যেদিকে ঠেলা মারল লোকটা, সেদিকেই হাঁটতে শুরু করল সে।

চোখ খুলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে গেল ওর পিঠ। কে বা কারা হাঁটছে ওপরতলায়, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। করিডোরে শোনা যাচ্ছে একাধিক লোকের কণ্ঠ।

হাতঘড়ি দেখল ও, বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল। ন'টা বেজে গেছে। হেলমুটের নোটবুকটা পড়ে আছে পাশে।

কাউচ ছাড়ল রানা, বেডরুমে গিয়ে ঢুকল।

বিছানাটা খালি।

বাথরুমের দরজা বন্ধ।

ওই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বাথরুমের ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না।

সেলেনার নাম ধরে ডাকল রানা। কোনও সাড়া মিলল না।

বাথরুমের দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল রানা। খুলে গেল ওটা।

সেলেনা নেই ভেতরে।

আবারও বিড়বিড় করল রানা। ওর বিরক্তি বাড়ছে।

গেল কোথায় মেয়েটা?

সেলেনাকে নিজের গাড়ির কাছে নিয়ে গেল ফ্র্যাযো, তারপর হঠাৎ করেই মেয়েটার নাকেমুখে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি মারল। চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠল সেলেনার, দিনের বেলাতেই হাজারটা তারা দেখতে পেল। ওকে বলতে গেলে ছুঁড়ে ফেলল ফ্র্যাযো ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে।

ফ্র্যাযোর এক ঘুসিতেই জ্ঞান অর্ধেক হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা, তাই নতুন কোনও ব্যথা টের পেল না।

থেঁতলে-যাওয়া ঠোঁট থেকে বেরিয়ে-আসা রক্তের স্বাদ পেল মেয়েটা কিছুক্ষণ পর, চোখ মেলল। মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার, দৃষ্টি পরিষ্কার হলো।

গাড়ি চালাতে শুরু করেছে লোকটা, স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে একহাতে। অন্যহাতে আছে ছুরিটা।

সেলেনাকে তাকাতে দেখে ফ্র্যাযো বলল, 'তোমার ওই পিরিতের নাগরের মতো যদি কোনও তেড়িবেড়ি করো, ভিলার মেয়েটার যে-হাল করেছি, তারচেয়েও খারাপ অবস্থা করবো তোমার।'

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল সেলেনা।

চটজলদি ফ্রেশ হয়ে নিল ও, জ্যাকেটের নিচে পরল শোল্ডার হোলস্টার, ওয়ালথার গুঁজল ওটাতে। রুম থেকে বের হয়ে হাজির হলো সিঁড়িতে, নিচে নামছে।

ডাইনিংরুমে এসে দেখতে পেল, ব্রিটিশ ট্যুরিস্টদের দলটা একসঙ্গে বসেছে নাস্তা খেতে। উঁচু গলায় কথা বলছে তাদের অনেকে, সরগরম হয়ে আছে পুরো ঘর।

সেলেনাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

নির্জন লবিতে এসে দাঁড়াল রানা। এককোনায় কী যেন করছে হোটেলের কয়েকজন স্টাফ, কাজ করতে করতে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

হোটেলের বাইরে বের হলো রানা। না-বলে কোথায় গেল সেলেনা? কোথাও হাঁটতে বেরিয়েছে? কিন্তু রানাকে বলল না কেন? রানা ঘুমিয়ে গেছে দেখে বিরক্ত করতে চায়নি?

কার পার্কিং-এ এসে দাঁড়াল রানা। রোদ তেতে উঠেছে ইতিমধ্যে, গরম লাগছে। ড্রাইভওয়ের সাদা নুড়িপাথরে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে রোদ।

ইংরেজ ট্যুরিস্টরা ছাড়া অন্য যেসব ট্যুরিস্ট উঠেছে হোটেলে, তারা দলবেঁধে অথবা একাকী হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। গাড়িবোঝাই করে নতুন নতুন ট্যুরিস্ট আসছে, থাকার জায়গা পাবে কি না জানার আগেই

বাক্সপেঁটরাসহ নেমে পড়ছে গাড়ি থেকে, গিয়ে ঢুকছে হোটেলের লবিতে।

সেলেনাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

হোটেলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। লবির উদ্দেশে হাঁটছে, পেছনে সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘুরল।

হোটেলের ড্রাইভওয়ে দিয়ে দ্রুত গতিতে ঢুকছে পুলিশের দুটো গাড়ি, পেছনে ধুলো উড়ছে। রানার দু'পাশে থামল ও-দুটো, দু'জন করে পুলিশ অফিসার নামল। তারা সবাই তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না, তাই ঘুরল রানা, হাঁটা ধরল।

'মসিয়ে?' একজন পুলিশ অফিসার ডাকল রানাকে পেছন থেকে।

গাড়ি চালানোর সময় আড়চোখে একবার সেলেনাকে দেখে নিল ফ্র্যাযো। মেয়েটা ভয় পেয়েছে। মনে মনে হাসল ফ্র্যাযো। শিকারের চোখে ভয় দেখতে খুব ভালোবাসে সে। ধরা পড়ার সময় শিকার যদি ভয় না পায়, তা হলে আর মজা কী?

মেয়েটাকে যদি কষ্ট দিয়ে দিয়ে শেষ করে দিতে পারত ফ্র্যাযো, আরও বেশি মজা পেত। কিন্তু ইচ্ছা থাকার পরও করা যাবে না কাজটা। কারণ গতকাল রাতে ফ্র্যাযোর মোবাইলে কল দিয়েছিল উসবিলিয়ানো মাতিমাসি।

'ওদের দু'জনকেই জ্যান্ত চাই আমি,' পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল সে। 'মনে থাকে যেন...জ্যান্ত। পাণ্ডুলিপিটা যদি উদ্ধার করতে না-পারো, তা হলে এমন কোনও কৌশল অবলম্বন কোরো, যাতে ওটা আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় মাসুদ রানা।'

পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে পারেনি ফ্র্যাযো, তাই সেলেনাকে কিডন্যাপ করেছে। সে আশা করছে, মুক্তিপণ হিসেবে ওই পাণ্ডুলিপি মাতিমাসির হাতে তুলে দেবে মাসুদ রানা।

তারপর...ঠোঁট বাঁকাল ফ্র্যাযো...পারিশ্রমিক হিসেবে এই লালচুলের মেয়ে আর মাসুদ রানাকে চেয়ে নেবে সে মাতিমাসির কাছ থেকে।

আড়চোখে তাকাল নিজের আহত বাঁ হাতের দিকে।

মাসুদ রানাকে জবাই না করা পর্যন্ত শান্তি নেই তার।

রানা টের পেল, ওর পেছন পেছন আসছে পুলিশের চার অফিসার। রেডিয়োর খড়খড়ানি শুনতে পেল ও।

হাঁটার গতি দ্রুত করল রানা। এমন ভাব করছে, যেন শুনতে পায়নি পুলিশ অফিসারের ডাক।

'মসিয়ে, এক মিনিট,' আরও জোরে ডাক দিল অফিসার।

থামল রানা। উল্টো ঘোরেনি, তবে স্থির হয়ে গেছে।

ওর কাছে হাজির হলো চার পুলিশ-অফিসার, ঘিরে ধরল। তাদের একজন সার্জেন্ট। তার দেহকাঠামো মজবুত ও পেশিবহুল, কাঁধ চৌকোনা, বুকের ছাতি বিশাল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ আছে।

চারজনের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, তার বয়স বেশি হলে পঁচিশ। নার্ভাস হয়ে আছে সে, কপাল ঘেমে গেছে। কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরেছে একহাতে।

রানা বুঝতে পারছে, যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, এখন সুবোধ বালকের মতো আচরণ করতে হবে ওকে।

'আপনিই কি পুলিশে খবর দিয়েছেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন সার্জেন্ট।

জবাব দিল না রানা, দিতে পারল না আসলে।

পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে মানে?

'আমি দিয়েছি,' হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসেছে এক

ট্যুরিস্ট, উঁচু গলায় বলেছে কথাটা। হাত নাড়ছে চার পুলিশ-অফিসারের উদ্দেশে। ধূসর চুল-লোকটার মাথায়।

'মাফ করবেন, স্যর,' রানাকে বললেন সার্জেন্ট, ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ধূসর চুলের লোকটা কাছে চলে এসেছে, রানার প্রশ্নটা শুনতে পেল। 'একটা মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছি আমি, তাই খবর দিয়েছি পুলিশে।'

বুকের ভেতরে একটা মোচড় টের পেল রানা।

'যে-লোক কিডন্যাপটা করেছে,' বলছে ধূসরচুলো, 'সে বিশাল এক গরিলার মত দেখতে। আমার মনে হয় ফায়ারআর্ম আছে তার কাছে। মেয়েটাকে এমনভাবে পাকড়াও করল যেন কেউ কোনও বাধা দিতে না পারে। সোজা গিয়ে উঠল গাড়িতে...কালো একটা গাড়িতে করে এসেছিল এখানে। গাড়ির লাইসেন্স প্লেট ঠিকমতো দেখতে পাইনি, তবে আমার মনে হয় রেজিস্ট্রেশন ভিনদেশি...খুব সম্ভব ইটালিয়ান। ...মেয়েটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু লাভ হয়নি...এক ঘুষিতে কাবু করে ফেলল সে মেয়েটাকে। সে বেশ সুন্দরী, মাথাভর্তি লাল চুলের কারণে ওর চেহারা মনে আছে আমার।'

'কিডন্যাপার লোকটা গাড়ি নিয়ে কোন্‌দিকে গেছে, দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন সার্জেন্ট।

'ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে হাতের বাঁয়ে মোড় নিয়েছে।'

'ঘটনাটা কতক্ষণ আগের?'

হাতঘড়ি দেখল ধূসরচুলো ট্যুরিস্ট। 'বিশ কি পঁচিশ মিনিট হবে।'

কোমরের বেল্ট থেকে রেডিয়ো খসালেন সার্জেন্ট, কথা বলছেন। বাকি তিনজন ঘিরে ধরল ধূসরচুলোকে, কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চায়।

আর কিছু দেখার বা শোনার প্রয়োজন বোধ করল না রানা, সরে এল চুপিসারে।

উনিশ

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফরাসি পুলিশের একটা ট্যাকটিকাল রেসপন্স ইউনিট ঘিরে ধরল হোটেলটা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল তারা। সবাই প্যারামিলিটারি অফিসার, পরনে কালো ইউনিফর্ম, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত। খাটো ব্যারেলের শটগান আছে কারও কারও কাছে। কেউ আবার বহন করছে টিয়ারগ্যাস গ্রেনেড লঞ্চার।

হোটেলের গেস্টরা সবাই থতমত খেয়ে গেছে। তাদেরকে এবং হোটেলের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বাইরে নিয়ে এল প্যারামিলিটারি অফিসারদের দলটা, তারপর নিয়ে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

ততক্ষণে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক আর গুজব।

একজন ভিনদেশি মেয়েকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে গেল কিডন্যাপার? মেয়েটাকে জিম্মি করার উদ্দেশ্য কী তার? প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণ করে...লোকটা কোনও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্য না তো? নাকি কোনও সাইকোপ্যাথ বা সিরিয়াল কিলার?

হোটেলের পেছনদিকে ওই লোকের ট্রেইল খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগল না পুলিশের। ঘাসে ছাওয়া একটা জমিন

এগিয়ে গেছে কাছের এক ফার্মহাউসের দিকে; তীক্ষ্ণ দৃষ্টির এক পুলিশ অফিসার দেখতে পেল, কিছু ঘাস নুয়ে আছে। তারমানে কেউ একজন অতি সম্প্রতি দৌড়ে গেছে ওখান দিয়ে।

পুলিশের একটা জার্মান শেফার্ড সন্দেহজনক ঘ্রাণ শনাক্ত করতে পেরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল সমানে। ঘটনা অনুমান করে নিয়ে ফার্মহাউসের দিকে ছুট লাগাল ট্যাকটিকাল রেসপন্স ইউনিট। ট্রেইলটা তাদেরকে নিয়ে গেল অনতিদূরের এক জঙ্গলে।

কিন্তু ওই জঙ্গলেই হারিয়ে গেছে ট্রেইল। এদিক-সেদিকে অনেকক্ষণ খুঁজল পুলিশ অফিসাররা, কিন্তু আলামত কিছুই পেল না।

যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে বিশালদেহী লোকটা।

ওই লোক যে আসলে বোকা বানিয়েছে পুলিশকে, একসময় টের পেয়ে গেল অফিসাররা।

ফাদার ম্যাকগিলের গাড়িতে করে সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে চলে এল রানা। দেখা করল ফাদারের সঙ্গে।

রানার চেহারা দেখে ফাদার বুঝে নিলেন, খারাপ কিছু ঘটেছে। বললেন, 'সেলেনা কোথায়?'

তাঁকে জানাল রানা কী ঘটেছে।

শুনে চেহারা ঝুলে পড়ল ফাদারের। ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা টুলের ওপর। দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর বয়স বেড়ে গেছে হঠাৎ করেই।

'এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না,' বলল রানা। 'কোথাকার জল কোন্ দিকে গড়াচ্ছে, অনুসন্ধান করছে ফরাসি পুলিশও; যে-কোনও সময় হাজির হয়ে যাবে ওরা। আমার ব্যাপারে...এবং হয়তো সেলেনার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আপনাকে।'

উঠে দাঁড়ালেন ফাদার, কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখা দিয়েছে তাঁর চোখে। রানার একটা হাত ধরলেন তিনি। 'এসো আমার সঙ্গে। অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলি তোমার সঙ্গে।'

রানাকে গির্জার ভেতরে নিয়ে গেলেন তিনি। 'কিছু একটা বলা বা জানার জন্য এসেছ তুমি আমার কাছে। কী সেটা?'

'*ঈশ্বরের তরবারি* কী?'

কিছুটা চমকে উঠলেন ফাদার প্রশ্নটা শুনে। 'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'ওই নামের কোনও সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছেন?'

'না।'

'একবার একজন বিশপের কথা বলছিলেন আমাকে...'

'শ্‌শ্‌শ্‌...কারা যেন ঢুকছে গির্জার ভেতরে!'

অন্ধকার এক কোনায় সরে গেল রানা।

ফাদারও সরে গেলেন, এগিয়ে যাচ্ছেন গির্জার কেন্দ্রভাগের দিকে।

'ফাদার লুকাস ম্যাকগিল?' কয়েকজন পুলিশ অফিসার ঢুকে পড়েছে গির্জার ভেতরে, ডাক দিল তাদের একজন।

এগিয়ে গেলেন ফাদার।

'আমি ইন্সপেক্টর অ্যাল মার্লো,' যে-অফিসার ফাদারকে ডেকেছে, নিজের পরিচয় দিল সে।

'চলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলি,' দরজার উদ্দেশে হাঁটছেন ফাদার।

ক্লান্তি বোধ করছে মার্লো। পুলিশের একটা হেলিকপ্টারে চড়ে এই গ্রামে হাজির হয়েছে সে। মাসুদ রানার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছিল, লাল চুলের বিদেশি এক মেয়েকে সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে দেখা গেছে জানতে পেরে খোঁজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন করে।

ফাদারের পেছন পেছন বেরিয়ে এল সে গির্জার বাইরে।

‘মাসুদ রানা নামে বিদেশি এক লোকের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছি আমরা। জানতে চাই, লোকটা এখন কোথায়।’

চুপ করে আছেন ফাদার।

‘দয়া করে গোপন করা অথবা মিথ্যা বলার চেষ্টা করবেন না, ফাদার,’ বলল মার্লো। ‘যেসব জায়গায় দেখা গেছে মাসুদ রানাকে, কোনও-না-কোনও অঘটন ঘটেছে সেখানে। তাকে শেষ দেখা গেছে বিলাসবহুল এক হোটেলে...এখান থেকে বেশি দূরে নয় সেটা...আর সেখান থেকে গায়েব হয়ে গেছে কানাডিয়ান এক মেয়ে। গায়েব হয়ে গেছে রানাও। বলা হচ্ছে, মেয়েটাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।’

কোনও মন্তব্য করলেন না ফাদার।

‘এসব ব্যাপারে কী জানেন আপনি, শুনতে চাই আমরা।’

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রানা। কী করবে এখন? মুমূর্ষু মিনতির কথা ভুলে গিয়ে খোঁজ শুরু করবে সেলেনার? কিন্তু...মেয়েটাকে এতক্ষণে হয়তো খুন করে ফেলা হয়েছে। হয়তো...

পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। ওটা বের করল রানা।

অপরিচিত নম্বর।

কল রিসিভ করল রানা।

‘মাসুদ রানা?’ ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর কেমন যান্ত্রিক।

‘কে?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, কণ্ঠ নিচু। গির্জার জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, মার্লো আর ওর সহকারীরা এখনও জেরা করছে ফাদারকে।

‘সেলেনা বার্নহার্ট আমাদের হাতে।’

চুপ করে আছে রানা। চুপ করে আছে ও-প্রান্তের লোকটাও। সে বোধহয় আশা করছে রানা কিছু বলবে।

কিন্তু রানা মুখ খুলল না। চাইছে, যা বলার, ও-প্রান্তের

লোকটাই বলুক।

'মেয়েটাকে যদি জীবিত দেখতে চাও, যা বলবো এবং যেভাবে বলবো, তাই করতে হবে তোমাকে।'

'কী চাও তোমরা?'

'তোমাকে, মিস্টার রানা। এবং ওই পাণ্ডুলিপিটা।'

'ওটা আমার কাছে আছে, ধরে নিচ্ছ কেন?'

'ধরে নিচ্ছি না, জানি।'

'কী করতে হবে আমাকে?'

'একটা জায়গার কথা বলবো তোমাকে। সেখানে সশরীরে হাজির হয়ে পাণ্ডুলিপিটা তুলে দিতে হবে আমাদের হাতে।'

'কোন্ জায়গা?'

'মণ্টপিলিয়ারে লা প্রমিনেদ নামে একটা পার্ক আছে, ওটার সদর-দরজায় হাজির থাকবে তুমি আজ রাত ঠিক এগারোটায়। একা আসতে হবে তোমাকে। আমরা নজর রাখবো। যদি পুলিশ নিয়ে আসো, অথবা তোমার সঙ্গে যদি আর কেউ থাকে, সেলেনার লাশ কয়েক টুকরো করে পাঠিয়ে দেবো তোমার কাছে।'

'সে যে বেঁচে আছে, তার প্রমাণ চাই আমি।'

হাসির শব্দ পাওয়া গেল ও-প্রান্ত থেকে, তারপর শোনা গেল অদ্ভুত এক খসখস আওয়াজ। মনে হলো, ফোনটা হাতবদল করা হচ্ছে।

'রানা?' শোনা গেল সেলেনার ভয়জড়িত কণ্ঠ, 'আমি...'

আর কিছু বলতে পারল না মেয়েটা, বলতে দেয়া হলো না—ফোন কেড়ে নেয়া হয়েছে ওর কাছ থেকে।

দ্রুত ভাবছে রানা। বেঁচে আছে সেলেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করছে রানা, ততক্ষণ বেঁচে থাকবে।

তারমানে, কিছুটা দর কষাকষি করার সুযোগ আছে ওর হাতে।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দরকার আমার,' বলল ও।

'কেন?' বিরক্ত হয়েছে যান্ত্রিক কণ্ঠের মালিক।

'কারণ এই মুহূর্তে পাণ্ডুলিপিটা নেই আমার কাছে। ওটা হোটেলরুমে রয়ে গেছে। কোন্ হোটেলের কোন্ রুম, আশা করি বুঝতে পেরেছ। ওখানে যেতে হবে আমাকে, নিয়ে আসতে হবে ওটা।'

'এই মুহূর্তে কোথায় আছ তুমি?'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে। শুধু জেনে রাখো, ওই হোটেল থেকে অনেক দূরে আছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল যান্ত্রিক কণ্ঠ। 'ঠিক আছে, সময় দেয়া হলো তোমাকে, তবে আটচল্লিশ ঘণ্টা নয়। চব্বিশ ঘণ্টা। এক মিনিটও যদি দেরি হয়, সেলেনা মরবে।'

'তা হলে বরং মেরেই ফেলো। আমার পক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে কিছু করা সম্ভব না।'

ও-প্রান্তে নীরবতা। রানার পক্ষ থেকে এ-রকম কথা আশা করেনি যান্ত্রিক কণ্ঠের মালিক। কিছুক্ষণ পর লোকটা বলল, 'যা বলছ, বুঝে বলছ তো?'

'তুমি যা বলছ, সে-ব্যাপারে ধারণা আছে তোমার? এক গরিলাকে পাঠিয়েছিলে পাণ্ডুলিপি ছিনতাই করার জন্য, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে সে। পাগলা কুকুরের মতো আচরণ করছে ফরাসি পুলিশ, শিকারকে যেভাবে ছেঁকে ধরে পিরানহার ঝাঁক সেভাবে ঘিরে রেখেছে ওরা ওই হোটেল। ওখানে ঢুকতে এবং সহি-সালামতে বের হতে সময় লাগবে আমার। পাঠাও না ওই গরিলাকে... নিয়ে আসুক ওটা।'

ও-প্রান্তে আবারও নীরবতা। একাধিক চাপা-গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। নিজেদের মধ্যে জরুরি আলোচনা সেরে নিচ্ছে লোকগুলো।

'ঠিক আছে,' সরব হলো যান্ত্রিক কণ্ঠ, 'ছত্রিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো। এখন বিকেল পাঁচটা বাজে, আগামীকাল রাত

এগারোটায় আসবে তুমি জায়গামতো।'

আর কিছু না-বলে লাইন কেটে দিল রানা। মোবাইল পকেটে রেখে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে।

উড়াল দিয়েছে হেলিকপ্টারটা। ফাদারকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে মার্লো ও তার সঙ্গীরা।

মিনিট দশেক পর গির্জার ভেতরে ঢুকলেন ফাদার। মার্লোর সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাঁর, জেনে নিল রানা। লোকটা কোথায় গেছে, জেনে নিল সেটাও। তারপর বলল, 'আপনার গাড়ি ব্যবহার করে যাতায়াত করা যায়, কিন্তু ওটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। প্রয়োজনের সময় গতি তোলা যাবে না। নতুন আর দ্রুত গতির কিছু চাই আমার।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ফাদার। 'আমার বাসায় চলো, সেখানে বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। খোঁজ নিয়ে দেখি গ্রামবাসীদের কেউ এমন কিছু বেচবে কি না যা দিয়ে প্রয়োজন মিটবে তোমার।'

বছর পাঁচেকের পুরনো মডেলের একটা প্রায়-নতুন মোটরবাইক পাওয়া গেল গ্রামের একমাত্র গ্যারেজে। গোটা কয়েক আছাড় খাওয়ায় আগের মতো চকচকে নেই সেটা, তবে এক শ'-এক শ' দশ পর্যন্ত গতি তোলা যাবে সহজেই। টাকার দরকার হওয়ায় ওটা গ্যারেজমালিকের কাছে বেচে দেয়া হয়েছিল।

ফাদারকে সঙ্গে নিয়ে গ্যারেজে গেল রানা, নগদ টাকায় কিনল বাইকটা, তারপর রওয়ানা হলো মণ্টপিলিয়ারের উদ্দেশে—যেখানে গেছে মার্লো।

মণ্টপিলিয়ার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বাইরে, একটা কফিশপে বসে কফি খাচ্ছে মার্লো। লোকটার অলক্ষে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। চুপিসারে এগিয়ে গেল মার্লোর দিকে। ফুটখানেকের মধ্যে হাজির হয়ে বলল,

‘আমার কাছে একটা ওয়ালথার আছে। আর তোমার কাছে আছে একটা পুলিশ সার্ভিস পয়েন্ট থার্টি এইট। ওটা বের করে আমার হাতে দাও। তাড়াহুড়ো করলে তোমার বিপদ হবে। আমি শুধু কথা বলতে চাই, আর কিছু না।’

বরফের মতো জমে গেছে মার্লো, দম পর্যন্ত নিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হিপ হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে রানার হাতে দিল। ‘তোমার সাহস আছে, মাসুদ রানা।’

‘তোমাকে এবং তোমার গাড়িটা দরকার আমার,’ বলল রানা। ‘লং ড্রাইভে যাবো।’

আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্লো। ‘কফির দাম চুকাইনি।’

‘আমি চুকিয়ে দিয়েছি দোকানে ঢুকেই। ওঠো এখন।’

শহরের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। গাড়ি চালাচ্ছে মার্লো, ওর পাশের সিটে বসেছে রানা। ওয়ালথার এবং পয়েন্ট থার্টি এইট দুটোই ওর হাতে, তাক করে রেখেছে মার্লোর দিকে।

‘ওই যে,’ একসময় মুখ খুলল রানা, ‘সামনে কতগুলো গাছের পাশে খোলা একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছ না? ওখানে গাড়ি থামাও।’

কথামতো কাজ করল মার্লো, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। ‘রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কর্ণধার কিডন্যাপ করেছে একজন ফ্রেঞ্চ পুলিস-ইন্সপেক্টরকে, অস্ত্রের মুখে গাড়ি চালাতে বাধ্য করেছে। ফ্রান্সে তোমার এজেন্সির ব্যবসা করার দিন শেষ।’

‘সেটা দেখা যাবে পরে। নামো গাড়ি থেকে।’

রানার হাতেধরা অস্ত্র দুটো একনজর দেখল মার্লো, তারপর যা বলা হয়েছে তা করল। অনতিদূরে একটা নদী আছে, ওটার পাড়ে মার্লোকে নিয়ে গেল রানা।

‘বলো কী বলবে,’ বলল মার্লো।

‘আমি খুনি না। আমি কাউকে খুন করিনি, কোনও

অপরাধও করিনি। তোমরা শুধু শুধু লেগেছ আমার পেছনে।'

'তা-ই? তোমাকে ফলো করে যেখানেই গেছি আমি, লাশ পেয়েছি। তারপরও বলছ তুমি খুনি না?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'একজন পুলিশ অফিসারকে অস্ত্রের মুখে কিডন্যাপ করেছ। তারপরও নিজেকে নিরপরাধ দাবি করছ?'

'হ্যাঁ, করছি।'

'হাসালে।'

'তুমি হাসো বা কাঁদো, আমার কিছু করার নেই। আমি শুধু বলতে চাই, তুমি এবং তোমার লোকেরা যদি আমার পেছনে লেগে থাকো, যা করছি আমি তা করাটা মুশকিল হয়ে যাবে আমার জন্যে।'

'সেলেনা বার্নহার্ট কোথায়?'

'উত্তরটা জানা আছে তোমার। ওকে অপহরণ করা হয়েছে।'

'কে করেছে কাজটা? তুমি?'

'না। আমরা একসঙ্গে কাজ করছিলাম।'

'কোন্ কেসে?'

'দুঃখিত, জবাব দিতে পারলাম না।'

'কী বলার জন্য এখানে নিয়ে এসেছ আমাকে?'

'ঈশ্বরের তরবারি। নামটা শুনেছ?'

জবাব দেয়ার আগে একটু সময় নিল মার্লো। 'হুঁ...শুনেছি। মানে তোমার হাতে নিহত-হওয়া এক লোকের গায়ে ঈশ্বরের তরবারির ট্যাটু দেখেছি।'

'ওই লোক আমার হাতে মরেনি। ওদের দলের অন্য কেউ গুলি চালিয়েছিল ওর ওপর। এবং সেটা ভালোমতোই জানো তুমি।'

'কেন করতে গেল ওরা কাজটা?'

'ওরা চায়নি, ওই লোক বেফাঁস কিছু বলে ফেলুক আমার

কাছে।'

'ঝেড়ে কাশো।'

'আমার ধারণা, ঈশ্বরের তরবারি উগ্রপন্থী কোনও কাল্ট বা গ্যাঙ। ওরা সুসংগঠিত। টাকার জোর আছে ওদের। বিশেষ কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে। এবং আমার আরও ধারণা, সেলেনা এই মুহূর্তে বন্দি হয়ে আছে ওদের হাতে।'

'কানাডিয়ান একজন বায়োলজিস্টকে কিডন্যাপ করবে কেন ওরা?'

'গত কিছুদিন ধরে সেলেনাকে খুন করার চেষ্টা চালাচ্ছিল ওরা। অ্যাটেম্পট নিয়েছে আমার ওপরেও।'

'কেন?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। তবে তুমি এবং তোমার লোকেরা আমার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ালে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারবো।'

'ওটা পুলিশের কাজ, তোমার নয়।'

'ভুল বললে। সেলেনাকে উদ্ধার করা এখন শুধু আমার কাজই নয়, দায়িত্বও। কিডন্যাপিং কেসে পুলিশ জড়িয়ে গেলে কী হয়, জানি আমি।'

'মনে হচ্ছে, প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই জানো তুমি, মাসুদ রানা।'

'হয়তো। যা-হোক, যা বলার জন্য উঠিয়ে এনেছি তোমাকে...তোমার লোকদের নিয়ে খানিকটা পিছু হটে যাও। আমাকে আমার মতো কাজ করতে দাও।'

হেসে ফেলল মার্লো।

'যদি আমার কথামতো কাজ করো,' বলছে রানা, 'বিনিময়ে কিছু-একটা দেবো তোমাকে।'

'আমার সঙ্গে দর কষাকষি করার মতো অবস্থায় নেই তুমি, মাসুদ রানা।'

‘একটা ওয়ালথার আর একটা থার্টি এইট আছে আমার হাতে।’

‘তারপরও গুলি চালাতে পারবে না তুমি...জানি আমি। প্রকাশ্য দিবালোকে একজন পুলিশ অফিসারকে খুন করা মুখের কথা না।’

‘তোমাকে খুন করতে চাইও না আমি...কোনও দরকারও নেই সেটার। শুরুতেই বলেছি, আমি খুনি না। আমি তোমার সাহায্য চাই। বিনিময়ে আমার পক্ষ থেকেও সাহায্য পাবে।’

একটা ভ্রূ উঁচু করল মার্লো। ‘যেমন?’

‘যে-রাতে ব্রিজের গোড়ায় গোলাগুলি হলো, সে-রাতে মারা পড়েছে কয়েকজন পুলিশ অফিসার; যে বা যারা ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী, তাদেরকে তোমার হাতে তুলে দেবো। জে ফক্সের খুনিকেও ধরিয়ে দেবো। ঈশ্বরের তরবারি যাতে নিস্তার না-পায় আইনের কবল থেকে, সে-ব্যবস্থা করবো।’

অস্বস্তি ফুটেছে মার্লোর চোখে, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কিছুক্ষণ পর বলল, ‘বিনিময়ে আমার শুধু নাক গলানো যাবে না তোমার কাজে?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘এবং একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।’

‘কী?’

ব্রিজের গোড়ায় গোলাগুলি হয়েছিল যে-রাতে, সে-রাতে টেকো লোকটার পকেট থেকে একটা কার্ড পেয়েছিল রানা; ওটা বের করে বাড়িয়ে ধরল মার্লোর দিকে। ‘এনযো নামের একটা লোকের ফোন নম্বর আছে এই কার্ডে। তোমার বাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ কাউকে কাজে লাগিয়ে দাও। ফোন করবে সে এনযোকে, তারপর জে ফক্সের ভূমিকায় অভিনয় করবে।’

‘কিন্তু ফক্স তো মরে গেছে!’

‘সেটা এনযো না-ও জানতে পারে। সে হয়তো জানে, ফক্স কাজ করছে আমার সঙ্গে।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মার্লো। তারপর বলল, ‘আমার লোক কী বলবে এনযোকে?’

‘বলবে, মাসুদ রানা পালিয়ে চলে এসেছে প্যারিসে। তারপর ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। বলবে, বাড়তি কিছু কামিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে সে, অর্থাৎ মাসুদ রানাকে তুলে দিতে চাইছে এনযো'র হাতে। তবে সেটা অবশ্যই চড়া দামে। আরও বলবে, দেখা করতে চায় সে এনযো'র সঙ্গে।’

ঠোঁট কামড়াল মার্লো, রানার প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি করবে-না ভাবছে।

‘এনযো যদি টোপ গেলে,’ বলছে রানা, ‘মানে কোথাও দেখা করতে যদি রাজি হয়, দলবলসহ সেখানে যাবে তোমরা, গ্রেপ্তার করবে লোকটাকে। ওকে হাজতে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরবে। বলবে, ঈশ্বরের তরবারি'র ব্যাপারে সব জেনে গেছে পুলিশ—টেকো লোকটা ফাঁস করে দিয়েছে মরার আগে। কাজেই এনযো যদি নিজের ভালো চায়, যেন মুখ খোলে।’

তবুও কিছু বলল না মার্লো।

‘যদি আমার কথামতো কাজ করো,’ বলে চলল রানা, ‘নিজেই বুঝতে পারবে অনেককিছু। তবে যা করার, তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে।’

এখনও চুপ করে আছে মার্লো, রানার কথাগুলো নিয়ে ভাবছে।

পুলিশ সার্ভিস রিভলভারটা মার্লোর দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। ‘নাও...তোমাকে বিশ্বাস করে ফেরত দিচ্ছি এটা। তোমাকে কিডন্যাপ করার অভিযোগ করেছিলে, রিভলভারটা ফিরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করলাম, সে-কাজ করার ইচ্ছা ছিল না

আমার আসলে।'

বিস্ময়ের ছাপ পড়েছে মার্লোর চেহারায়। রিভলভারটা নিল সে, ঢুকিয়ে রাখল হিপ হোলস্টারে। ওকে একটা সিগারেট দিল রানা, নিজেও ধরাল একটা।

ওরা দু'জনে চুপচাপ ধূমপান করছে। তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। অনতিদূরের একটা গাছে ডাকছে কয়েকটা পাখি, ওগুলোর গান শুনছে ওরা।

রানার দিকে তাকাল মার্লো। 'ঠিক আছে, আমিও বিশ্বাস করলাম তোমাকে। এবং মেনে নিলাম তোমার প্রস্তাব।'

'ভালো।'

'একটা খবর দিতে চাই তোমাকে।'

'কী?'

'এক টিনেজার ছোকরা...গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ।'

'তো?'

'ওই ছোকরার বেডরুমে একটা মেডালিয়ন পাওয়া গেছে। ওটার গায়ে একটা তরবারির ছবি খোদাই করা আছে। সেটার নিচে কী লেখা থাকতে পারে, বলো তো?'

'ঈশ্বরের তরবারি?'

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মার্লো।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল ওদের দু'জনের।

'নাম কী ছেলেটার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যার্দি,' বলল মার্লো।

বিশ

মার্লোর সঙ্গে যার্দিদের বাসায় এসেছে রানা।

কেন এসেছে ওরা, সেটা রানার মুখ থেকে শোনামাত্র ছেলেটার মা নাতালিনা বললেন, 'আরও প্রশ্ন বাকি আছে আপনাদের? কাজের কাজ তো কিছু করতে পারেন না, শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে পারেন।'

মহিলার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। নিখোঁজ ছেলের জন্য উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। বোধহয় ঘুম হচ্ছে না গত কয়েক রাত ধরে, তাই কালি পড়ে গেছে চোখের নিচে।

'বেশি সময় নেবো না আমরা,' মহিলাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রানা। 'দু'-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই চলে যাবো।'

মার্লোর দিকে তাকালেন নাতালিনা। 'যা বলার, পুলিশ অফিসারদের কাছে ইতিমধ্যে সব বলেছি আমি। কোনও লাভ হয়নি।'

'আপনি যদি সাহায্য করেন আমাদেরকে,' আশ্বাস দিচ্ছে রানা, 'তা হলে লাভ হতেও পারে।'

রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন নাতালিনা, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন। কাঁদলেন কিছুক্ষণ। নিজেকে একসময় সামলে নিয়ে বললেন, 'বলুন, কী জানতে চান।'

রানা বলল, 'কোথায় গেছে যার্দি, বলে গেছে আপনাকে?'

'না।'

'ওর একটা মোটরবাইক ছিল। ওটার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বলুন।'

নম্বরটা বললেন নাতালিনা, ওটা টুকে নিল রানা। তারপর বলল, 'আগেও কি কখনও এ-রকম করেছে যার্দি? মানে...না-বলে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, তারপর কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ থেকেছে?'

'না, কখনও না। দেরি করে বাড়ি ফেরার অভ্যাস ছিল ওর, কিন্তু কখনওই নিখোঁজ হয়নি।'

'এমন কোনও বন্ধু কি আছে ওর, যার সঙ্গে হয়তো পালিয়ে গেছে সে?'

জবাব না-দিয়ে মাথা নাড়লেন নাতালিনা।

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এমন কোনও বন্ধু কি আছে ওর, যার বাড়িতে নিয়মিত পার্টি করতে যেত সে?'

এবারও মাথা নাড়লেন নাতালিনা, আবারও ফোঁপাচ্ছেন। 'আমার ছেলে ফুর্তিবাজ না। সে লাজুক প্রকৃতির, নিজের মতো থাকতে ভালোবাসে। বই পড়তে ভালোবাসে, মাঝেমধ্যে টুকটাক গল্পও লেখে। নির্বান্ধব ছিল না সে, তবে বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও যেত না। অথবা গেলেও বাড়ি ফিরে আসত।'

'সে কি এখনও স্কুলে পড়ছে?'

'না। এ-বছরের শুরুর দিকে পাস করেছে। আমার এক দূর সম্পর্কের দেবর আছে...ইলেকট্রিশিয়ান। ওর অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করছিল যার্দি।'

'আপনার স্বামী কি আপনার সঙ্গে থাকেন?' মহিলার হাতে বিয়ের-আংটি দেখতে পেয়েছে রানা।

'না। চার বছর আগে আমাদেরকে রেখে চলে গেছে সে। তারপর আর কখনও আসেনি, আমাদের খোঁজও নেয়নি।'

তিতা হাসি হাসলেন নাতালিনা। ‘আপনি যদি ভেবে থাকেন বাবা তুলে নিয়ে গেছে তার ছেলেকে, ভুল করেছেন। ওই লোক পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট, স্বার্থপর মানুষ। নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে অথবা অন্যকিছু নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার।’

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘কোনও ধর্মীয় সংগঠনে যোগ দেয়া অথবা ও-রকম কিছুর ব্যাপারে আপনাকে কি কখনও কিছু বলেছে যার্দি?’

‘না। ...কেন জিজ্ঞেস করলেন কথাটা? ওর ঘরে যে-মেডালিয়ন পাওয়া গেছে, সেটার জন্য?’

‘হুঁ।’

‘ওই জিনিস কোত্থেকে এল ওর ঘরে, জানি না। ও-রকম কিছু আগে কখনও দেখিনি আমি। আপনার আগে অন্য যে-পুলিশ অফিসাররা এসেছিল আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, তাদের ধারণা, যার্দি চুরি করেছে ওটা। কিন্তু আমি জানি, সে ওই কাজ করেনি। আমার ছেলে আর যা-ই হোক, চোর না।’

‘আমারও মনে হয় যার্দি চোর না। ...আপনার সেই দূর সম্পর্কের দেবরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘সে এখান থেকে বেশি দূরে থাকে না। ঠিকানা বলছি, লিখে নিন।’

ঠিকানাটা লিখে নিল রানা।

‘আমার মনে হয় না সেখানে গিয়ে খুব একটা লাভ হবে আপনার,’ বলছেন নাতালিনা। ‘আমি যা বলতে পারিনি আপনাকে, সে তা পারবে কি না, সন্দেহ আছে।’

জ্ঞান ফিরল সেলেনার। শক্ত আর সরু বাঙ্কে কতক্ষণ ধরে শুয়ে আছে সে, জানে না। চোখ পিটপিট করল, দৃষ্টি পরিষ্কার হলো কিছুটা। কোথায় আছে, মনে করার চেষ্টা করল। ভীতি উদ্রেককারী কিছু ঘটনা হানা দিল ওর স্মৃতির পর্দায়।

বিশাল সেই লোকটা টেনেহিঁচড়ে নামাচ্ছে ওকে কালো

একটা গাড়ি থেকে। তারপর...কে যেন ইনজেকশন পুশ করল ওর হাতে। ওর মনে পড়ল, চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

মাথার ভেতরটা দপ দপ করছে ওর। তিতা একটা স্বাদ টের পাচ্ছে মুখের ভেতরে। বুঝতে পারল, জানালাবিহীন ঠাণ্ডা একটা সেলারে আছে।

সেলারটা ছোট্ট। ভেতরের পরিবেশ কেমন স্যাঁতসেঁতে। তিনদিকে লোহার মোটা শিক। একদিকে পাথরের দেয়াল। মাথার ওপর ঝুলছে নগ্ন একটা বাল্ব। ওটার হলুদাভ আলো সেলারের অন্ধকার কাটানোর জন্য যথেষ্ট না। পাথরের কয়েকটা পিলার আছে সেলারে, সেগুলোর গায়ে দুর্বল প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বাল্বের আলোর।

অনতিদূরে আলাদা আরেকটা সেল আছে। ওটার ভেতরে দেখা যাচ্ছে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন টিনএজার এক ছোকরাকে। মেঝেতেই শুয়ে আছে ছেলেটা। কড়া ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে ওকেও। অথবা...হয়তো মরে গেছে সে।

'অ্যাই, শুনছ?' ডাকল সেলেনা।

নড়ল না ছেলেটা।

'এই যে...শুনতে পাচ্ছ?'

কোনও সাড়া নেই ওই ছেলের তরফ থেকে।

সেলারের বাইরে অস্থিসার এক লোককে দেখতে পাচ্ছে সেলেনা—খুব সম্ভব পাহারাদার। লোকটার চোখ বড় বড়—কেমন গিরগিটির মতো; গালে হলুদাভ ঘন দাড়ি। তার ঘাড়ে আটকানো স্লিং-এ ঝুলছে একটা সাবমেশিন গান। নার্ভাস ভঙ্গিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সে সেলারের বাইরে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত।

লোকটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখল সেলেনা। কত কদমে সেলারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যাচ্ছে লোকটা, গুনল। সেটা থেকে মনে মনে হিসেব কষার চেষ্টা করছে, সেলারের

দৈর্ঘ্য কত হতে পারে।

সেলেনাকেও থেকে থেকে দেখছে ওই লোক। এবং যখন দেখছে, সেলেনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাচ্ছে। সেই দৃষ্টির মানে বুঝতে কষ্ট হয় না পৃথিবীর কোনও মেয়েরই।

গা রি রি করে উঠল সেলেনার।

কিছুক্ষণ পর হাজির হলো গাঁটাগোট্টা আর এক লোক—ডিউটির পালাবদল ঘটল। নতুন-আসা লোকটার চাঁদি কামানো। বয়সে সে ওই অস্থিসারের চেয়ে বড়। আচরণে নার্ভাস না, বরং চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ আছে। সেলেনা জেগে আছে দেখতে পেয়ে ওকে এক কাপ কফি দিল লোকটা। টিনের একটা প্লেটে কিছু সিদ্ধ মটরশুঁটি আর দু'টুকরো রুটিও দিল। দূরে গিয়ে সাবমেশিন গানটা নিল অস্থিসারের কাছ থেকে, কাঁধে ঝোলাল।

সামনে খাবার থাকতে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার মানে হয় না, তাই উঠে বসল সেলেনা। সময় নিয়ে খাচ্ছে। এদিকওদিক চোখ বোলাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরল অথবা ঘুম ভাঙল পাশের সেলারের ছেলেটার। গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল সে। টলছে; দেখে মনে হচ্ছে এখনই পড়ে যাবে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে উবু হলো হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে। রক্তলাল দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সেলেনার দিকে।

'আমার নাম সেলেনা,' নিচু গলায় বলল মেয়েটা, মুখ নিয়ে গেছে গরাদের কাছে। 'তোমার নাম কী?'

সাড়া দেয়ার লক্ষণ দেখা গেল না ছেলেটার মধ্যে। হয়তো এখনও ঠিকমতো কাজ করছে না ওর মস্তিষ্ক। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেলেনার দিকে।

গাঁট্টাগোট্টা চায় না, নিজেদের মধ্যে আলাপ জমাক সেলেনা আর ওই ছেলে। কোমরে-পরা যিপার ব্যাগ থেকে

একটা সিরিঞ্জ বের করল সে, এগিয়ে গেল ওই ছেলের সেলারের দিকে। গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল নিজের খালি হাতটা, ছেলেটার একটা হাত চেপে ধরে ওকে টেনে নিয়ে এল কাছে। ইনজেকশন পুশ করল।

আবারও টলতে শুরু করল ছেলেটা। মিনিটখানেকের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

'ওর সঙ্গে কেন এ-রকম করলে?' হিসহিস করে উঠল সেলেনা।

'চুপ কর্,' শাসাল গাঁট্টাগোট্টা, 'নইলে তোরও একই অবস্থা হবে।'

'ছেলেটাকে কিডন্যাপ করা হয়নি,' যার্দিদের বাসা থেকে বেরিয়ে আসামাত্র বলল মার্লো। 'আমার ধারণা কোনও গার্লফ্রেণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে সে। চুটিয়ে প্রেম করবে ক'দিন, তারপর ঠিকই ফিরে আসবে।'

রানাকে নিয়ে একটা পাবে ঢুকল সে, বিয়ারের অর্ডার করল ওদের দু'জনের জন্য। ওয়েইটার চলে যাওয়ার পর রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডিউটিতে থাকা অবস্থায় মদ খাচ্ছি...উচিত হচ্ছে না কাজটা। তারপরও...গলাটা শুকিয়ে গেছে একেবারে।'

বিয়ারের ক্যান দিয়ে গেল ওয়েইটার।

নিজের ক্যান খুলল রানা, লম্বা চুমুক দিল। 'তোমার কেন মনে হচ্ছে ওই ছোকরা তার গার্লফ্রেণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে মজা করতে গেছে কোথাও?'

'এখনকার ছেলেছোকরাদের আর কাজ কী? তা ছাড়া যার্দির বাপের রেকর্ডও ভালো না।'

'কী করেছে লোকটা?'

'কী করেনি, সেটা জিজ্ঞেস করো। হেন কোনও অপরাধ নেই, যার রেকর্ড নিজের নামের পাশে বসায়নি। ওর জন্য

জামিনের চেষ্টাচরিত্র করতে গিয়ে কেটে গেছে আমার চাকরিজীবনের লম্বা একটা সময়।'

বিয়ারের ক্যানে আবারও চুমুক দিল রানা। 'কেন? ওই লোকের জন্য জামিনের চেষ্টা করতে হলো কেন তোমার?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মার্লো। তারপর বলল, 'ও আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'বাপ কা বেটা বলে একটা কথা আছে, আমার ধারণা ওই নিখোঁজ ছোকরাও সে-রকম হয়েছে।'

আরেক চুমুক বিয়ার খেল রানা। 'তারপরও...নিশ্চিত না-হয়ে অনুমানের ওপর কোনও মন্তব্য করা ঠিক না। মহিলার বুকভাঙা কান্নাটা মনের ভেতর বিঁধছে এখনও।'

কয়েক ঘণ্টা পর...সময়ের হিসেবটা ঠিক বলতে পারবে না সেলেনা...আবারও পালাবদল ঘটল ডিউটির। হলুদ দাড়িওয়ালা অস্থিসার কামুক লোকটার উদয় ঘটল আবারও। সাবমেশিন গানের দায়িত্ব নেয়ার সময় আরও একবার দৃষ্টি দিয়ে চাটল সে সেলেনাকে।

আরও একবার গা রি রি করে উঠল মেয়েটার।

টের পেল, বাঙ্কের সঙ্গে যেন আঠার মতো আটকে গেছে ওর শরীর। দেখল, ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছে অস্থিসার।

পরিস্থিতির সুযোগ নেয়া যায় কি না, ভাবল সেলেনা। অনুচ্চ গলায় বলল, 'আমাকে এক গ্লাস পানি দেবে? পিপাসা লেগেছে।'

'পরে যদি পেশাব করতে চাও,' সব দাঁত দেখা যাচ্ছে অস্থিসারের, 'তা হলে কিন্তু আমার সামনেই করতে হবে কাজটা। তোমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার হুকুম নেই।'

হাতের সামনে কিছু-একটা থাকলে সেটা অস্থিসারের

নাকেমুখে ছুঁড়ে মারত সেলেনা, কিন্তু তেমন কিছুই নেই। ওর খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর কফির মগ আর টিনের প্লেটটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সেলেনাকে এক গ্লাস পানি দিল অস্থিসার।

পানি খেয়ে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল মেয়েটা। কিন্তু সেলারের সামনে থেকে নড়ার লক্ষণ নেই অস্থিসারের। কী আশায় দাঁড়িয়ে আছে সে গরাদে ঘেঁষে, সে-ই জানে।

'তোমার নাম কী?' বলল সেলেনা।

'ফিলিপ,' জবাব দিল অস্থিসার।

'ফিলিপ, একটা মিনিট সময় দেবে আমাকে? তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

জবাব দিল না ফিলিপ, তাকিয়ে আছে সেলেনার দিকে।

'আমার একটা কানের দুল হারিয়ে গেছে। তোমার পায়ের কাছেই কোথাও পড়েছে মনে হয়। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঠিকমতো বের করতে পারছি না, তাই খুঁজতে পারছি না ওটা। ...একটু খুঁজে দেবে?'

'বিনিময়ে তুমি কী দেবে?'

হাসার চেষ্টা করল সেলেনা। 'জিনিসটা চব্বিশ ক্যারেট সোনার...ছোট হলেও দাম অনেক।'

আর বলতে হলো না, লোভ পেয়ে বসেছে তাকে। সাবমেশিন গানটা পিঠে ঝুলিয়ে বসে পড়ল উবু হয়ে। গরাদের আশপাশে জমা পুরু ধুলোয় আঙুল চালাচ্ছে। 'কোথায় পড়েছে ওটা?'

গরাদের আরেকপাশে হাজির হলো সেলেনা, ফিলিপের থেকে ওর দূরত্ব এখন এক ফুটেরও কম। বলল, 'ওই তো...তোমার একটু ডানদিকে মনে হয়...ওই যে...'

সেলেনার দিকে খেয়াল নেই ফিলিপের, এবং সেটা বুঝতে পারামাত্র গরাদের ফাঁক দিয়ে দুই হাত বিদ্যুৎগতিতে বের করল মেয়েটা; দাড়ি খামচে ধরেছে লোকটার।

হতচকিত হয়ে গেছে ফিলিপ, প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে। হঠাৎ ওর দাড়ি ছেড়ে দিয়ে ঘাড় জড়িয়ে ধরল মেয়েটা, হ্যাঁচকা এক টান মারল নিজের দিকে। ফিলিপের কপাল জোরে ঠুকে গেল গরাদের সঙ্গে।

পর পর তিনবার একই কাজ করল সেলেনা।

মাথা ফেটে যায়নি ফিলিপের, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে সে। ওর ঘাড়টা সেলেনা ছেড়ে দিতেই পড়ে গেল সে চিৎ হয়ে। সাবমেশিন গান চাপা পড়েছে পিঠের নিচে, ভাঁজ হয়ে আছে দুই হাঁটু। ওর নাক ভেঙে গেছে, রক্ত বের হচ্ছে দুই ফুটো দিয়ে।

একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চাইল না সেলেনা। গরাদের ফাঁক দিয়ে পুরো মেলে দিল একটা হাত। হাঁপাচ্ছে। অন্য হাত দিয়ে চোখের ওপর জমা-হওয়া ঘাম মুছল। আগেই খেয়াল করেছে, ফিলিপের কোমরের বেল্টে চাবির একটা গোছা।

ক্লিপ খুলে গোছাটা নিল সেলেনা। হাত কাঁপছে ওর। বার বার মনে হচ্ছে এখনই চলে আসবে অন্য কেউ, ধরে ফেলবে ওকে। অনতিদূরের কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপরে, বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাল নার্ভাস ভঙ্গিতে।

একের পর এক চাবি ট্রাই করছে সেলেনা সেলারের দরজায়। পঞ্চম চাবিটা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ওটা প্রচণ্ড জোরে খুলল সেলেনা, বাড়ি খেয়ে গুঙিয়ে উঠল ফিলিপ। ওর পিঠের নিচ থেকে সাবমেশিন গানটা বের করল সেলেনা টেনেহিঁচড়ে, ঝোলাল নিজের কাঁধে। অজ্ঞান ছেলেটা যে-সেলারে আছে, এগিয়ে গেল সেদিকে।

'এই যে, ওঠো,' সেলারের দরজায় লাথি মারল সেলেনা।

কিন্তু নড়ার কোনও লক্ষণ নেই ছেলের।

সেলারের দরজা খুলে ছেলেটাকে বের করে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি না, ভাবল সেলেনা। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিল

সে। ওই ছেলে অনেক ভারী হয়ে যাবে সেলেনার জন্যে। বরং সেলেনা যদি নিরাপদে পালাতে পারে এই কয়েদখানা থেকে, যদি গিয়ে খবর দিতে পারে পুলিশে, উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ছেলেটার।

দৌড় দিল সেলেনা। পাথুরে করিডোর ধরে ছুটছে সিঁড়ির ওই ধাপগুলোর দিকে।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েছে কি দেয়নি, খুলে গেল স্টিলের দরজাটা। উদয় হয়েছে সেই খুনি লোকটা। ভয়ে বরফের মতো জমে গেল মেয়েটা।

সেই লোক!

রিকার্ডোর সঙ্গে দেখা করে সেলারের ঘটনাটা জানতে পারল রানা।

কৌতূহল ফুটল ওর চোখে। 'ওটা কি ব্যক্তিগত কোনও বাড়ি?'

'না,' বলল রিকার্ডো, 'ধর্মীয় একটা প্রতিষ্ঠান...অনেকটা স্কুলের মতো।'

'ঠিকানা বলো।'

'ঠিকানা জানি না। তবে লোকেশন বলতে পারি। খুঁজে নিতে হবে আপনাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

ওকে লোকেশনটা বুঝিয়ে বলল রিকার্ডো।

রিকার্ডোকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর বাসা থেকে বেরিয়ে এল রানা আর মার্লো।

'ওখানে হানা দেয়ার কথা ভাবছ নাকি?' মার্লোর কণ্ঠে টিটকারির সুর। 'সময় নষ্ট হবে খামোকা। নিশ্চয়ই আশা করছ না, ধর্মীয় কোনও প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়েছে যার্দিকে?'

'যদি পারো, আজ রাত বারোটায় থেকো ওখানে নিজের

লোকজন নিয়ে।'

ঝট্ করে সাবমেশিন গান তুলল সেলেনা, গরিলার দিকে তাক করেই টেনে দিল ট্রিগার।

কিছুই ঘটল না।

চওড়া একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ফ্র্যাযোর চেহারায়। ধীরেসুস্থে একধাপ একধাপ করে নামছে সে, এগোচ্ছে সেলেনার দিকে। স্লিং-এ ঝুলছে বাঁ হাতটা। ব্যাণ্ডেজ দেখা যাচ্ছে কানে।

এক কদম পিছিয়ে গেল মেয়েটা, সাবমেশিন গানের নল এখনও তাক করে রেখেছে লোকটার দিকে। আরও জোরে টান দিল ট্রিগারে।

এবারও গুলি বের হলো না অস্ত্রটা থেকে। ওটাকে জোরে ঝাঁকুনি দিল সেলেনা—যেন ঝাঁকালেই গুলি বের হবে।

ফ্র্যাযোর কাঁধ ছাড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে আরও তিনজন ষণ্ডামার্কা লোককে। ওই তিনজনের কাঁধে আরও তিনটা এসএমজি। যার যার অস্ত্র সেলেনার দিকে তাক করল ওরা, কক করল।

এতক্ষণে সেলেনা বুঝতে পারল কী ভুল করেছে সে। হতভম্বের মতো তাকাল হাতেধরা অস্ত্রটার দিকে, পরমুহূর্তে তাকাল দৈত্যের দিকে।

দ্রুত নড়ে উঠেছে ফ্র্যাযো, সেলেনার সঙ্গে যে-দূরত্ব ছিল ওর তা অতিক্রম করেছে চিতার ক্ষিপ্রতায়। ডান হাতে প্রচণ্ড এক থাবা মারল সে মেয়েটার হাতে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা, এসএমজি আলগা হয়ে গেছে। আরেক থাবায় ওটা মেঝেতে ফেলে দিল ফ্র্যাযো। তৃতীয় থাবায় মুচড়ে ধরল সেলেনার একটা হাত, এক মোচড়েই নিজের দিকে উল্টো ঘুরিয়ে ফেলল মেয়েটাকে। মুচড়ে-ধরা হাতটা ঠেসে ধরেছে সেলেনার পিঠের সঙ্গে, আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলছে।

প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে পানি চলে এল সেলেনার, ফুঁপিয়ে উঠল। যে-সেলারে ছিল সে, ওকে ঠেলতে ঠেলতে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে ফ্র্যাযো। সেলারের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকাল সে মেয়েটাকে, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। গুলতি থেকে ছোঁড়া নুড়ি পাথরের মতো ছিটকে গিয়ে বাঙ্কে আছড়ে পড়ল মেয়েটা। দুই হাত দিয়ে পতন সামলাতে গিয়ে জোর ব্যথা পেল কনুইয়ে।

কোমরে গোঁজা ছুরিটা বের করতে ইচ্ছা করছে ফ্র্যাযোর, ওটা দিয়ে প্রথমে কেটে ফেলতে ইচ্ছা করছে সেলেনার কাপড়। তারপর একটু একটু করে কাটাছেঁড়া করতে ইচ্ছা করছে মেয়েটার বুক থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত, তারপর ধরবে নাক-মুখ-চোখ-কান—একটু একটু করে নির্যাতন করে শেষ করে দিতে চাইছে সে মেয়েটাকে।

কিন্তু এখন কিছু করা যাবে না, তাই নিজের ওপর জোর খাটাতে বাধ্য হলো সে। মাতিমাসি কড়া লোক। যে-ই তার আদেশ বা নিষেধ অমান্য করে, শাস্তি হিসেবে নির্মম মৃত্যু উপহার পায় সে। এবং দলের যে বা যারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, নির্মম শাস্তি প্রযোজ্য হয় তাদের জন্যও।

যেমন এখন অস্থিসারকে শাস্তি দেবে ফ্র্যাযো। কাজটা করার জন্য মাতিমাসির অনুমতির দরকার নেই তার।

সেলারের দরজা আটকে দিল ফ্র্যাযো, লক করল...চাবির গোছা আগেই কেড়ে নিয়েছে সেলেনার কাছ থেকে। ছুরিটা বের করল, গরাদের সঙ্গে অলস ভঙ্গিতে ঘষছে ওটা শান দেয়ার কায়দায়। তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে, বেহায়ার মতো হাসছে। অথচ ওর দৃষ্টিতে একটুও লালসা নেই।

'আগে শেষ করবো তোমার পিরিতের নাগরকে,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল সে সেলেনাকে, 'তারপর ধরবো তোমাকে। ধর্ষিত হওয়ার ভয় কোরো না...কথা দিচ্ছি আমি নিজে ধর্ষণ করবো না তোমাকে, অন্য কাউকেও হাত লাগাতে

দেবো না তোমার গায়ে। আমি শুধু...' কথা শেষ না-করে ছুরি দিয়ে চাঁছতে শুরু করল একটা গরাদে।

বিশ্রী ধাতব আওয়াজে গা শিরশির করে উঠল সেলেনার। থু করে থুতু নিক্ষেপ করল সে ফ্র্যাযোর উদ্দেশে। থুতুর দলাটা ফ্র্যাযোর ধারেকাছেও গেল না।

হা-হা করে হেসে উঠল ফ্র্যাযো। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফিলিপের কাছে। ততক্ষণে চোখ মেলে তাকিয়েছে ফিলিপ।

হাতেধরা ছুরিটা দিয়ে ওকে জবাই করে ফেলল ফ্র্যাযো হাসতে হাসতে। গল-গল করে রক্তের ধারা বের হচ্ছে ফিলিপের কাটা গলা দিয়ে, সেদিকে তাকিয়ে আছে ফ্র্যাযো, হাসি মুছে যায়নি। বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যর্থতার একমাত্র শাস্তি।'

কিছুক্ষণ পর তিন সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেল সে। বাইরে থেকে তালা লাগানোর আওয়াজ পাওয়া গেল স্টিলের দরজায়।

ফিলিপের লাশ পড়ে থাকল সেলেনার সেলারের সামনে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ মেয়েটা, তারপর হড়-হড় করে বমি করে দিল।

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির প্যারিস শাখায় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল রানা। জরুরি কিছু কাজ সারল, কয়েক জায়গায় ফোন করে কথা বলল। তারপর যেভাবে এসেছিল, বেরিয়ে গেল সেভাবেই।

যাওয়ার সময় বড় একটা কালো হোল্ডঅল নিল সঙ্গে। মোটরসাইকেল ছেড়ে দিয়েছে, বদলে একটা গাড়ি নিয়েছে নিজের জন্য।

প্যাসেঞ্জার সিটের ওপর রাখল ও হোল্ডঅলটা।

একুশ

দু'পাশে সবুজ লন, মাঝখানে চওড়া ড্রাইভওয়ে। ওটা এগিয়ে গেছে সাদা পাথর আর চকচকে কাচ দিয়ে বানানো আধুনিক স্থাপত্যরীতির ভবনটার দিকে। ভবনের দু'পাশে এবং পেছনে উঁচু গাছের সারি। গেটওয়ের কাছে পাথরের লম্বা কয়েকটা পিলার আছে। একটা পিলারের গায়ে পিতলের একটা পাত আটকে দেয়া হয়েছে, তাতে লেখা আছে: ধর্ম শিক্ষালয়।

ড্রাইভওয়ে ছাড়িয়ে, লোহার সদর-দরজার বাইরে পার্ক করা আছে কয়েকটা গাড়ি। একটা গাড়ি রানার। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে ও। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বাড়িটা। খেয়াল করছে সেখানকার নিরাপত্তাব্যবস্থা।

বিভিন্ন গাছের উঁচু ডালে ক্লোয সার্কিট ক্যামেরা বসানো রয়েছে কয়েকটা, চোখ এড়াল না ওর। সদর-দরজাটা বন্ধ, বাড়ির সীমানাপ্রাচীর উঁচু। দরজার ঠিক সঙ্গেই, দেয়ালে বসানো হয়েছে আরেকটা ক্যামেরা। যেসব দর্শনার্থী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়, তাদের জন্য ওই ক্যামেরার নিচে আছে একটা বাযার।

গাড়ি থেকে বের হলো রানা, কয়েকটা ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে এল সীমানাপ্রাচীরের কাছে। উবু হয়ে বসল একটা ঝোপের আড়ালে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

সদর-দরজার ঠিক বাইরে, রাস্তার সঙ্গে লেপ্টে আছে কিছু কাদামাটি; একটা ট্রাকের টায়ারের দাগ দেখা যাচ্ছে সেখানে।

অনতিদূরের ঘেসো জমিনে দেখা যাচ্ছে কয়েক জোড়া জুতোর-ছাপ।

ঘন ঝোপ বিস্তৃত হয়েছে রানার আশপাশে; ইতিউতি তাকাতে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে উজ্জ্বল হলুদ রঙের কিছু একটা দেখতে পেল ও। এগিয়ে গেল সেদিকে। ঝোপ একটুখানি সরিয়ে দেখতে পেল, পঞ্চাশ সিসি'র একটা মোটরসাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালের সঙ্গে। ওটার সামনের দিকের মাডগার্ডের ওপর আটকানো আছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর।

নম্বরটা খেয়াল করল রানা।

ওকে যার্দির বাইকের যে-নম্বর দিয়েছিল ছেলেটার মা, হুবহু মিলে গেছে।

গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। কীভাবে কী করবে, তার একটা ছক কষে ফেলেছে মনে মনে। প্যাসেঞ্জার সিটের ওপর রাখা হোল্ডঅলটা আলগা করল। এদিকওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, আশপাশে কেউ নেই।

উবু হয়ে বসে পড়ল ও, রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিল হোল্ডঅল।

কফিব্রেক নেয়ার জন্য বের হতে যাচ্ছিল ধর্ম শিক্ষালয়ের রিসেপশনিস্ট মেয়েটা, খেয়াল করল, ক্যাপ আর ওভারঅল পরা এক ইলেকট্রিশিয়ান এগিয়ে আসছে ধীর পায়ে। লোকটার এক হাতে ছোট একটা টুলবক্স, অন্য হাতে একটা হোল্ডঅল।

ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকল মেয়েটা। 'আমি তো জানি মেরামতির সব কাজ শেষ। তোমাকে আবার খবর দিল কে?'

'কেউ খবর দেয়নি,' মুখ তুলল রানা, একটুখানি হাসল। 'কোম্পানিই পাঠিয়েছে আমাকে। এটা আমাদের রেগুলার চেকআপ—ইলেকট্রিসিটির লাইন ঠিক আছে কি না দেখতে

হয় আমাকে। কোথাও কোনও সমস্যা নজরে এলে নোট নিতে হয়, জানাতে হয় কোম্পানিকে। পরে বাড়ির মালিকের অনুমতি নিয়েই মেরামতি করা হয়, মাদমোয়াযেল।'

ইতস্তত করছে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা। রমণীমোহন চেহারার সুপুরুষ লোকটাকে কেন যেন ইলেকট্রিশিয়ানের পোশাকে মানাচ্ছে না। তা ছাড়া...এই লোকের ব্যাপারে ওকে কেউ কিছু জানায়নি...

'আমার বেশি সময় লাগবে না,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল রানা। মেয়েটার মন থেকে সন্দেহ দূর করার জন্য ল্যামিনেট করা আই.ডি. কার্ড দেখাল। তবে ওটা মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ধরে রাখল মেয়েটার চোখের সামনে।

'তোমার হোল্ডঅলের ভেতরে কী?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

আরেকবার হাসল রানা। 'এই তো...কিছু তার এবং আমার কাজে লাগার মতো হাবিজাবি জিনিস। ইলেকট্রিক মিটার আছে, আরও আছে...। দেখাবো?' বলতে বলতে হোল্ডঅলটা নামিয়ে রাখল ও, একটুখানি খুলল ওটার যিপার।

নীল-হলুদ তারের একটা গোছা যেন মাথা বের করল ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল মেয়েটা, 'আর দেখাতে হবে না। ...বেশি সময় নিয়ো না।'

এগারোটা বাজার মিনিটখানেক আগে মন্টপিলিয়ার স্কোয়্যারের সামনে থামল সাদা রঙের একটা ভ্যান।

ওটার জন্য অপেক্ষা করছিল রানা।

ভ্যানের পেছনের দরজা দুটো যেন বিস্ফোরিত হলো, সেখান দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বের হলো ষণ্ডামার্কা চারজন লোক। রানার চেহারার বর্ণনা এবং কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবে সে তা আগেই বলা হয়েছে তাদেরকে, গটমট করে হেঁটে

এগিয়ে গেল তারা ওর দিকে।

আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা। ওকে ঘিরে ধরল চারজন। একজন একটা পিস্তল ঠেসে ধরল ওর পিঠে, দরকার না থাকলেও গুঁতো মারল নল দিয়ে। ব্যথায় একটুখানি গুঙিয়ে উঠল ও।

ওয়ালথারটা সঙ্গে করে আনেনি রানা—জানে কোনও লাভ হবে না। অস্ত্রের খোঁজে তন্নতন্ন করে তল্লাশি করা হলো ওকে।

কিছুই পাওয়া গেল না ওর কাছে।

কোনও দরকার ছিল না, তারপরও ঠেলে-ধাক্কিয়ে রানাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভ্যানের কাছে। একেবারে পেছনের সিটে দুই ষণ্ডার মাঝখানে বসতে বাধ্য করা হলো।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা। টিন্টেড গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে ভ্যানের সব জানালায়। রানার ঠিক পেছনেই খাড়া করে দেয়া হয়েছে কাঠের একটা পার্টিশন বোর্ড, ভ্যানের ছাদ ছুঁয়েছে ওটা—ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালে রাস্তা দেখা যায় না। সামনের সিটে পাশাপাশি বসেছে বাকি দুই ষণ্ডা। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে রানাকে।

ভ্যানের ইঞ্জিনে সমস্যা আছে, বিশ্রী আওয়াজ আসছে। জবাব পাওয়া যাবে না জেনেও রানা বলল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

ওর সঙ্গের কেউ টুঁ শব্দটাও করল না।

প্রতিপক্ষের কাছে কী অস্ত্রপাতি আছে, খেয়াল করল রানা। একজনের হাতে আছে একটা গ্লক নাইন মিলিমিটার। আরেকজন বহন করছে একটা কেল-টেক পয়েন্ট ফোর যিরো। বাকি দু'জনের কাছে আছে স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল।

ঝাঁকি খেতে খেতে কোথায় যাচ্ছে, অনুমান করতে পারছে রানা।

মিনিট চল্লিশেক একটানা চলার পর থামল গাড়িটা। খুলে

গেল ভ্যানের একদিকের দরজা।

আরও সশস্ত্র লোক দেখা যাচ্ছে। জ্বলছে শক্তিশালী একটা টর্চলাইট, সেটার আলো ফেলা হলো রানার চোখেমুখে। উজ্জ্বল আলোর অত্যাচার থেকে চোখ বাঁচাতে হাত তুলল ও। কে যেন কর্কশ গলায় হুকুম জারি করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টেনেহিঁচড়ে নামানো হলো রানাকে ভ্যান থেকে, খাড়া করিয়ে দেয়া হলো দু'পায়ের ওপর। এদিকওদিক তাকিয়ে বুঝে নিল ও, কোনও এক আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কিং-এ দাঁড়িয়ে আছে।

পিঠে ধাতব নলের গুঁতো টের পেল রানা—হাঁটতে বলা হচ্ছে ওকে। সোজা হাঁটতে শুরু করল ও, এগিয়ে যাচ্ছে কয়েক ধাপ পাথুরে সিঁড়ির দিকে। ওটা বেয়ে হাজির হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন মেইন বিল্ডিং-এর নিচতলার করিডোরে। পেছনে জ্বলে উঠল টর্চলাইট, ওর গায়ে বাধা পেয়ে অদ্ভুত আভা তৈরি করেছে আলোকরশ্মি।

সরু করিডোরের শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে নিচু একটা দরজা। স্করপিয়ন মেশিন পিস্তলওয়ালা লোকটা রানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে, পকেট থেকে বের করল চাবির গোছা। চাবিগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলল, হালকা প্রতিধ্বনি শোনা গেল সে-আওয়াজের। দরজার তালা খুলল লোকটা।

দরজাটা নিচু হলেও ভারী—ধাক্কা দিয়ে পাল্লা সরাতে বেগ পেতে হলো স্করপিয়নওয়ালাকে। আরও কয়েক ধাপ পাথুরে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে পাল্লার ও-প্রান্তে। ওখানে কথা বলছে কারা যেন, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাদের কণ্ঠ। বোঝা যায়, বেশ প্রশস্ত একটা জায়গা আছে ওপাশে।

পিঠে আরও একবার ধাতব নলের গুঁতো খেয়ে রানা বুঝল, ওই দরজা দিয়ে ঢুকতে বলা হচ্ছে ওকে।

ঢুকল ও। অনতিদূরে একসারিতে লোহার গরাদে দেয়া

কয়েকটা সেলার দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল সবগুলোই, বিশেষ একটা সেলারের লাইট জ্বালিয়ে দেয়া হলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

ওটার বাঙ্কে শুয়ে ছিল একটা মেয়ে...ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়; উজ্জ্বল আলো টের পেয়ে চোখ খুলে তাকাল, ধড়মড় করে উঠে বসল কোনও আশঙ্কায়।

সেলেনা।

নিজের অজান্তেই সেলেনার সেলারের দিকে যাচ্ছিল রানা, দু'জন গার্ড শক্ত করে জাপ্টে ধরল ওকে, অন্য একজন তার ফায়ারআর্মের বাঁট দিয়ে আলতো বাড়ি মারল রানার ঘাড়ের পেছনে। নিভে গেল সেলারের আলো।

হুঁশ যেন ফিরল রানার।

আরও কয়েক ধাপ পাথুরে সিঁড়ির দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। এই সিঁড়ির শেষ-ধাপটা বেশ চওড়া, একসঙ্গে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে; সেটার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আরেকটা লোহার-দরজা। দরজাটা এখন খোলা। ওখান দিয়ে ভেতরে ঢোকানো হলো রানাকে, একাধিক সশস্ত্র গার্ড ছায়ার মতো আছে ওর সঙ্গে। কে বা কারা যেন রানার পেছনে ঝনঝন শব্দে লাগিয়ে দিল লোহার দরজা। তালা মারার আওয়াজ শোনা গেল।

একটা সুসজ্জিত অফিসকক্ষে নিয়ে আসা হলো রানাকে।

এই ঘরের দেয়ালগুলো সাদা রঙ করা। উজ্জ্বল নিয়নবাতি জ্বলছে মাথার ওপর, আলোকিত হয়ে আছে পুরো ঘর। রানার মুখোমুখি কাচের একটা ডেস্ক; সেটার ওপ্রান্তে বসে আছে কমপ্লিট সুট পরা গম্ভীর চেহারার এক লোক।

দু'পা আগে বাড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে বাম কোমরে ধাতব নলের গুঁতো টের পেল। থেমে দাঁড়াল ও, শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওই গম্ভীর লোকটার দিকে।

বলল, 'সামনাসামনি দেখা হওয়ায় ভালোই লাগছে, মিস্টার উসবিলিয়ানো মাতিমাসি।'

নিঃশব্দ হাসি দেখা দিল মাতিমাসির চওড়া চেহারায়। কর্কশ কণ্ঠে কড়া ইটালিয়ান টানের ইংরেজিতে বলল, 'শত্রু যত ভয়ঙ্কর হয়, তার সঙ্গে খেলতে তত মজা। তোমার সঙ্গে খেলা করে মজা পেয়েছি আমি, মাসুদ রানা।' নিজের মুখোমুখি চামড়ায়-মোড়া একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল ইশারায়। 'বসো। তাড়াহুড়ো করবে না। আমার গার্ডদের সবার ফায়ারআর্মই কক করা এবং সবাই যার যার ট্রিগারে আঙুল রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সাবধান, তোমার পক্ষ থেকে বিপজ্জনক কোনওকিছুর আভাস যেন না পায় তারা।'

চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, ধীরেসুস্থে বসল।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে মাতিমাসি। লোকটার দৃষ্টিতে একইসঙ্গে কৌতূহল, প্রশংসা, ঈর্ষা এবং ভয়। নিঃশব্দ হাসিটা মুছে গেছে চেহারা থেকে।

রানাকে কিছুক্ষণ দেখার পর উঠে দাঁড়াল মাতিমাসি, এগিয়ে যাচ্ছে একটা কেবিনেটের দিকে। স্ফটিকের সুদৃশ্য দুটো গ্লাস আর এক বোতল মার্টিনি বের করল। 'গলা ভেজাবে নিশ্চয়ই?'

'আতিথেয়তায় আপত্তি করি না আমি,' বলল রানা, 'সেটা যদি আমার শত্রুর পক্ষ থেকেও হয়।'

মুচকি হাসল মাতিমাসি, ফিরে এল ডেস্কের কাছে। 'আমাকে ইচ্ছা করলে শত্রু না-ও ভাবতে পারো।'

'কী ভাবতে পারি তা হলে তোমাকে?'

আরও একবার হাসল মাতিমাসি, জবাব দিল না রানার প্রশ্নটার। মার্টিনি-ভর্তি একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিল রানার দিকে, অন্যটা হাতে নিয়ে বসল চেয়ারে। খালিহাতের ইশারায় চলে যেতে বলল তার গার্ডদেরকে।

শব্দ করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে গার্ডরা, তখন রানা খেয়াল

করল, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মাতিমাসি।

'আমি কি বিশ্বাস করতে পারি তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'কোন্ ব্যাপারে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'গার্ডরা নেই—চালাকি করার চেষ্টা করবে না তুমি? সে-রকম কোনও মতলব যদি থেকে থাকে তোমার, আগেই জানিয়ে রাখি, কানাডিয়ান মেয়েটা রয়েছে আমাদের হাতে...নিজের চোখেই দেখে এসেছ। তুমি যদি আমার কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করো, সবার আগে মরবে ওই মেয়ে। এই মুহূর্তে একটা পিস্তল তাক করে রাখা হয়েছে মেয়েটার মাথা বরাবর।'

কিছু বলল না রানা, চুমুক দিল মার্টিনির গ্লাসে।

'আসলে...' নিজের গ্লাসে চুমুক দিল মাতিমাসিও, 'তোমার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলার জন্য এভাবে ডেকে এনেছি তোমাকে।'

'শুনছি।'

'প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপিটা আছে তোমার কাছে, না?'

'হ্যাঁ, আছে। সেলেনাকে ছেড়ে দাও, পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছ থেকে বুঝে নাও।'

হা-হা করে হেসে উঠল মাতিমাসি। 'ছেড়ে দেবো? এত কাঠখড় পুড়িয়ে ধরে আনলাম ছেড়ে দেয়ার জন্যে? দেখো, রানা, আমি বাজে বকার লোক নই। প্ল্যান করেছিলাম, একদিক দিয়ে পাণ্ডুলিপিটা পাবো তোমার কাছ থেকে, আরেকদিক দিয়ে আমার লোকেরা খুলি উড়িয়ে দেবে ওই মেয়ের।'

'যদি তা-ই করো...' আরেক চুমুক মার্টিনি খেল রানা, 'তোমাকে নিজের হাতে খুন করবো আমি। বিশ্বাস করতে পারো কথাটা।'

'আমি কিন্তু বলেছি "প্ল্যান করেছিলাম"। তোমাকে

দেখার পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি।’

‘দয়া করে বোলো না আমি জাদু করেছি তোমাকে।’

‘আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি,’ রানার টিটকারি গায়ে মাখল না মাতিমাসি, ‘তোমাকে মরতে দেবো না। অবশ্য...কিছু শর্তসাপেক্ষে...বলা বাহুল্য।’

‘তুমি যেমন সুন্দর, তেমনই জ্ঞানী।’

চেহারা গম্ভীর হলো মাতিমাসির। ‘তোমার মতো লোক আমার কাজে আসতে পারে।’

মার্টিনির গ্লাস খালি করল রানা। ‘ও-রকম ধারণা কেন হলো তোমার?’

‘তোমাকে এবং সেলেনাকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছি আমি কয়েকবার। লাভ হয়নি। তুমি প্রমাণ করেছ, তোমাকে শেষ করে দেয়াটা সহজ কাজ নয়। প্রমাণ করেছ, নিঃসন্দেহে তুমি শক্তপাল্লা।’

‘তো?’

‘আমার যা উদ্দেশ্য, সেটা সফল করতে ঠিক তোমার মতো লোকই দরকার। আমি চাই, তুমি আমার দলে যোগ দাও, আমার হয়ে কাজ করো।’

‘তোমার দল মানে ঈশ্বরের তরবারি?’

মাথা ঝাঁকাল মাতিমাসি। ‘এই দল নিয়ে অনেক বড় পরিকল্পনা আছে আমার। তুমি সেই পরিকল্পনার অংশ হতে পারো। হাত মেলাও আমার সঙ্গে, তোমাকে মালামাল বানিয়ে দেবো।’

রানা কিছু বলল না, তাকিয়ে আছে মাতিমাসির দিকে। নিজের পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছে।

‘হ্যাঁ অথবা না বলার আগে চলো আমার সঙ্গে,’ বলে চলল মাতিমাসি, ‘কিছু একটা দেখাই তোমাকে। আমার সঙ্গে হাঁটতে আপত্তি নেই তো?’

জবাব দিল না রানা, উঠে দাঁড়াল।

'শুধু খেয়াল রেখো...নো ট্রিকস।'

মাতিমাসির পিছু পিছু অফিসরুম থেকে বেরিয়ে করিডোরে চলে এল রানা। সশস্ত্র প্রহরীরা অফিসরুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দূরে কোথাও যায়নি; অফিসরুমের দরজার ঠিক বাইরেই অপেক্ষা করছিল। মাতিমাসির পেছনে রানাকে দেখে অস্বস্তি ফুটল তাদের চোখেমুখে, ট্রিগারে হাত চলে গেল সবার। ইশারায় তাদেরকে শান্ত থাকতে বলল মাতিমাসি।

রানাকে নিয়ে একটা লিফটের ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা, ওর গার্ডরাও সঙ্গে আছে। বোতামে চাপ দিল সে, হুশ জাতীয় একটা আওয়াজ শোনা গেল নিচের কোনও এক জায়গা থেকে।

রানা বলল, 'সামান্য এক পাণ্ডুলিপির জন্য কেউ এতকিছু করে না। আরও কোনও উদ্দেশ্য আছে তোমার।'

মাথা ঝাঁকাল মাতিমাসি। 'ঠিক। তবে অ্যালকেমির ওপর আমার আগ্রহ কিন্তু অনেক বছরের।'

'কেন? যারা অ্যালকেমির চর্চা করে তারা ধর্মদ্রোহিতা করে—সেজন্য?'

দাঁত দেখা গেল মাতিমাসির। 'না।'

'তা হলে?'

'অ্যালকেমি থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা নিতে চাই আমি।'

মসৃণ গতিতে চলে একসময় থামল লিফটটা, ঝাঁকুনি টের পাওয়া গেল না। দরজা খুলে যেতেই বের হলো মাতিমাসি। রানাও বের হলো, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। বুঝতে সময় লাগল না, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা গবেষণাগারে এসে হাজির হয়েছে।

জনা পনেরো টেকনিশিয়ান কাজ করছে এখানে। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত তাদের সবাই। কেউ বসে আছে কম্পিউটারের সামনে, কারও হাতে কী-সব চার্ট।

সবার পরনে সাদা ল্যাবকোট, চেহারা গম্ভীর।

'আমার রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে স্বাগতম, মিস্টার মাসুদ রানা,' ঢং করে বলল মাতিমাসি। 'দেখতেই পাচ্ছ, সেলেনা বার্নহার্টের ল্যাবরেটরির চেয়ে আমার ল্যাবরেটরি বহুগুণে উন্নত। এখানে যেসব বিজ্ঞানী কাজ করে, শিফটিং ডিউটি তাদের সবার। অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ চলছে আমার এখানে।' রানার কনুই ধরে ওকে ল্যাবরেটরির এক কোনায় নিয়ে গেল সে।

ওদের দু'জনের সঙ্গে ছায়ার মতো সেঁটে থাকল সতর্ক প্রহরীরা।

'অ্যালকেমির ব্যাপারে তুমি কী জানো, জানি না,' বলছে মাতিমাসি। 'তাই কিছু কথা বলতে চাই তোমাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসে গড়ে উঠেছিল একটা গুপ্তসংঘ। ওদের কাজ ছিল...'

'বিখ্যাত সব অ্যালকেমিস্টের ওপর নজর রাখা,' বলে উঠল রানা, 'তাঁদের কে কী-নিয়ে কাজ করছেন সে-খবর জোগাড় করা, এবং ক্ষেত্রবিশেষ তাঁদের কাউকে কাউকে গায়েব করে দেয়া।'

একই সঙ্গে প্রশংসা আর বিস্ময় ফুটল মাতিমাসির দৃষ্টিতে। 'যত সময় যাচ্ছে, তোমার কাজে আর কথায় ততই মুগ্ধ হচ্ছি। ওই দলের ব্যাপারে শুনেছে, এ-রকম লোকের সংখ্যা হাতেগোনা।'

'আমি তাদের মধ্যে একজন।'

'তা হলে নিশ্চয়ই জানো, যেনতেন লোককে নিজেদের সদস্য বানাত না ওরা। বেছে বেছে এমন সব লোককে দলে ভেড়াত, যাদের ভেতরে সহজাত প্রতিভা আছে।'

কী বলার জন্য এত ভূমিকা করছে মাতিমাসি, বুঝে গেল রানা। 'তুমি কি প্যানাসেলসাসের শিক্ষানবিশ আনসেলের কথা বলতে চাইছ?'

এবার মাতিমাসিকে দেখে মনে হলো, চমৎকৃত হয়েছে। 'তুমি আসলে অনেক খবর রাখো, রানা। যা-হোক, আনসেল মেধাবী ছিল; প্যানাসেলসাসের অধীনে কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে, দারুণ কিছু-একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন ওর শিক্ষক। ওই আবিষ্কারের ব্যাপারে আগ্রহী আরও একজন সদস্য ওদের গুপ্তসংঘে...'

'নাম গুস্তাভ,' বলে উঠল রানা। 'নাহ্, মাতিমাসি, হতাশ হচ্ছি তোমার কথায়। ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে ধন্য হবো, অথচ দেখা যাচ্ছে নতুন কিছুই জানাতে পারছ না তুমি আমাকে। যা-হোক, তারপর?'

প্যারিসের শহরতলীতে খালি একটা গুদামের সামনে নিজের গাড়ি পার্ক করল এনযো।

তার নামের বাকিটা কখনও জানতে পারেনি অথবা জানার সুযোগ পায়নি কেউ। কেউ জানে না, নামটা আসল নাকি নকল।

আজ সন্ধ্যার পর থেকেই ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, রাতের এই প্রহর হিমশীতল মনে হচ্ছে। শহরের জ্বলন্ত বাতিগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে কেমন টিমটিমে মনে হচ্ছে আকাশের তারাগুলোকে।

হাতঘড়ি দেখল এনযো, পা ঠুকল রাস্তায়। অপেক্ষা করছে।

ওর হাতের ব্রিফকেসে আছে সিকি মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। যে-লোক ফোন করেছিল এনযোকে, সে ওই পরিমাণ টাকাই দাবি করেছিল।

বিনিময়টা তেমন জটিল কিছু না: দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা এবং মুখের ভেতরে কাপড়ের গোঁজ ভরা অবস্থায় মাসুদ রানাকে হস্তান্তর করা হবে এনযোর কাছে, একইসঙ্গে বুঝে নেয়া হবে ডলারভর্তি ব্রিফকেসটা।

এনযো ভাবছে, অসহায় মাসুদ রানাকে নিয়ে যখন মাতিমাসির কাছে যাবে সে, ওর ওপর দারুণ খুশি হয়ে যাবে লোকটা।

বলা বাহুল্য, ব্রিফকেসের প্রতিটা ডলার জাল। কিন্তু এনযোর জ্যাকেটের নিচে শোল্ডার হোলস্টারে যে পয়েন্ট ফোর ফাইভ অটোমেটিকটা আছে, সেটা খাঁটি জিনিস। ওর ইচ্ছা আছে, মাসুদ রানাকে বুঝে পাওয়ামাত্র, তাকে নিয়ে আসবে যে-লোক, তার ওপর খালি করবে ফোর ফাইভের পুরো ম্যাগাজিন।

কেউ যদি খালিহাতে আসে...অর্থাৎ মাসুদ রানাকে সঙ্গে নিয়ে না-আসে, যদি পুরো ব্যাপারটা একটা ধোঁকাবাজি হয়, তা হলেও অস্ত্রটা ব্যবহার করার ইচ্ছা আছে ওর।

জে ফক্সের ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারেনি এনযো। প্যারিস পুলিশ যেখানে দাবি করছে খুন করা হয়েছে তাকে, সেখানে সে ফোন করে জানাচ্ছে, বেঁচে আছে। এবং শুধু বেঁচেই নেই, মাসুদ রানাকে পাকড়াও করে ফেলেছে।

তারমানে লোকটাকে কি খাটো করে দেখেছিল এনযো? এসব কাজের জন্য গোবেচারা চেহারার ওই লোক আসলে যথেষ্টের চেয়ে বেশি?

জানে না এনযো...সে আসলে বুঝতে পারছে না কী ঘটছে। তবে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, কেউ যদি ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে তাকে, ওই লোকের বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে সে।

এবং সে-লোক যদি সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসে, তা হলেও ব্যবস্থা আছে এনযোর কাছে। নাইট-স্কোপ্ ফিট করা সাত দশমিক ছয় দুই মিলি-মিটারের স্নাইপার রাইফেল-সহ প্রস্তুত অবস্থায় রেখেছে সে একজন লোককে। গুদামের ছাদে অবস্থান নেয়ার কথা লোকটার...এতক্ষণে হয়তো পজিশন নিয়েও ফেলেছে। কারণ এখানে আসার আগে ওই লোককে

ফোন করেছিল এনযো, কীভাবে কী করতে হবে সব বুঝিয়ে বলেছে।

মিনিট দুয়েক বাদে একটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল এনযো। হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে, গাড়িটা এদিকেই আসছে।

বেহাল দশার একটা ভ্যান এসে থামল অনতিদূরে। ড্রাইভিং সিটের সঙ্গের দরজা খুলে যে-লোক নামল, সে ফক্স নয়, অন্য কেউ—মোটা আর বেঁটে এক লোক; গোঁফ আছে, মাথায় বাহারি ক্যাপ পরেছে।

তারমানে, ভাবল এনযো, জে ফক্সও আগে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

কাছে এসে দাঁড়াল মোটা লোকটা। 'তুমি এনযো?'

'মাসুদ রানা কোথায়?' ব্যবসায়িক আলাপ ছাড়া অন্য কোনও কথা বলতে চায় না এনযো।

দাঁত দেখা গেল মোটুর। 'টাকা এনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল এনযো।

ঘুরল মোটু, এগিয়ে যাচ্ছে ভ্যানের দিকে।

মুচকি হাসল এনযো। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, ওর স্নাইপার এতক্ষণে নিশানা করে ফেলেছে মোটুকে।

ভ্যানের পেছনের দরজা খুলল মোটু। আগে বাড়ল এনযো, উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে কী আছে ভ্যানের ভেতরে।

একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। তার দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মুখে কাপড় গোঁজা।

বজ্রপাতের আওয়াজে যেভাবে চমকে ওঠে লোকে, সেভাবে চমকে উঠল এনযো।

হাত-বাঁধা আর মুখে-গোঁজ ভরা ওই লোক মাসুদ রানা নয়।

লোকটা এনযোর সেই স্নাইপার।

সংবিৎ যতক্ষণে ফিরে পেল এনযো, ততক্ষণে ওর চাঁদিতে পিস্তল ঠেসে ধরেছে মোটু, অর্থাৎ রিগল্ট—প্যারিস পুলিশের একজন লেফটেন্যান্ট। এবং খালি ওই গুদামের ভেতর থেকে পিঁপড়ের মতো পিল পিল করে বের হচ্ছে আরও অনেক সশস্ত্র পুলিশ।

যার যার রাইফেলের লেযার লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে পুলিশের মার্কসম্যানরা, অবস্থান নিয়েছে তারা বিভিন্ন সুবিধাজনক জায়গায়; নিজের চাঁদি আর জ্যাকেটের এখানে-সেখানে অনেকগুলো লাল বিন্দু টের পাচ্ছে এনযো। নড়ছে না সে—নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে আসলে; কোত্থেকে কী হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না।

রিগল্ট বেঁটে হলেও তার গায়ে মহিষের জোর; এনযোর শোল্ডার হোলস্টার থেকে পয়েন্ট ফোর ফাইভ অটোমেটিক পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে একাই ওকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল ভ্যানের কাছে, বলতে গেলে ছুঁড়ে মারল ভেতরে—সেই স্নাইপারের পাশে। তারপর নিজে ভেতরে ঢুকে হাতকড়া পরিয়ে দিল এনযোর দু'হাতে। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় কী কী আইনি অধিকার আছে এনযোর, তা দ্রুত শুনিয়ে দিল তাকে। নেমে এল ভ্যান থেকে, দরজা লাগিয়ে দিয়ে ফোন করল মার্লোকে।

ও-প্রান্তে কল রিসিভ করল মার্লো। 'বলো, কী খবর।'

'মাছ টোপ গিলেছে,' বলল রিগল্ট।

বাইশ

মাতিমাসির সঙ্গে তার অফিসে ফিরে এসেছে রানা, মুখোমুখি বসেছে দু'জনে। গার্ডরা দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। নিজের আর রানার জন্য আবারও ড্রিঙ্ক ঢালল মাতিমাসি।

'শুধু ওই গুপ্তসংঘেই না,' বলল রানা, 'নাৎসি বাহিনীতেও ছিল গুস্তাভ।'

মাথা ঝাঁকাল মাতিমাসি। 'সে আসলে ছিল হিটলারের পুরনো সহচর এবং ডেপুটি। প্রথাবিরোধী কাজকর্মে খুব উৎসাহ ছিল তার। বড় হয়েছে মিশরের আলেকযান্দ্রিয়ায়। সে যখন কিশোর, তখন তাদের পুরো পরিবার চলে আসে ইউরোপে। উনিশ শ' বিশ সালের দিকে আনসেলের কাছ থেকে অ্যালকেমির গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে পারে সে। তখন ন্যাশনাল সোশালিস্ট পার্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে দম ফেলার ফুরসত নেই তার। যা-হোক, যে-গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল গুস্তাভ, তার গুরুত্ব বুঝতে সময় লাগেনি তার, তাই কথাটা জানায় সে হিটলারকে।'

মন্তব্য করল না রানা।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই অ্যালকেমিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে নাৎসিরা,' বলছে মাতিমাসি। 'ওরা একটা সাম্রাজ্য গড়তে চাইছিল, আর সেটার জন্য কাজে লাগাতে চাইছিল অ্যালকেমির বিশেষ একটা বিদ্যাকে। সেই উদ্দেশ্যে "কোম্পানি ওয়ান সিক্সটি ফোর" নামে বিশেষ

একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটিও গঠন করেছিল। অ্যালকেমির বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা করাই ছিল ওই ফ্যাসিলিটির কাজ।'

'বিশেষ সেই বিষয়টা কী?'

'পদার্থের ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন।'

'সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সাম্রাজ্য গড়তে চাওয়ার সম্পর্ক কী?'

দাঁত দেখা গেল মাতিমাসির। ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলল সে, বের করে আনল চকচকে কিছু-একটা। জিনিসটা ভারী, তাই সাবধানে নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর, রানার সামনে।

সোনার বারটা কিছুক্ষণ দেখল রানা। 'কী এটা?'

'আনসেলের ফাঁস করা গুপ্তবিদ্যার ফসল।'

ওই বারের দিকে আবারও তাকাল রানা। যতটা সোনালি দেখানোর কথা, ততটা দেখাচ্ছে না জিনিসটা...নিয়ন আলোর কারণে হতে পারে। নাৎসি বাহিনীর স্বস্তিকার প্রতীক দেখা যাচ্ছে বারের গায়ে।

মাতিমাসির দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কি মজা করছ আমার সঙ্গে?'

'মোটেও না। নাৎসি বাহিনীর যে-ফ্যাসিলিটির কথা বললাম, সেটার আসল কাজ ছিল অ্যালকেমিকাল পদ্ধতিতে সোনা বানানো...আসলে, অন্য ধাতু অথবা ধাতব পদার্থকে সোনায় রূপান্তরিত করা।'

'যেমন?'

'মূলত আয়রন অক্সাইড আর কোয়ার্টয। ...প্যানাসেল-সাসের গুপ্তবিদ্যা গুস্তাভের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল আনসেল, আর গুস্তাভ সেটা জানিয়েছিল হিটলারকে।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওই গুপ্তবিদ্যা জেনে গিয়েছিল নাৎসিরা? এবং সেটা কাজে লাগিয়েছিল সফলভাবে?'

'প্রমাণ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ।'

'পাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের কিছু নাৎসি-ডকুমেন্ট পেয়েছিলাম আমি। সেগুলো পড়ে জেনেছি, উনিশ শ' আটাশ সালে বার্লিনের বাইরের এক জায়গায়, কোম্পানি ওয়ান সিক্সটি ফোরের প্ল্যান্টে, নাৎসি বাহিনীর কয়েকজন বড় কর্তা নিজচোখে দেখেছেন অ্যালকেমিকাল পদ্ধতিতে সোনা উৎপাদনের কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় ওই প্ল্যান্ট, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে কোম্পানি ওয়ান সিক্সটি ফোর। আজও কেউ জানে না, ওই ফ্যাসিলিটি কাজে লাগিয়ে ঠিক কী পরিমাণ সোনা উৎপাদন করতে পেরেছিল নাৎসিরা, এবং সে-সোনা ঠিক কী কাজে ব্যবহার হয়েছিল।'

'তুমি বলতে চাইছ, নাৎসিদের টাকার উৎস ছিল অ্যালকেমিকাল সোনা?'

'বলাবলির কী আছে, আমি জানি ঠিক তা-ই ঘটেছিল। ...মিত্রবাহিনী যখন বার্লিন দখল করে, স্বস্তিকা প্রতীকযুক্ত কয়েক টন সোনার বার উদ্ধার করে। অনেকের ধারণা, আজও প্রচুর সোনার-বার অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। ...তুমি আবার মনে কোরো না, ওই সব বার বানানো হয়েছিল ইহুদিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া সোনা দিয়ে। যে-পরিমাণ সোনার কথা বলছি, এমনকী ষাট লক্ষ ইহুদির কাছ থেকেও অত সোনা পাওয়া সম্ভব ছিল না নাৎসি বাহিনীর পক্ষে।'

'এসব তা হলে জানাজানি হলো না কেন?'

'পুরো ব্যাপারটা স্রেফ ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। কেউই চায়নি, হিটলার যে অ্যালকেমিকাল পদ্ধতিতে সোনা উৎপাদন করছিল, তা জানাজানি হোক।'

'কেন?'

'তাতে হুমকির মুখে পড়ত বিশ্ব-অর্থনীতি। আয়রন অক্সাইড আর স্ফটিক কাজে লাগিয়ে দেদারসে বানানো

হয়েছে সোনা...প্রাকৃতিক সোনার কোনও দামই থাকত না...পৃথিবীর সব দেশের সোনার মজুদ মূল্যহীন হয়ে যেত। বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?'

'তুমি কেন হাসিল করতে চাও প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপি? নতুন হিটলার হওয়ার খায়েশ জেগেছে মনে?'

'ওভাবে না-বলে তুমি বলতে পারো, অল্প পরিশ্রমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে যাওয়ার একটা উপায় জানতে পেরেছি। আর টাকা মানেই ক্ষমতা...ক্ষমতা মানে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল মাতিমাসি।

'টাকার অভাব তোমার আছে বলে তো মনে হয় না।'

'তা অবশ্য নেই, কিন্তু আমি আরও চাই। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন অঙ্কের ফাণ্ড জমা হয় ঈশ্বরের তরবারির অ্যাকাউন্টে...দাতাদের মধ্যে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাও আছে। তারপরও...আমার চাহিদা আরও অনেক।'

'কেন? নতুন কোনও হিটলারি প্ল্যান বাস্তবায়ন করার জন্যে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাতিমাসি। 'হিটলারের প্ল্যানের সঙ্গে আমার প্ল্যানের কোনও সম্পর্ক নেই। যা-হোক, আমার বিশ্বাস, সাধারণ ধাতুর ভৌত-রাসায়নিক গঠন বদলে দিয়ে সেটা কীভাবে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়, সে-বর্ণনা দিয়ে গেছেন প্যানাসেলসাস তাঁর পাণ্ডুলিপিতে।'

কিছু না বলে হাতঘড়ি দেখল রানা।

'প্যানাসেলসাসের গুপ্তবিদ্যার সংখ্যা আসলে এক নয়, দুই। তিনি যখন বুঝতে পারেন তাঁর সোনা-বানানোর-বিদ্যা ফাঁস হয়ে গেছে, উধাও হয়ে যান; গায়েব হয়ে যায় তাঁর আরেকটা মহামূল্যবান আবিষ্কার।'

কী বলবে মাতিমাসি, অনুমান করতে পারছে রানা।

'আমার বয়স ষাট। চিরজীবন বেঁচে থাকবো না। আমি চাই না, আমার অবর্তমানে আমার এত কষ্টের ফসল গিয়ে

পড়ুক অনুপযুক্ত কারও হাতে, কারণ সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে পারে ওই লোক। ঈশ্বরের তরবারির নেতৃত্ব দিতে চাই আমি আরও কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর, কিংবা তারও বেশি। মরার আগে দেখে যেতে চাই, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে।'

'তাই খোঁজ করছ প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপির, যেটাতে তিনি লিখেছেন এমন এক মহৌষধের কথা, যা খেলে অমরত্ব পাওয়া সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকাল মাতিমাসি। 'নিজের জন্য ওই মহৌষধ ব্যবহার করতে চাই আমি। পাশাপাশি চাই, ওই গুপ্তবিদ্যা যেন জানাজানি না হয়। ...আমার গুপ্তচরেরা যখন খবর দিল সেলেনা ওই মহৌষধ আবিষ্কারের কত কাছাকাছি চলে গেছে, মেয়েটাকে খুন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই আমি।'

'তোমার গুপ্তচরেরা ভুল খবর দিয়েছে। সেলেনা অমরত্বের-মহৌষধ আবিষ্কারের ধারে-কাছেও যেতে পারেনি।'

'হয়তো। তবে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল সে। নিজের গবেষণার খবর সারা দুনিয়াকে জানানোর দরকারটা কী ছিল? অ্যালকেমি দু'চোখে দেখতে পারে না এ-রকম লোকের সংখ্যা যেমন কম না, তেমনি অ্যালকেমির প্রতি আগ্রহী লোকও কিন্তু হাতেগোনা নয়।'

'এক কাজ করলেই পারতে। তোমার রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে চাকরি দিয়ে দিতে পারতে মেয়েটাকে।'

শীতল হাসি দেখা দিল মাতিমাসির চেহারায়। 'লাভ হতো না।'

'কেন?'

'আমার রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে যারা কাজ করছে, তারা সবাই ঈশ্বরের তরবারির সদস্য। আমাদের সবার বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ এক। কিন্তু সেলেনা সে-রকম না। সে

একরোখা—যা ভালো বোঝে তা-ই করে। ও-রকম মানুষ নিজের মর্জিমতো চলে, চাকরি তাদের ধাতে সয় না।'

'এখনও ওকে বাঁচিয়ে রেখেছ কেন?'

'কারণ তোমার সঙ্গে কথা শেষ হয়নি আমার।'

'তোমার হয়ে কাজ করতে হবে আমাকে?'

'হ্যাঁ। একটা সেনাবাহিনী গঠন করছি আমি। তোমার মতো লোক চাই। তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি, এবং সেটা পছন্দ হয়েছে আমার। আমি চাই, ঈশ্বরের তরবারির মিলিটারি কমাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করো তুমি।'

হেসে ফেলল রানা।

'অঢেল টাকাপয়সা দেয়া হবে তোমাকে,' বলছে মাতিমাসি, 'ক্ষমতা দেয়া হবে। প্রতি রাতে নতুন নতুন মেয়েমানুষ পাবে। যা-খুশি তা-ই চাইতে পারবে আমার কাছে।'

'কিন্তু সেলেনার মতো আমিও যদি একরোখা এবং ঈশ্বরের তরবারির সদস্য না হই?'

'তোমার মতো ব্যতিক্রমী প্রতিভার সন্ধান যখন পাই আমি, তাদের জন্য নিজের নিয়মের ব্যতিক্রম করি।'

'যদি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ না করি?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাতিমাসি। 'সেলেনা মরবে। তুমিও। আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করে আসলে কোনও উপায় নেই তোমার, রানা।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। একজন আর্চবিশপ হয়েও কেন সেনাবাহিনী গড়তে চাইছ? ক্ষমতার স্বাদ ইতিমধ্যেই পাওয়া হয়ে গেছে তোমার। চেষ্টাচরিত্র করলে আজ বাদে কাল পোপও হতে পারো। তা হলে?'

'তুমি কি মনে করো চার্চের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ আছে আমার? পোপ হওয়ারও কোনও খায়েশ নেই। আর্চবিশপের

বেশভূষা আমার জন্য মুখোশ ছাড়া কিছুই না আসলে। ...আমি পোপের ক্ষমতার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতা চাই।'

'এত ক্ষমতা দিয়ে কী করতে চাইছ তুমি আসলে, মাতিমাসি? তোমার দল এসপিওনাজ, মগজধোলাই, খুন আর অপহরণ ছাড়া আর কিচ্ছু করছে না। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে এসব কী করছ তোমরা?'

'বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন আনতে চাই আমি পৃথিবীতে। বিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে ওটা সম্ভব নয়, কারণ বিজ্ঞান পচে গেছে। এখনকার বিজ্ঞানীরা মানুষের উপকারের চেয়ে নিজেদের পকেটের কথা আগে ভাবে। পচে গেছে প্রযুক্তিও...বড় বড় দেশগুলো প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে অন্যান্য দুর্বল দেশের ওপর। ...এখন বৈপ্লবিক কোনও নেতার দরকার পৃথিবীতে। আমিই হতে চাই সেই নেতা।'

'কীসের নেতা? কোন্ কাজে নেতৃত্ব দিতে চাও তুমি?'

রানার প্রশ্নে যেন জ্বলে উঠল মাতিমাসির চোখ, দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল সে ডেস্কের ওপর। 'আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে চার্চ যাদেরকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তারা সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে; আমি চাই না ওই লোকগুলো মাথা তুলে দাঁড়াক। আমি যদি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি, আমার হুকুমে চলবে, আমার ইচ্ছা পূরণ করবে ঈশ্বরের তরবারি।'

'এবং তোমার ধারণা তাতেই বদলে যাবে পুরো পৃথিবী?'

'আমার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই তোমার, তাই বললে কথাটা। ঈশ্বরের তরবারি শুধু ফ্রান্সেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে আমাদের কাজকর্ম যা দেখেছ তুমি, তা আসলে সাগরের একফোঁটা জল।'

'বলতে চাইছ, ঈশ্বরের তরবারি একটা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি?'

‘হুঁ। ইউরোপ, আমেরিকা, এমনকী এশিয়াতেও আমাদের অনেক এজেন্ট আছে। বিভিন্ন দেশের বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং সেনাকর্মকর্তাও আমাদের মিত্র। রানা, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী যখন গঠিত হয়ে যাবে, হিটলারের মতো আমিও মনের মত রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হবো আশা করি।’

‘তারপর? চার্চের বিরুদ্ধে যারা আছে তাদেরকে আবার গুঁড়িয়ে দেবে?’

‘সম্ভবত। একজন পোপ যা পারেন না, পোপ না-হয়েও তা করে দেখাতে চাই আমি।’

‘তারমানে...তোমার কথা বুঝতে যদি অসুবিধা না হয়ে থাকে আমার...তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে চাইছ।’

মাথা ঝাঁকাল মাতিমাসি। ‘অনেক কথা হলো। এবার পাণ্ডুলিপিটা দাও দেখি।’

‘তোমাকে দেয়ার জন্য ওটা সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি। আমাকে অত বোকা ভাবলে কী করে?’

লাল হয়ে গেল মাতিমাসির চেহারা। ‘কোথায় আছে ওটা?’

জবাব দিল না রানা।

‘দেখো, রানা, আমার সঙ্গে খেলা করার চেষ্টা কোরো না। ফল ভালো হবে না।’

হাতঘড়ি দেখল রানা। ‘এই মুহূর্তে আমার এক সহযোগীর কাছে আছে ওটা। ওকে বলেছি, রাত ঠিক দেড়টায় ফোন করবো ওকে। যদি কোনও কারণে ফোন করতে না-পারি, সে ধরে নেবে আমার মৃত্যু হয়েছে। তখনই পুড়িয়ে ফেলবে সে ওটা।’

ডেস্কের ওপর রাখা ঘড়িটা দেখল মাতিমাসি, আরও লাল হয়েছে চেহারা। ‘তোমার কপালে মরণ আছে, মাসুদ রানা।’

কিছু বলল না রানা।

একথাবায় ডেস্কে-রাখা ফোনের রিসিভার তুলে নিল মাতিমাসি, বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'নাও, এখন ফোন করো তোমার সেই সহযোগীকে। নইলে নিজে মরার আগে শুনতে পাবে সেলেনার চিৎকার—চরম অত্যাচার করে মারবে ওকে আমার লোকেরা।'

কিছু বলল না রানা, কিছু করলও না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মাতিমাসির দিকে। আরও অধৈর্য করে দিতে চাইছে লোকটাকে।

'কী হলো?' খেঁকিয়ে উঠল মাতিমাসি। 'তাকিয়ে আছ কেন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা, এগিয়ে গিয়ে নিল রিসিভারটা। সময় নিয়ে চাপ দিচ্ছে ডায়ালপ্যাডে। শেষ বাটনটা চাপার আগে বলল, 'তোমার প্রস্তাবের জবাব পেয়ে যাবে এখনই।'

মাতিমাসি হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে।

অজানা আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেল ওর দুই চোখ।

"ধর্ম শিক্ষালয়ের" বাইরে নিজের বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছে মার্লো।

'একা একটা লোক,' নিচু গলায় মার্লোকে বলল ওর এক সহকারী, 'কী করতে পারবে অত লোকের বিরুদ্ধে? আমাদের জন্য অপেক্ষা করলে ওর সমস্যাটা কী ছিল?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্লো। 'কখনও কখনও আইনের জন্য অপেক্ষা করা যায় না।'

'মানে?'

'মাসুদ রানা যা করতে গেছে, আমরা সবাই মিলেও তা করতে পারতাম না।'

'কেন?'

'ধর্ম শিক্ষালয়ের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই আমাদের

কাছে, কোনও পরোয়ানা নেই। এনযো ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও অনেক কথাই বের করা যায়নি ওর পেট থেকে। ওদিকে সুতোয় ঝুলছে সেলেনা আর যার্দির জীবন...ওদেরকে এতক্ষণে মেরে ফেলা হয়েছে কি না তা-ও জানি না।' আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্লো। 'কখনও কখনও আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হয়। ঠিক তাই করছে রানা।'

টেলিফোন লাইনের সঙ্গে একটা মেসেজ-ট্রান্সমিটিং-ডিভাইস লাগিয়ে দিয়েছে রানা। টেলিফোনে নির্দিষ্ট একটা নম্বর চাপলে চালু হয়ে যাবে ওই ডিভাইস, সিগনাল পাঠাতে শুরু করবে। সে-সিগনাল ধরতে পারবে এ-রকম আটটা ইলেকট্রিকাল ডেটোনেটর বসিয়ে দিয়েছে ও "ধর্ম শিক্ষালয়" বিল্ডিং-এর আট জায়গায়। ওই ডেটোনেটরগুলোর সঙ্গে তার দিয়ে সংযুক্ত করে দিয়েছিল পিবিএক্স প্লাস্টিক-বণ্ডেড হাই-পাওয়ার এক্সপ্লোসিভ।

টেলিফোন কোম্পানির মেকানিকের ছদ্মবেশে কাজটা করেছে রানা।

শেষ বাটনটা চেপেছে কি চাপেনি, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেল, কেঁপে উঠল পুরো বিল্ডিং। মাতিমাসির অফিসরুমের একদিকের ছাদ ভেঙে পড়ল, ধসে পড়ল দু'দিকের দেয়াল। টের পাওয়া গেল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কিং-এ আগুন লেগে গেছে। সেখানে পার্ক-করে-রাখা প্রতিটা গাড়ির পেট্রোলট্যাঙ্ক পরিণত হয়েছে একেকটা আগুনেবোমায়।

চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, মরণ আর্তনাদ করছে মাতিমাসির কোনও কোনও গার্ড। বিস্ফোরণের জোরালো ধাক্কায় উড়ে গেছে মাতিমাসির সাধের ল্যাবরেটরি, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সমস্ত বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রপাতি আর কম্পিউটার।

পড়ে গিয়েছিল রানা, উঠে দাঁড়াল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় একদিকে অনেকখানি সরে গেছে মাতিমাসির ডেস্ক। এখনও নিজের চেয়ারে বসে আছে লোকটা, যা ঘটেছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না, চোখ বড় বড় করে দেখছে রানাকে। শকওয়েভের ধাক্কায় বাতাস বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ধোঁয়া আর ধুলোয় আচ্ছন্ন করিডোর ধরে কাশতে কাশতে এগিয়ে আসছে মাতিমাসির পা-চাটা কুকুররা, প্রত্যেকের হাতেই ফায়ারআর্ম আছে।

একটা চেয়ার তুলে নিয়ে আগে বাড়ল রানা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙে গেছে দরজার পাল্লা; একদিকে সরে দাঁড়াল ও, মাথার ওপর তুলে ধরেছে চেয়ারটা। ওর দিকে নির্বাক দর্শকের মতো তাকিয়ে আছে মাতিমাসি। নিজের এত সাধের প্রতিষ্ঠান মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হয়ে গেছে বুঝতে পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

দরজা দিয়ে প্রথম যে-গার্ড ঢুকল, তার মাথায় নির্দয়ের মতো চেয়ারটা ভাঙল রানা। প্রচণ্ড আঘাতে চাঁদি ফেটে গেল লোকটার, আছড়ে পড়ল সে মেঝেতে, আছড়ে পড়ল ওর স্করপিয়ন মেশিন পিস্তলও। চেয়ারটা ফেলে দিল রানা, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে, গড়ান দিয়ে এগিয়ে চলেছে পিস্তলের দিকে।

দ্বিতীয় আরেক গার্ড উদয় হলো দরজার কাছে, নিজের মেশিন পিস্তলের চেম্বার খালি করছে ঘরের ভেতরটা নিশানা করে। বেশিরভাগ বুলেট গিয়ে লাগল মাতিমাসির ডেস্কে, চুরমার হয়ে গেল কাচ।

গড়ান দিয়ে মেশিন পিস্তলটার কাছে পৌঁছে গেল রানা, হাতে নিল ওটা। উপুড় হয়ে শুয়ে থেকেই গুলি করল দ্বিতীয় গার্ডকে। লোকটার বুকের বাঁ দিক ফুটো করে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট, পড়ে গেল সে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। মাতিমাসি গায়েব হয়ে গেছে। দরজা দিয়ে যেহেতু বের হয়নি, তারমানে গোপন কোনও পথ দিয়ে পালিয়েছে। এদিকওদিক তাকাল রানা। একদিকের একটা পর্দার আড়ালে দেখা যাচ্ছে কাচের একটা দরজা। এখনও একটু একটু কাঁপছে পর্দাটা। কাচের দরজাটা খোলা। কান পাততেই শোনা গেল ভারী পায়ের-আওয়াজ—ফায়ার এস্কেপ ধরে নেমে যাচ্ছে মাতিমাসি।

ওদিকে গেল না রানা। আগে সেলেনাকে উদ্ধার করতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে বেরিয়ে এল ও করিডোরে। এদিকওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হলো শত্রুপক্ষের কেউ নেই কাছেপিঠে। আরও একটা মেশিন পিস্তল এবং এক্সট্রা ম্যাগাযিন তুলে নিল নিহত গার্ডের কাছ থেকে। দ্বিতীয় পিস্তলটা গুঁজল কোমরে, এক্সট্রা কার্ট্রিজ ভরল প্যান্টের পকেটে। তারপর একদৌড়ে এসে ঢুকল অফিসরুমে। আবার হাতে নিল রিসিভার, ডায়ালপ্যাডের বাটন চাপছে।

শেষ বাটনটা চাপামাত্র আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকারে চাপা পড়ে গেল পুরো বিল্ডিং। মেইন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সঙ্গেও একটা পিবিএক্স প্লাস্টিক-বণ্ডেড হাই-পাওয়ার এক্সপ্লোসিভ ফিট করেছিল ও।

জুতোর ভেতর থেকে ব্যাটারিচালিত ছোট্ট একটা এলইডি টর্চলাইট বের করল রানা, তারপর দৌড় দিল সিঁড়ির উদ্দেশে। মাতিমাসির অফিসরুমে যখন নিয়ে আসা হয়েছিল ওকে, তখন কোন্ পথে এসেছিল, খেয়াল করেছে। সেলারে যাচ্ছে, দু'-এক সেকেণ্ডের জন্য জ্বালিয়েই নিভিয়ে দিচ্ছে টর্চটা, অবস্থান বদল করছে বার বার।

শত্রুপক্ষের কেউ যদি টর্চের আলো দেখেও ফেলে, সহজ টার্গেটে পরিণত করতে পারবে না ওকে।

প্রথমে শক্তিশালী বিস্ফোরণের তাণ্ডবলীলা দেখতে পেল মার্লো, আগুন জ্বলে উঠতে দেখল কার পার্কিং এরিয়াতে। কয়েক রাউণ্ড গুলিবর্ষণের আওয়াজ শুনতে পেল। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা ঘটামাত্র দেখতে পেল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে পুরো বিল্ডিং। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি করল সে নিজের ট্যাকটিকাল ইউনিটের প্রতি। কালো ভেস্ট আর নাইটভিশন গগল্‌স্‌ পরিহিত সশস্ত্র লোকেরা ঢুকে পড়ল বিল্ডিং-এর ভেতরে।

এমনিতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল মাতিমাসির অনুসারীরা, বিল্ডিং-এর ভেতরে পুলিশ ঢুকতে দেখে তাদের সে-আতঙ্ক আরও বাড়ল। আত্মসমর্পণ করার বদলে বিনা-কারণে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করল তাদের কেউ কেউ। জবাবে পাল্টা গুলিবর্ষণ করল মার্লোর লোকেরা। এরা মাতিমাসির লোকদের চেয়ে বেশি দ্রুত, ঠাণ্ডা মাথার এবং নিখুঁত—কচুকাটা হয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না মাতিমাসির অনুসারীদের বড় একটা অংশের। বাকিরা বুঝতে পারল, আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ; তাই যার যার অস্ত্র ফেলে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তাদেরকে পাকড়াও করে হাতকড়া পরাতে বেশি সময় নিল না মার্লোর লোকেরা।

মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে পুরো বিল্ডিং নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিল ওরা।

বিল্ডিং-এর একদিকের সীমানাপ্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মাতিমাসি, হাঁপাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে, ওর বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে হৃৎপিণ্ডটা। আজ প্রাণভয়ে যেভাবে দৌড়াতে হয়েছে, বিগত কয়েক দশকে সে-রকম কিছু ঘটেনি ওর জীবনে। সে কখনও কল্পনাও করেনি, এ-রকম দৌড় দিতে হবে ওকে।

ওর বুকটা ওঠানামা করছে হাপরের মতো, দম নিতে কষ্ট

হচ্ছে। আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে আসতে চাইছে হাঁটু, শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে মাটিতে। সে-রকম কিছু যাতে না-ঘটে সেজন্য দু'হাতে একটা গাছ আঁকড়ে ধরে রেখেছে সে। বিস্ময়, আতঙ্ক ও অসহ্য রাগে কাঁপছে শরীরটা।

ওর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা। লোকটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল মাতিমাসি, ফল হাতেনাতে পেয়েছে। আসলে কী ঘটেছে এবং ঘটছে ওর আস্তানায়, এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না।

'এই যে...' অচেনা কারও উঁচু কণ্ঠে চমকে উঠল মাতিমাসি, 'গাছের সঙ্গে প্রেম করে লাভ কী? ওটা ছাড়ো, দু'হাত মাথার ওপর তুলে লক্ষ্মী ছেলের মতো দাঁড়াও!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মাতিমাসি। কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো ভেস্ট পরিহিত এক লোক। কোনও সন্দেহ নেই, লোকটা পুলিশবাহিনীর সদস্য। কারণ তার কোমরে আটকানো রেডিও খড়খড় করছে। পিস্তল তাক করে রেখেছে সে মাতিমাসির দিকে। অন্য হাতে বের করছে হ্যাণ্ডকাফ।

গাছটা ছেড়ে দিল মাতিমাসি, আস্তে আস্তে হাত তুলছে মাথার ওপর।

ঠিক তখনই মাটি থেকে ফুটখানেক ওপরে উঠে গেল ওই পুলিশ-অফিসার। পরমুহূর্তেই ওর মাথাটা জোরে ঠুকে দেয়া হলো একটা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে। অর্ধচেতন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বেচারা। সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্র্যাযো। পুলিশ অফিসারকে জবাই করতে পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি নিল না সে।

রক্তাক্ত ছুরিটা অফিসারের ভেস্টে মুছল ফ্র্যাযো। রেডিওটা খুলে নিয়ে ঢোকাল নিজের প্যান্টের পকেটে। তারপর এগিয়ে গিয়ে অবলীলায় কাঁধে তুলে নিল মাতিমাসিকে। গোপন একটা পথ ধরে হাজির হলো ধর্ম

শিক্ষালয়ের বাইরে।

খুঁজে খুঁজে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মেইন লাইনের কাছে হাজির হতে পারল রানা। মেকানিকের ছদ্মবেশে যখন এসেছিল, এখানে একজায়গায় একটা কিটব্যাগ গুঁজে রেখে গিয়েছিল। ব্যাগটা বের করল ও, সেলারটা কোন্‌দিকে আছে অনুমান করে নিয়ে ছুট লাগাল সেদিকে।

গার্ডদের বেশিরভাগই হয় পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় মরেছে নয়তো পালিয়েছে। এ-রকমই হয়—কোনও সাম্রাজ্যের যখন পতন ঘটে তখন সম্রাটের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় খুব কম লোককে। সেলারে পৌঁছুতে সময় লাগল রানার, কিন্তু বিনা বাধায় যেতে পারল সেখানে।

কিটব্যাগ থেকে বের করল শক্তিশালী প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, ফিট করল সেলারের স্টিল দরজার সঙ্গে। ইলেকট্রোড দুটো সংযুক্ত করে চালু করল দশ সেকেণ্ডের টাইমার। একদৌড়ে পিছিয়ে গেল অনেকখানি, একটা পিলারের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কান খাড়া রেখেছে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে বার বার—চায় না শত্রুপক্ষের বুলেট ঢুকুক ওর শরীরে অসাবধানতার কারণে। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না।

বদ্ধ সেলারের ভেতরে বিকট আওয়াজ হলো বিস্ফোরণের, পিলারের আড়ালে থাকার পরও শকওয়েভের ধাক্কা টের পেল রানা। একে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারদিক। চেষ্টা করেও কাশি চেপে রাখতে পারল না রানা।

মিনিট দুয়েক পর আস্তে আস্তে পরিষ্কার হলো বাতাস। কোমরে গুঁজে রাখা মেশিন পিস্তল বের করে নিয়ে আগে বাড়ল রানা। বিস্ফোরণের আগে যে-জায়গায় ছিল স্টিলের দরজা, সেখান দিয়ে আগে ঢুকাল ওর পিস্তল-ধরা হাত,

অন্যহাতে জ্বেলে দিয়েছে এলইডি টর্চলাইটটা। শরীরটা দেয়ালের আড়ালে রেখে উঁকি দিল সেলারের ভেতরে।

একজন মাত্র গার্ড ছিল সেলারের পাহারায়, স্টিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে বিস্ফোরণের সময়। এখন চিৎ হয়ে পড়ে আছে সেলারের মেঝেতে, নড়ছে না। ওর এসএমজি ছিটকে গিয়ে পড়েছে আট-দশহাত দূরে। বিস্ফোরণে ছিটকে-যাওয়া স্টিল দরজা সজোরে আঘাত করেছে লোকটাকে, মাথা ফেটে গেছে তার। বেরিয়ে পড়েছে কিছু মগজ। কপাল আর একদিকের গাল লেপ্টালেপ্টি হয়ে আছে রক্তে। ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকা নিষ্প্রাণ দুই চোখ বলে দিচ্ছে মারা গেছে লোকটা।

সেলারের ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। উঁচু গলায় ডাকল, 'সেলেনা!'

রানার কণ্ঠ চিনতে পেরে সেলারের দরজার কাছে ছুটে এল মেয়েটা। 'এই যে, এখানে!'

মৃত গার্ডের কোমর থেকে চাবির গোছা খুলে নিল রানা, হাঁটছে সেলেনার সেলারের দিকে।

'পাশের সেলারে একটা ছেলে আছে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সেলেনা। 'ওকেও সঙ্গে নেবো আমরা।'

টর্চের আলো ফেলে অজ্ঞান যার্দিকে দেখল রানা।

রাস্তার এককিনারা ধরে আধ কিলোমিটারের মতো হাঁটল ফ্র্যাযো মাতিমাসিকে কাঁধে নিয়ে। তারপর হাত দেখিয়ে থামাল একটা গাড়িকে। ড্রাইভিংসিটে বসে আছে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সী এক যুবক। তার পাশের দরজাটা নিজেই খুলল ফ্র্যাযো, পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা এক টানে গাড়ির বাইরে বের করল যুবককে। ছুরির উপর্যুপরি আঘাতে রাস্তায় শুইয়ে দিল তাকে। একটুও দ্বিধা না করে ফাঁক করে দিল গলা।

লাশটা বয়ে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা নালায়

ফেলল ফ্র্যাযো। তারপর এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল মাতিমাসির, লোকটাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বসিয়ে দিল গাড়ির পেছনের সিটে। নিজে বসল ড্রাইভিং সিটে।

নিকটস্থ বিমানবন্দরের উদ্দেশে গাড়ি ছোটাল ফ্র্যাযো।

পুলিশ সার্ভিস রিভলভারটা প্রস্তুত অবস্থায় আছে মার্লোর হাতে, কিন্তু সে জানে ওটা ব্যবহার করার দরকার হবে না। ধর্ম শিক্ষালয়ের ভেতরের পরিস্থিতি পুলিশের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। জ্যান্ত অবস্থায় ধরা পড়েছে ঈশ্বরের তরবারির জনা বিশেক এজেন্ট। উদ্ধার করা হয়েছে আরও বেশ কয়েকজনের লাশ। ওদের নেতা উসবিলিয়ানো মাতিমাসি গায়েব হয়ে গেছে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ফ্র্যাযো নামের সেই দানবটাকেও। গোলাগুলিতে আহত হয়েছে পুলিশের কয়েকজন অফিসার। একজন অফিসারের গলা-কাটা লাশ পাওয়া গেছে একটা গাছের নিচে। পুলিশ বিভাগের ক্ষয়ক্ষতি এ পর্যন্তই।

মোটের ওপর মার্লো সন্তুষ্ট। ছোবল হানার আগেই বিষদাঁত উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে একটা উগ্র, জঙ্গিবাদী সংগঠনের।

'স্যর, স্যর,' হঠাৎ জরুরি গলায় ডাকল ওকে ওর এক সহকর্মী, 'জলদি এদিকে আসুন! দেখে যান!'

ছুট লাগাল মার্লো।

কয়েকজন পুলিশ অফিসারের একটা জটলা দেখা যাচ্ছে অনতিদূরে। কাউকে...অথবা কিছু একটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ওদের পাশে গিয়ে হাজির হলো মার্লো একদৌড়ে।

মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অজ্ঞান এক টিনএজার ছেলে।

যার্দি।

'এই ছেলে এখানে এল কী করে, স্যর?' মার্লোকে

জিজ্ঞেস করল এক অফিসার।

জবাব দিল না মার্লো, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। মুচকি হাসি দেখা দিয়েছে ওর ঠোঁটের কোনায়। যার্দিকে নিরাপদ জায়গায় রেখে ঠিকই কেটে পড়েছে মাসুদ রানা।

এতজন পুলিশ অফিসারের কেউই খেয়াল করতে পারেনি মানুষটা গেল কোন্‌দিকে।

তেইশ

সেলেনা কাঁপছে, ওর শরীরটা যেন দুলছে। অন্ধকারকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে এগিয়ে চলেছে রানা, একহাতে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটার কোমর। ধসে পড়া বিল্ডিং-এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা, পুলিশের মুখোমুখি যাতে হতে না-হয় সে-ব্যাপারে সাবধান আছে রানা। মেয়েটাকে নিয়ে হাজির হলো নিরালা এক জায়গায়। এখানে আগেই একটা গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে ওর নির্দেশে, রানা এজেন্সির পক্ষ থেকে।

পেছনে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠল সেলেনা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অনতিদূরের একটা গাছের ডালে নিশ্চিন্তে বসে ঝিমাচ্ছিল একটা হুতোম প্যাঁচা। প্রথমে প্রচণ্ড গোলাগুলি, তারপর এখন এই দুই শয়তান এসেছে ওকে ধরতে! রানা-সেলেনার ওপর মহা বিরক্ত হয়েছে প্যাঁচা। পালাচ্ছে প্রাণ নিয়ে। কোথাও শান্তি নেই!

মেয়েটাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল রানা, চালু করল ইঞ্জিন।

সাবধানে চালাচ্ছে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে বার বার—পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক করতে চায় না। কোনও কথা বলছে না সেলেনার সঙ্গে।

রানার পাশেই বসেছে সেলেনা। সিটে হেলান দিল সে, চোখ বুজে ফেলেছে। সেলারে কাটানো সময়টা বিভীষিকা বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে। ঘটনাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে।

খানাখন্দে ভরা গ্রাম্য রাস্তা ধরে তিন কিলোমিটারের মতো এগোনোর পর সরু একটা রাস্তায় হাজির হলো ওরা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল সেলেনা।

'একটা কটেজে।'

'কটেজ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার নামে ভাড়া নেয়া হয়েছে ওটা।'

দুটো গ্রাম পাশ কাটাল রানা, মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছে রিয়ারভিউমিররের দিকে। না, কেউ অনুসরণ করছে না ওদেরকে।

আধ ঘণ্টা পর জঙ্গল মত একটা জায়গায় হাজির হলো রানা। গাছগুলো ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে দোতলা একটা কটেজ, ওটার বাইরে একটা ল্যাম্পপোস্টে জ্বলছে বৈদ্যুতিক বাতি।

কটেজের কাছে গাড়ি থামাল রানা। নিজে নামল, নামতে সাহায্য করল সেলেনাকে। কটেজের ভেতরে ঢুকল মেয়েটাকে নিয়ে। আলো জ্বালল।

একটা আর্মচেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সেলেনা। গা এলিয়ে দিয়েছে, বন্ধ করে ফেলেছে চোখ।

রিফ্রিজারেটর থেকে লাল ওয়াইনের বোতল বের করল রানা। একটা গ্লাস ভর্তি করল, গ্লাসটা নিয়ে এসে দাঁড়াল সেলেনার সামনে।

ওর উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে তাকাল মেয়েটা। হাত বাড়িয়ে নিল গ্লাসটা, ঢক ঢক করে শেষ করল সবটুকু ওয়াইন। আশা করছে আবারও ওকে ওয়াইন খেতে দেবে রানা।

কিন্তু রানা তা করল না—জানে, মদটা কড়া এবং সেটার পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে গেলে ক্ষতি হবে সেলেনার। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর, এগিয়ে গেল ফায়ারপ্লেসের দিকে। কিছু শুকনো লাকড়ি ফেলল সেখানে, আগুন জ্বালল। এখনও চুপ করে আছে। আগুন বাড়ছে ফায়ারপ্লেসের ভেতরে, তাকিয়ে আছে সেদিকে। দূরে থাকতে চাইছে সেলেনার কাছ থেকে।

'তুমি ঠিক আছ, রানা?'

জবাব দিল না রানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফায়ারপ্লেসের সামনে।

'কোনও ঝামেলা হয়নি তো?' আবারও জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

এবারও কিছু বলল না রানা। একটা পোকার দিয়ে আগুন উস্কে দিচ্ছে।

'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

পোকারটা হাত থেকে ফেলে দিল রানা, উঠে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল সেলেনার দিকে। 'এখনও এসবের মধ্যে কেন আছ তুমি?'

'মানে?'

'তোমার জন্যে কতখানি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, কল্পনা করতে পার? প্রথমে ভেবেছিলাম ওরা মেরেই ফেলেছে তোমাকে। ...হোটেল থেকে বের হয়ে ঘোরাঘুরি করতে কে বলেছিল তোমাকে?'

'আমি...আসলে...'

'কাজটা বোকার মতো হয়ে গেছে সেলেনা, ঠিক হয়নি।

নিজেকে যতটা বুদ্ধিমতী মনে করো, তুমি আসলে ততটা নও মোটেও। পরীক্ষার খাতায় মেলা নম্বর পেলেই কেউ বুদ্ধিমতী হয় না। তুমি আসলে একটা মাথামোটা, নির্বোধ মেয়ে!'

উঠে দাঁড়াল সেলেনা। ওর ঠোঁট কাঁপছে, হাত কাঁপছে।

মেয়েটা কেঁদে ফেলতে যাচ্ছে দেখে নরম হলো রানা।

ধীর পায়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে সেলেনা, দুই চোখ জ্বলছে। রানার এক ফুটের মধ্যে হাজির হয়ে থামল, হঠাৎ একটা চড় মারল রানার গালে। প্রস্তুত ছিল না রানা, তাই এড়াতে পারল না আঘাতটা।

এক হাত তুলে ডলতে লাগল ও জায়গাটা।

'তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারো না, রানা!' সেলেনার কণ্ঠে একইসঙ্গে ক্ষোভ, আক্রোশ আর অভিযোগ।

জবাবে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু সুযোগ পেল না। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে ওর ঘাড় শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাচ্ছে সেলেনা।

তপ্ত অশ্রুর উপস্থিতি টের পেল রানা নিজের গলায় আর ঘাড়ে। লজ্জিত হলো। বুকের সঙ্গে যেন পিষে ফেলতে চাইছে সেলেনা রানাকে। চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারছে না রানা নিজেকে।

ধীরে ধীরে কামনার আগুনে তপ্ত হলো রানা। টের পাচ্ছে, ওকে চাইছে সেলেনা। রানা বলতে পারবে না, কখন পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করেছে মেয়েটাকে।

স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিচ্ছে সেলেনাও।

কটেজের বাইরে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একটা মোরগ, ওটার হাঁকডাকে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল সেলেনার। চোখের পাতা আলগা করতে কষ্ট হলো ওর। কোথায় আছে তা মনে করতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল।

বেডরুমের জানালার কাচ ভেদ করে ভেতরে ঢুকেছে

সূর্যের আলো। গত রাতের কথা মনে করে একচিলতে নিঃশব্দ হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে গত রাতটা। টের পাচ্ছে, কতখানি ভালোবেসে ফেলেছে সে রানাকে। টের পাচ্ছে, ওর প্রতি কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বিদেশি ওই রহস্যময় মানুষটা।

একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো মেয়েটা, চাদরের নিচেই টান টান করে দিল শরীরটা। একগোছা চুল এসে পড়ল ওর চোখের ওপর, অলস হাতে সরাল ওগুলো। রানা এখনও শুয়ে আছে ভেবে আবার ওকে জড়িয়ে ধরার জন্য বাড়িয়ে দিল একটা হাত। শূন্য বালিশ ঠেকল মেয়েটার হাতে।

ভালোমতো চোখ খুলল সে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বিছানায় নেই রানা।

হয়তো নিচতলায় গেছে।

ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে আবারও তলিয়ে গেল সেলেনা। কিডন্যাপিং আর সেলারে কাটানো সময়টা দূর অতীতের স্মৃতি বলে মনে হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে, নতুন কোনও জীবন দেয়া হয়েছে ওকে। যেন অসহ্য যন্ত্রণাময় কোনও দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে জেগে উঠেছে ও।

নিজের ওপর বিরক্ত না হয়ে পারল না মেয়েটা...এতদিন একসঙ্গে আছে, অথচ রানাকে একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করেনি, কোন্ দেশের নাগরিক সে। যদি কখনও ঘর বাঁধে ওরা...জিজ্ঞেস করা হয়নি...ওকে কোথায় নিয়ে যাবে ও।

আবারও চোখ খুলল মেয়েটা, ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে যাচ্ছে। কফির ঘ্রাণ নেই বাতাসে। নিচতলা থেকে কোনও আওয়াজও আসছে না। কটেজের বাইরে সারি সারি গাছ আছে, সেখান থেকে ক্রমাগত ভেসে আসছে পাখিদের কিচিরমিচির।

এতক্ষণে সচকিত হলো সেলেনা। পা নামাল বিছানা থেকে, নগ্ন অবস্থাতেই হাঁটছে। বেডরুমের এখানে-সেখানে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওর জামা-কাপড়। গত রাতে ওকে কোলে তুলে এই ঘরে নিয়ে এসেছিল রানা...

আবারও একটুখানি হাসল মেয়েটা, রানার কথা যতবার মনে পড়ছে ততবারই অদ্ভুত এক ভালোলাগায় ভরে যাচ্ছে ওর মন।

কাপড় পরে নিচতলায় হাজির হলো সেলেনা। ভেবেছিল ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে রানা, কিন্তু কিচেনে পাওয়া গেল না ওকে। কটেজের ভেতরে এখানে-সেখানে কিছুক্ষণ খুঁজল ও রানাকে, পেল না। রানার নাম ধরে ডাকল কয়েকবার। সাড়া পাওয়া গেল না।

অমঙ্গল আশঙ্কায় দুরুদুরু করছে সেলেনার বুকের ভেতরে। কটেজ থেকে বের হবে কি হবে না ভাবতে ভাবতে সদর-দরজা খুলল সে, পোর্চের সিঁড়ি বেয়ে নামল কয়েক ধাপ।

গাড়িটা গত রাতে যেখানে পার্ক করেছিল রানা, সেখানেই আছে। কিন্তু রানার কোনও পাত্তা নেই।

কটেজের ভেতরে ফিরে এল সেলেনা, ভালোমতো লাগিয়ে দিল সদর-দরজা। দেখতে না পেলেও টের পাচ্ছে, কালো হয়ে গেছে ওর চেহারা। কী করবে ভাবতে ভাবতে আবার হাজির হলো রান্নাঘরে। কিচেন-টেবিলের ওপর রাখা নোটটা চোখে পড়ল ওর।

বুকের ভেতরে জোর একটা ধাক্কা অনুভব করল সেলেনা। অনুমান করতে পারছে কে রেখে গেছে ওই নোট, এবং কেন।

এগিয়ে গিয়ে কাগজটা তুলে নিল মেয়েটা, ছলছল করছে চোখ। দুই ঠোঁট কাঁপছে, স্থির নেই নোট-ধরা হাতও। অপর হাত বাড়িয়ে কিচেন টেবিলের সঙ্গের একটা চেয়ার ধরল, আস্তে আস্তে বসে পড়ল সেটাতে। দুই চোখ যেন চুম্বকের মতো আটকে আছে রানার লেখা চিঠিতে।

সেলেনা,

তোমার আগে আরও মেয়ে এসেছে আমার জীবনে এবং আমার জীবনধারা টের পেয়ে দূরে সরে গেছে। কাউকেই বাঁধনে জড়াতে পারিনি আমি। এটাই আমার নিয়তি। আপন করে নেয়ার মতো চিরসঙ্গিনী আমার কপালে নেই।

কেন নেই? আমার জীবনটাই ও-রকম। বিপদ আর মৃত্যুর হাতছানি আমার নিত্যসঙ্গী। যে-কোনও মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে আমার; সেই আমি কী করে আমার জীবনে জড়িয়ে কোনও নারীর সর্বনাশ করি?

কেন কাউকে বাঁধনে জড়াইনি, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে এখন নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছ।

বেডরুমে যে-ক্লযিট আছে, ওটা খুলে রেখেছি। খুলে রেখেছি একটা ড্রয়ারও। ওটার ভেতরে নিজের পাসপোর্টটা পাবে তুমি। আপাতত কিছুদিন চলতে যাতে অসুবিধে না-হয়, সেজন্য বেশকিছু টাকাও পাবে। গাড়িটাও রেখে গেলাম।

আমার অনুরোধ আর উপেক্ষা কোরো না, প্লিয—চলে যাও সবচেয়ে কাছের কোনও এয়ারপোর্টে, ফিরে যাও নিজের দেশে। নিরাপদ জায়গায় ফিরে আবার লেগে যাও বিজ্ঞানের সেবায়। আমাকে যতটা প্রয়োজন তোমার, তোমাকে তারচেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন বিজ্ঞানের। তোমাকে অনেক বেশি প্রয়োজন অ্যালকেমির।

জীবনটা নতুনভাবে শুরু করার সবরকমের সুযোগ রইল তোমার জন্যে। শুধু একটা কথা জেনো: আমি তোমার বন্ধু থাকব চিরকাল। কিন্তু মিলন হবে না কোনদিন। ঠিক যেন পাশাপাশি চলছি আমরা সমান্তরাল দুটো রেললাইন।

হয়তো কখনও দেখা হবে আবার একদিন।

বিদায়।

চিঠিটা পড়ে গেল সেলেনার হাত থেকে। টেবিলে দু'হাত রেখে তার ওপর রাখল মাথাটা।

অঝোর কান্নায় কাঁপছে মেয়েটি। ভেঙে যাচ্ছে ওর বুক।

দক্ষিণ ফ্রান্সের এক সমুদ্রসৈকতে বিশাল এক ছাতার নিচে কাঠের-চেয়ারে শুয়ে আছে রানা, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে বহু-দূরের নীল দিগন্তের দিকে—যেখানে আকাশটা সাগরের সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সেলেনার কথা ভাবছে ও। বুকের ভেতরে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করছে মেয়েটার জন্য। তিন দিন হয়ে গেল ছেড়ে এসেছে ও মেয়েটাকে, এ-ক'দিনে নিশ্চয়ই কানাডায় ফিরে গেছে সেলেনা।

সে-রাতে শারীরিক ভালোবাসা বিনিময়ের পর ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় সেলেনা, অথচ দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি রানা। মেয়েটাকে ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল ও আগেই। যখন দেখল ঘুমিয়ে গেছে, সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমে একতলার কিচেনে গিয়ে ঢুকল ও।

কিচেন টেবিলে অনেকক্ষণ বসে ছিল রানা। বার বার ইচ্ছা করছিল পা টিপে ওপরতলায় যেতে, বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মত সেলেনাকে দেখতে। কিন্তু ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মেরেছে রানা। জানত, বেডরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সেলেনাকে ছেড়ে যাওয়াটা আরও কঠিন হবে ওর জন্য।

চিঠি লিখবে কি লিখবে না তা নিয়েও দ্বিধায় ছিল রানা। একসময় বুঝতে পারে, কিছু না বলে চলে গেলে ওকে খুঁজতে শুরু করবে সেলেনা, এবং সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে আবার কজা করে ফেলতে পারে শত্রুপক্ষের কেউ। সে-ঝুঁকি নেয়াটা উচিত মনে করেনি ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। এত ঘটনা ঘটার পরও, এবং

রানা মনে করিয়ে দিয়ে আসার পরও যদি ফ্রান্স না ছাড়ে সেলেনা, তা হলে আর কিছু করার নেই।

এবার কাজে নামার সময় হয়েছে। পিয়েরে উইনিং অপেক্ষা করছেন রানার জন্যে। হয়তো মিনতিও অপেক্ষা করছে।

সৈকতের ধারে একটা বোর্ডিংহাউসে উঠেছে রানা, ছাতার নিচ থেকে বেরিয়ে সেদিকে চলল ও। নিজের ঘরে ঢুকে বসে পড়ল বিছানায়, মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল মার্লোর অফিসের নম্বরে।

'হ্যালো?' মার্লোর কণ্ঠে যেন খুশির আভাস।

'প্যারিস পুলিশের সন্দেহের খাতায় কি এখনও আছে আমার নাম?' জানতে চাইল রানা। 'নাকি মুছে ফেলেছ?'

হাসল মার্লো। 'আসলে তোমার নাম কখনওই অফিশিয়ালি ছিল না প্যারিস পুলিশের সন্দেহের খাতায়। তোমাকে স্রেফ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাকড়াও করতে চাইছিলাম আমি। যা-হোক, তুমি এখন একজন মুক্তমানব। যেখানে খুশি যেতে পারো।'

'শুনে ভালো লাগল।'

'যার্দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মা'র কাছে। যতদিন বাঁচবে, ওর মায়ের আশীর্বাদ ঝরবে তোমার মাথায়। ঈশ্বরের তরবারির ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু করেছি আমরা। দলটার যে-ক'জন এজেন্ট ছিল ফ্রান্সে, তাদের অর্ধেক ধরা পড়েছে ইতিমধ্যে। বাকিদেরও ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'ভালো।'

'আমার পক্ষ থেকে তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ, রানা। তুমি সাহায্য না করলে হয়তো...'

'তোমাকেও ধন্যবাদ, মার্লো।'

'এবার যত জলদি সম্ভব ফ্রান্স ছাড়ো। শান্তিতে একটু ঘুমাতে দাও আমাকে। কবে যাচ্ছ, বলো দেখি।'

‘যত জলদি সম্ভব...কথা দিলাম।’

‘ঠিক আছে। তবে আর কোনও অ্যাকশনে দেখতে চাই না তোমাকে। যে-ক’দিন আছ এ-দেশে, ঘুরে বেড়াও, খাও-দাও, ফুর্তি করো। একজন আদর্শ ট্যুরিস্ট হিসেবে দিন কাটাও। ভুলেও জড়িয়ো না খুনখারাপির সঙ্গে।’

হাসল রানা। ‘জড়ালে?’

‘তোমার মাথায় পাহাড়ের মতো ভেঙে পড়বো আমি।’

রিসিভার নামিয়ে রাখল মার্লো, মুচকি হাসছে। রানার প্রতি অদ্ভুত এক ভালোলাগায় ভরে গেছে ওর মন।

অফিসের দরজাটা খুলে গেল এমন সময়। উসুখুসু চুলের এক ডিটেকটিভকে দেখা যাচ্ছে দোরগোড়ায়।

কী ব্যাপার জানার জন্য একটা ভ্রূ উঁচু করল মার্লো।

‘কিছু না, স্যর,’ হড়বড় করে বলল ডিটেকটিভ। ‘এমনি আপনাকে গুড মর্নিং বলার জন্য এসেছি।’

‘আমাদের সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাত কখনওই ভালো হয় না,’ বেজার মুখে বলল মার্লো। ‘কাজেই খামোকা উইশ করে লাভ নেই। ...কেন এসেছ?’

‘একটা ফাইল নেয়ার জন্য, স্যর। আমি আসলে জানতাম না আপনি এখনও আছেন এখানে। দুঃখিত।’

‘বেরিয়ে যেতাম, একটা কল এসেছিল বলে আছি আর কী,’ উঠে দাঁড়াল মার্লো। ‘কোন্ ফাইল নেবে, নাও।’

অফিসরুমের ভেতরে ঢুকল ডিটেকটিভ, এগিয়ে গেল ফাইলিং কেবিনেটের দিকে। একটা ড্রয়ার খুলল, কার্ডবোর্ড ডিভাইডারগুলোর ওপর আঙুল চালাচ্ছে।

লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মার্লো, তারপর বেরিয়ে গেল।

ডিভাইডারগুলোর ওপর আঙুল চালানো থামাল ডিটেকটিভ, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল করিডোরের দিকে। সিঁড়ির

দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মার্লো, কিছুক্ষণের মধ্যেই নামতে শুরু করবে। অফিসরুমের দিকে কোনও খেয়ালই নেই তার।

ফাইলিং কেবিনেটের কাছ থেকে সরে গেল ডিটেকটিভ। এগিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিল অফিসরুমের দরজা। দ্রুত পায়ে ফিরে এল মার্লোর ডেস্কের কাছে, তুলে নিল রিসিভার। রিসেপশনে ডায়াল করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'এই নম্বরে একটু আগে যে-ফোন থেকে কল এসেছিল, সেটার নম্বরটা জানতে চাই আমি। এবং কোত্থেকে করা হয়েছে ফোনটা, তা-ও জানতে চাই।'

'জী, স্যর,' বলল মিষ্টি কণ্ঠের রিসেপশনিস্ট, 'দু'মিনিটের মধ্যে জানাচ্ছি।'

ঠিক দেড় মিনিটের মাথায় ফিরতি ফোন করল রিসেপশনিস্ট মেয়েটা। রানার মোবাইল নম্বরটা জানিয়ে দিল। মার্লোকে কল করার সময় কোথায় ছিল রানা, তা-ও জানাল।

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল ডিটেকটিভ। তারপর ফোন করল বিশেষ একটা নম্বরে।

রানা এখন কোথায় আছে, তা জানিয়ে দিল ও-প্রান্তের লোকটাকে।

চব্বিশ

একটা ডেস্ক এবং সেটার সঙ্গে একটা চেয়ার আছে বোর্ডিং-হাউসের ঘরটাতে, সে-চেয়ারে বসে আছে রানা। ওর সামনে,

ডেস্কের ওপর ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় আছে কিছু কাগজ আর হেলমুটের নোটবইটা।

নতুন করে পড়ালেখা করার কিছু নেই। ওই নোটবুকও নতুন করে ঘাঁটার দরকার নেই। রানার কেন যেন মনে হচ্ছে, ক্লু বলে কিছু নেই ওর কাছে। ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না গত কয়েকদিন ধরে, অবসাদে ছেয়ে আছে মনটা। শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শারীরিক-ভাবে। মনের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে কয়েকটা প্রশ্ন। বিশেষ কিছু-একটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে সেখানে, কিন্তু মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না রানা। চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে সেলেনার চেহারাটা। বার বার মনে হচ্ছে, মেয়েটার প্রতি অতটা নিষ্ঠুর না হলেও পারত ও।

কেন এ-রকম হচ্ছে রানার?

বুঝতে পারছে না ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। কড়া এক বোতল উইস্কি আছে ঘরে, একটা গ্লাসে কিছুটা ঢেলে নিয়ে এল। কিন্তু চুমুক দিতে গিয়ে কেন যেন বিতৃষ্ণা চলে এল ওই তরল আগুনের প্রতি, দূরে সরিয়ে রাখল গ্লাসটা। এবং কাজটা করতে গিয়ে খোলা নোটবুকের বিশেষ একটা পাতায় আটকে গেল ওর দৃষ্টি।

I think of the English
see, it is a sea
take a row, but don't row
it seldom falls from a tree during storm

'ইংরেজদের কথা ভাবছি আমি,' বিড়বিড় করল রানা, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লেখাটার দিকে। তারপর নিচু গলায় আনমনে বলল, 'কেন? ইংরেজদের কথা কেন ভাবছে হেলমুট?'

এখানে ইংরেজ বলতে কি বিশেষ কিছু বুঝিয়েছে সে? কী বুঝিয়েছে? সে একজন জার্মান, ইংরেজদের নিয়ে ভাবার কথা নয় তার। কারণ জার্মানরা নাকউঁচু স্বভাবের হয়, শুধু ইউরোপে না সারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করে। ইংরেজদের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাদের।

তা হলে?

ইংরেজদের বিশেষ কোনও গুণ কি আকর্ষণ করেছিল হেলমুটকে? যদি করে থাকে, তা হলে কী সেটা?

চেয়ারে হেলান দিল রানা, এখনও তাকিয়ে আছে খোলা পাতাটার দিকে। বিশেষ কোন্ গুণটা আছে ইংরেজদের, যা আকর্ষণ করেছিল হেলমুটের মতো পাগলাটে এক লোককে?

হেলমুটের নোটবুকের এই পাতা নিয়েই বা হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন রানা?

পিঠ খাড়া করল ও। ভেবে ভালো লাগছে ওর, কয়েক মিনিটের জন্য হলেও ভুলে ছিল সেলেনাকে। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল উইস্কির গ্লাসটা, এক ঢোক খেল। গ্লাসটা যখন ধীরেসুস্থে নামিয়ে রাখছে টেবিলের ওপর, বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল একটা কথা।

বিশেষ ওই লাইনের মাধ্যমে কোনও হেঁয়ালি করেনি তো হেলমুট? যেমন, *ইংরেজদের কথা ভাবছি আমি* বলে ইংল্যাণ্ডের কথা বোঝায়নি তো?

হ্যাঁ, ওই বাক্যের মাধ্যমে যদি ইংল্যাণ্ডের কথা বুঝিয়ে থাকে হেলমুট, তা হলে একটা সূত্র চলে আসছে রানার হাতে। গুপ্তবিদ্যার মাধ্যমে যা আবিষ্কার করেছিলেন প্যানাসেলসাস, তা হয়তো লুকানো আছে ইংল্যাণ্ডের কোনও এক জায়গায়।

চেয়ার ছাড়ল রানা, ব্যাগের ভেতর থেকে বের করল ল্যাপটপ আর ইণ্টারনেট মডেম, ফিরে গেল ডেস্কে। চালু

করল ল্যাপটপ। নেট ঘেঁটে যা যা জানতে পেরেছিল প্যানাসেলসাস সম্পর্কে, সেগুলো গুছিয়ে ছোটখাটো একটা প্রবন্ধের মতো লিখে রেখেছিল, ওপেন করল সেই ওয়ার্ড ফাইল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ল ফাইলটা মনোযোগ দিয়ে।

নাহ্, কোথাও বলা হয়নি, প্যানাসেলসাস কখনও ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন।

তা হলে?

উইস্কির গ্লাসটা আবারও হাতে নিল রানা, আরেক চুমুক দিল। প্যানাসেলসাসের ব্যাপারে আলগা কাগজে যেসব নোট লিখেছিল, সেগুলো ঘাঁটছে। আধ ঘণ্টার মতো ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বিরক্ত হয়ে উঠল, বলতে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দিল কাগজগুলো ডেস্কের ওপর।

প্যানাসেলসাসের ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার ব্যাপারে কোথাও কিছু বলা নেই।

চেয়ারে আবারও হেলান দিল রানা। প্যানাসেলসাস হয়তো ইংল্যাণ্ডে যাননি, কিন্তু হেলমুট কি গিয়েছিল সেখানে?

মনে মনে একটা হিসেব কষছে রানা। মেণ্টাল ইন্সটিটিউটে বন্দি অবস্থায় মারা গেছে হেলমুট। সেখানে যাওয়ার আগে মুক্তমানব হিসেবে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে সে ফাদার ম্যাকগিলের বাসায়। কিন্তু ফাদারের বাসায় কেন?

উইস্কির গ্লাসটা খালি করল রানা, পুরো গ্লাস আবার ভর্তি করে নিয়ে এল। ফাদারের বাসায় হাজির হওয়াটা হেলমুটের জন্য নেহাৎ এক ঘটনাচক্র। সেইণ্ট বারনাবাস গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে, কী ভেবে ঢুকে পড়েছিল ওই গ্রামে তা সে-ই ভালো জানে। কিন্তু তার আগে? কখনও কি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল লোকটা?

হেলমুটের ডায়েরিটা আবার হাতে নিল রানা। যে-পর্যন্ত

লিখেছে বা এঁকেছে হেলমুট, সময় নিয়ে সবগুলো পাতা দেখল।

না, ইংল্যাণ্ডের কথা কিছুই বলা নেই।

অর্থাৎ, সেইন্ট বারনাবাস গ্রামে হাজির হওয়ার আগে লোকটা ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল কি না, নিশ্চিত হওয়া গেল না।

এখন কথা হচ্ছে, ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার দরকার হবে কেন হেলমুটের? পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী প্যানাসেলসাসের আবিষ্কার যদি হাতে পায়ও সে, ওটা নিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডে লুকাতে হবে কেন? ফ্রান্সে কি জায়গার অভাব পড়েছে?

'আই থিঙ্ক অভ দি ইংলিশ,' আবারও বিড়বিড় করল রানা, 'ইংরেজ...ইংল্যাণ্ড...'

ইংরেজদের প্রতি প্যানাসেলসাসের বিশেষ কোনও অনুরাগের কথা জানা যায়নি। ইংরেজদের প্রতি বিশেষ কোনও অনুরাগের কথা লেখেনি হেলমুটও। দু'জনের কেউই ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন বলে কোথাও উল্লেখ নেই। ইংল্যাণ্ডে যাওয়াটা তাঁদের কারও জন্য তেমন যুক্তিযুক্তও না।

তা হলে?

উইস্কির গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা, কিন্তু ওর বাড়ানো হাতটা থেমে গেল আপনাআপনি।

"দি ইংলিশ" বলতে ইংরেজি ভাষা বোঝায়নি তো হেলমুট?

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা, উইস্কির কথা ভুলে গেছে। হতে পারে...ব্যাপারটা সম্ভব...ইংলিশ বলতে যেমন ইংরেজ জাতি বোঝায়, তেমন ইংরেজি ভাষাটাও বোঝানো যেতে পারে। হেঁয়ালি করতে গিয়ে হেলমুট কি তা-ই করেছে?

'খুব সম্ভব,' নিজেই নিজেকে বলল রানা, 'তা না হলে নোটবুকের বাকি পাতাগুলোয় যেখানে হয় ল্যাটিন নয়তো ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহার করেছে লোকটা, সেখানে বিশেষ এই পাতায় ইংরেজি লিখতে গেল কেন?'

তারমানে...ধরে নিল রানা...আই থিঙ্ক অভ দি ইংলিশ বলতে ইংরেজি ভাষা বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

কৌতূহল বেড়ে গেছে রানার। উইস্কির গ্লাসে বড় করে চুমুক দিল। মগজ খাটানোর এই সময়গুলোতে সিগারেটের প্রয়োজন বোধ করে ও, কিন্তু এখন একটাও হাতের কাছে না থাকায় আফসোস হলো ওর।

পরের লাইনটা দেখছে ও:

see, it is a sea...

দেখো, এটা একটা সমুদ্র।

এবার ভালো মুশকিলেই ফেলেছে হেলমুট। কোথাকার কোন্ সমুদ্রের কথা বলছে সে?

আবারও ইংল্যাণ্ডের ব্যাপারটা মাথায় চলে এল রানার। ইংল্যাণ্ড ঘিরে কোন্ কোন্ সমুদ্র আছে, মনে করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। প্রথম লাইনটা দিয়ে যদি ইংরেজি ভাষার কথা বুঝিয়ে থাকে হেলমুট, তা হলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, দ্বিতীয় লাইনে কোনও সমুদ্রের কথাই বলেনি লোকটা।

সি, ইট ইয আ সী'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। আনমনা হয়ে ভাবছে হেলমুটের হেঁয়ালির ব্যাপারে।

আই থিঙ্ক অভ দি ইংলিশ বাক্যটা দিয়ে ওই লোক না-বুঝিয়েছে ইংল্যাণ্ডের কথা, না-বুঝিয়েছে ইংরেজ জাতির কথা। বরং...এখনও রানার ধারণা...ইংরেজি ভাষার কথা বলেছে লোকটা। একই ধারা যদি অনুসরণ করা হয়, তা হলে দ্বিতীয় বাক্যে s e e দিয়ে "দেখার" কথা বোঝায়নি হেলমুট। আবার s e a দিয়ে কোনও "সমুদ্রের" কথাও বলেনি সে। অথচ, see এবং sea শব্দ দুটোর ওপর জোর দিয়েছে সে...রানা নিশ্চিত।

'ইংরেজি ভাষা,' আরও একবার বিড়বিড় করল ও,

‘সি...মানে দেখা, এবং সী...মানে সমুদ্র...’

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শক্ত হয়ে গেল ওর শরীর।

দ্বিতীয় বাক্যেও হেঁয়ালি করেছে হেলমুট। ইংরেজি ভাষা, অর্থাৎ ইংরেজি বর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর “সি”-এর কথা বুঝিয়েছে সে।

কৌতূহল আরও বাড়ল রানার। ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় কাগজপত্র নিয়ে এই ডেস্কে বসার সময়ও বার বার মনে হচ্ছিল ওর, ক্লু বলে কিছু নেই ওর কাছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, অস্পষ্ট কিছু-একটা যেন রূপ নিচ্ছে আস্তে আস্তে। উইস্কির গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ও। উইস্কিটা কড়া...আর খাওয়া যাবে না। মাথাটা পরিষ্কার রাখা দরকার এখন।

‘টেইক আ রো,’ বিড়বিড় করল রানা, ‘বাট ডোন্ট রো।’

একটা দাঁড় নাও, কিন্তু দাঁড় বেয়ো না।

রানার মনে হচ্ছে, হেলমুটের চিন্তাধারার ভেতরে যেন ঢুকে গেছে ও। আলাদা আলাদা প্রতিটা বাক্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে লোকটা ঠিকই, কিন্তু এমন কিছু-একটা বুঝিয়েছে, যা প্রথম দেখায় বা চিন্তায় পাঠকের মাথায় আসবে না। একটা দাঁড় নাও, কিন্তু দাঁড় বেয়ো না-ও ঠিক তা-ই। এখানে row শব্দটা দু’বার উল্লেখ করেছে হেলমুট, যা see এবং sea-এর মতো না।

তারমানে, সম্ভবত, row শব্দটাই বুঝিয়েছে হেলমুট।

আবারও আনমনা হয়ে পড়ল রানা, ল্যাপটপের ওয়ার্ড ফাইলটাতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে প্রথমে লিখল C, তার পাশে একটা স্পেস দিয়ে লিখল ROW।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, চোখ পিটপিট করছে। ল্যাপটপের ব্যাকস্পেস কী’র দিকে হাত বাড়াল ও, মুছে দিল C আর ROW-এর মাঝখানের শূন্যস্থান।

স্থির হয়ে গেছে রানা।

স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে:

CROW

কাক।

আলোড়ন জাগল রানার স্মৃতির পর্দায়।

প্যারিসে, নটরডেম ক্যাথেড্রালের সেন্ট্রাল পোর্চে, *পোর্চ অভ জাজমেন্টে* যিশুখ্রিস্টের আদল খোদাই করা আছে। সেটার পায়ের কাছে ছোট আরেকটা অবয়ব আছে—দুই হাতে দুটো বই ধরে সিংহাসনে বসে আছে এক নারী, একটা খোলা অন্যটা বন্ধ। খিলানে-ঢাকা ওই পথে আরও আছে একটা স্যালাম্যাণ্ডার। সর্পিলাকৃতির একটা প্রতীকও আছে, যেটার মাথায় বসে আছে একটা দাঁড়কাক।

হেলমুটের নোটবুকটা আরও একবার হাতে নিল রানা, পাতা উল্টাচ্ছে। বিশেষ একটা পাতায় এসে থেমে গেল ও।

এখানে পরস্পরছেদী দুটো বৃত্ত এঁকেছে হেলমুট। তবে কোনও বৃত্তের সঙ্গেই তারা আঁকেনি। বরং বৃত্ত দুটো যে-ফাঁকা জায়গায় ছেদ করেছে একটা আরেকটাকে, সেখানে প্রসারিত ডানার আর লম্বা চঞ্চুর কালো একটা পাখি এঁকেছে।

একটা দাঁড়কাক।

কিছুটা হলেও বিহ্বলতা কাজ করছে রানার ভেতরে। হেঁয়ালির মাধ্যমে যা বলেছে অথবা বলার চেষ্টা করেছে হেলমুট, সেটার প্রথম তিন লাইনের মানে বের করে ফেলেছে ও।

এবার চতুর্থ এবং শেষ লাইন।

ইট সেলডম্ ফল্‌স ফ্রম আ ট্রি ডিউরিং স্টর্ম।

‘এটা ঝড়ের সময় কদাচিৎ গাছ থেকে পড়ে যায়,’ বিড়বিড় করল রানা।

তারমানে, এটা এমনকিছু, যা ঝড় চলাকালীন বেশিরভাগ সময়ে গাছ থেকে পড়ে না।

কী হতে পারে?

পাতা? উঁহুঁ, ঝড়ের সময় গাছ থেকে পাতা খসে পড়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

ডাল? না, তা-ও না। ডাল খসে পড়া, অর্থাৎ ভেঙে পড়াটা ঝড়ের সময় স্বাভাবিক একটা দৃশ্য। তা হলে?

ফল? না, এটাও মেনে নেয়া যাচ্ছে না—রানা নিজে ওর ছোটবেলায় ঝড়ের পর আম কুড়িয়েছে।

তা হলে কি ফুল? ধেৎ, ঝড়ে যেখানে আস্ত গাছ উপড়ে যায়, সেখানে সামান্য ফুল তো...

আনমনা হয়ে ল্যাপটপের কী-বোর্ডে আঙুল রাখল ও। ক্রো শব্দটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর ওটার পাশে লিখল:

BIRD

কেন লিখল শব্দটা?

জানে না রানা। ওর অবচেতন মন থেকে হঠাৎই বেরিয়ে এসেছে ওই শব্দ। ওটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর।

এটা প্রকৃতির এক বিস্ময়...ঝড়ের সময় গাছ থেকে ফুল পড়ে, ফল পড়ে, ডাল-পাতা খসে পড়ে, কিন্তু কোনও পাখির বাসা সহজে পড়ে না...যেমনটা বলেছে হেলমুট তার চতুর্থ বাক্যে।

তারমানে, ওই বাক্যের মানে কি পাখির বাসা?

CROW এবং BIRD শব্দ দুটোর দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছে রানা।

কাক...পাখির বাসা...কাক...পাখির বাসা...

ল্যাপটপে "বার্ড" শব্দটা মুছে দিয়ে রানা লিখল:

NEST

এবার CROW NEST শব্দ দুটো কপি করল ও, পেস্ট করল গুগল সার্চে। ক্লিক করল সার্চ অপশনে।

এলেবেলে কিছু রেযাল্ট পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলোর

কোনওটার সঙ্গেই অ্যালকেমি, প্যারাসেলসাস অথবা হেলমুটের কোনও যোগসূত্র নেই।

ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, ভাবছে।

কিছুক্ষণ পর গুগল সার্চে লিখল:

CROW'S NEST

আজেবাজে কিছু রেযাল্ট হাজির হলো এবারও। কিন্তু বিশেষ একটা রেযাল্টের ওপর ক্লিক না করে পারল না রানা, যেখানে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে:

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, ক্রো'য নেস্ট মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্যতম চিত্তাকর্ষক এক পর্যটন স্থান। এককালে ওই জায়গা ছোট একটা গ্রাম ছিল। আঠারো শ' বত্রিশ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে উইনস্টন লংফিল্ড নামের এক লোক চলে আসেন ফ্রান্সে, গিয়ে ঠাঁই নেন ওই গ্রামে। তিনি কেন ছেড়ে এসেছিলেন তাঁর পিতৃভূমি, জানা যায়নি। কিন্তু একজন ফরাসি নাগরিকের মতোই ভালোবেসে ফেলেন তিনি গ্রামটাকে, এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ওই জায়গার প্রভূত উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। যে-গ্রাম এককালে রেন-লা-শ্যাতো নামে পরিচিত ছিল, লংফিল্ড এবং তাঁর সহযোগীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে থাকে সেটার চেহারা, মনোরম এক ছোট্ট শহরে রূপ নেয় সেটা। এবং তিনি যখন ওই শহরের নতুন অথচ অদ্ভুত নাম প্রস্তাব করেন ক্রো'য নেস্ট, তাঁর অবদানের কথা বিবেচনা করে কেউই প্রতিবাদ করেনি।

ক্রো'য নেস্টের আশপাশে দেখার মতো সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, এবং এই ব্যাপারটা বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানো যায় কি না তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন লংফিল্ড। তাঁর সেই ভাবনার ফসল হিসেবে, আঠারো শ'

উননব্বই সালে, যখন তিরানব্বই বছর বয়সে মারা যান তিনি, পর্যটন-শহর হিসেবে নামডাক হয়ে যায় ক্রো'য নেস্টের।

শুধু লংফিল্ডের কারণেই নয়, ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি এমন এক ঘটনার কারণেও কিন্তু বিখ্যাত হয়ে আছে শহরটা।

ইউরোপে যখন চার্চপ্রথার সংস্কার চলছে, মানে আঠারো শ' একাশি সালের দিকে, তখন ক্রো'য নেস্টে থাকতেন অতি সাধারণ একজন যাজক। কথিত আছে, তিনি নাকি একদিন কাঠের একটা টিউব খুঁজে পান। সেটার ভেতরে সিল-করা অবস্থায় ছিল চারটি পার্চমেন্ট। লোকে বলে, ওই পার্চমেন্ট-গুলো নাকি বারো শ' চুয়ান্ন থেকে শুরু করে সতেরো শ' নব্বই পর্যন্ত যে-কোনও সময়ের হতে পারে। লোকে আরও বলে, পার্চমেন্টগুলো কাজে লাগিয়ে ওই যাজক দুর্দান্ত কোনও রহস্যের সন্ধান পেয়ে যান।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি, ঠিক কী পেয়েছিলেন ওই যাজক। তবে যা তিনি পেয়েছিলেন, কথিত আছে, তার ফলে দীনহীন অবস্থা থেকে রাতারাতি লাখপতি হয়ে যান। অত টাকা নিমেষে কোত্থেকে এল, তা আজও এক রহস্য। কেউ কেউ বলে, ক্যাথারদের গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি—ক্যাথারদের উত্তরাধিকারীরা নাকি তেরো শতকে লুকিয়ে রেখেছিল ওসব। আবার, কেউ বলে, গুপ্তধন-টুপ্তধন বাজে কথা, প্রাচীন কোনও গুপ্তবিদ্যার সন্ধান পেয়েছিলেন যাজক, যা কাজে লাগিয়ে সাধারণ ধাতব বস্তুকে সোনায় রূপান্তরিত করা সম্ভব।

গুপ্তধনের খোঁজেই হোক, অথবা মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের কারণেই হোক, ক্রো'য নেস্টের পরিচিতি বাড়তে শুরু করে। জোয়ারের সময় সাগরে যেভাবে পানি বাড়তে থাকে, ব্যাপারটা দাঁড়ায় অনেকটা সে-রকম। উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে প্রখ্যাত অনেক পর্যটক

এবং স্বর্ণসন্ধানী গিয়েছেন ওই শহরে। গিয়েছেন একনামে পরিচিত অনেক ইতিহাসবিদও। এমনকী, সুপরিচিত একজন অ্যালকেমিস্টও গিয়েছিলেন সেখানে, বেশ কিছুদিন থেকেছেন, শহরের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের জন্য মামুলি একটা বাড়িও বানিয়েছিলেন।

আর পড়ার প্রয়োজন বোধ করল না রানা, উঠে দাঁড়িয়েছে। হেনরিখ প্যানাসেলসাসের নাম দিয়ে গুগলে সার্চ করার পরও এই আর্টিকেল কেন পায়নি, বুঝতে পারছে। এটার কোথাও প্যানাসেলসাসের নাম ব্যবহার করা হয়নি।

দ্রুত ল্যাপটপ বন্ধ করল রানা, মডেম খুলল। গোছগাছ শুরু করে দিল কিছুক্ষণের মধ্যে।

বুঝে গেছে কোথায় যেতে হবে ওকে।

পঁচিশ

বিনকিউলারে চোখ রেখে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ফ্র্যাযো, দেখছে রানাকে। ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে সে বিদেশি লোকটাকে...সেই বোর্ডিংহাউস থেকে শুরু করে এই ক্রো'য নেস্ট শহর পর্যন্ত...উত্তেজিত থাকার কারণে হোক বা অন্য যে-কোনও কারণে হোক, কিছুই টের পায়নি লোকটা। টের না পেলেই ভালো—যা ধূর্ত!

এবার একেবারে শেষমুহূর্তে ছোবল দেবে ফ্র্যাযো, আগের মতো তাড়াহুড়ো করবে না।

কারণ রানাকে শুধু খুন করারই আদেশ দেয়া হয়নি ওকে, রানা যা উদ্ধার করবে সেটা ছিনিয়ে নিতেও বলা হয়েছে।

প্যানাসেলসাসের নিঃসঙ্গ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কেন যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর, এই বাড়ি বানিয়েছিলেন প্যানাসেলসাস।

চুনকাম করা একটা বাড়ি...আজ থেকে অনেক বছর আগে চুনকাম করা হয়েছিল। বাড়ির আশপাশে বিক্ষিপ্তভাবে গজিয়ে আছে ছোট-বড় বেশকিছু গাছ। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা উপত্যকা, ওটার গভীরে মাথা তুলেছে নিঃসঙ্গ একটা পাহাড়।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে-করে হাজির হওয়া ওই বাড়িই যে ক্রো'য নেস্ট, সে-ব্যাপারে আবারও সন্দেহ হলো রানার। বাড়ির সদর-দরজা অথবা অন্য কোথাও কাকের কোনও ছবি, অথবা ওই জাতীয় কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও।

সদর-দরজার দিকে কয়েক পা আগে বাড়ল রানা। 'হ্যালো? কেউ আছেন?'

তক্তার ঘের-দেয়া সীমানাপ্রাচীর। চমৎকার একটা বাগানে কাজ করছিলেন বয়স্কা এক মহিলা, রানার ডাক শুনে এগিয়ে এলেন। বৃদ্ধা বেশ লম্বা, হালকা-পাতলা শরীর, বয়স হলেও পিঠটা ঋজু। তবে যে-ব্যাপারটা বেশি চোখে পড়ে তা হলো: মহিলার চোখে কালো সানগ্লাস আর হাতে একটা সাদা ছড়ি।

অভ্যস্ত পথ, তাই অন্ধ হলেও বাড়ির সদর-দরজায় হাজির হতে বেশি সময় লাগল না বৃদ্ধার। হাসছেন তিনি, অনুমানে তাকিয়ে আছেন সদর-দরজার দিকে। 'কে?'

'আমি আসলে এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম,' বলল রানা। 'আপনার বাড়িটা দেখে কৌতূহল জাগল মনে। এ-রকম নিরালা জায়গায় এত নিঃসঙ্গ কোনও বাড়ি দেখলে কৌতূহলী

হবে যে-কেউই।'

চওড়া হলো বৃদ্ধার হাসি। 'আর্কিটেকচারে আগ্রহ আছে বুঝি তোমার?'

'হুঁ। ...এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবেন? অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, খুব পিপাসা লেগেছে।'

'কেন পারবো না? এসো, ভেতরে এসো।' দরজা খুলে রানাকে ঢুকতে দিলেন বৃদ্ধা। 'চলো আমার সঙ্গে।'

টালি বিছানো পথ ধরে অন্ধ মহিলার পিছু-পিছু চলল রানা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে, প্রশস্ত হলরুম ধরে হাজির হলো মোটামুটি আধুনিক এক কিচেনে। লাঠি ঠুকে ঠুকে ফ্রিজের দিকে এগিয়ে চলেছেন বৃদ্ধা। হাঁটাচলা দেখলে বোঝা যায়, অভ্যাসের কারণে এই বাড়ির ভেতর চলতে-ফিরতে তেমন কষ্ট হয় না তাঁর।

মিনারেল পানির একটা বোতল বের করলেন তিনি ফ্রিজ থেকে। তারপর, রানা কোন্ দিকে আছে অনুমান করে নিয়ে ঘুরলেন। 'কাবার্ডে গ্লাস আছে। নামিয়ে নেবে?'

এগিয়ে গিয়ে মহিলার কাছ থেকে বোতলটা নিল রানা, তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসাল কিচেন-টেবিলের সামনে রাখা একটা চেয়ারে। কাবার্ড থেকে একটা গ্লাস নিয়ে নিজে বসল তাঁর মুখোমুখি।

'আপনি খুব দয়ালু,' বলল রানা, গ্লাসে পানি ঢালছে। আসলেই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল, তাই ঢকঢক করে খালি করে ফেলল গ্লাসটা।

'এখানে কী কাজে এসেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা।

'আসলে ক্রো'য নেস্ট নামের একটা বাড়ি খুঁজছি আমি।'

'পেয়ে গেছ, এটাই। কেন খুঁজছ বাড়িটা?'

জবাবটা আগেই ভেবে রেখেছে রানা। 'আসলে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি আমি। পুরনো কিছু কাগজপত্রে এই বাড়ির নাম পাওয়া গেছে। তাই ভাবলাম, নিজচোখে একবার

দেখি বাড়িটা।'

'বছর তিনেক আগে নষ্ট হয়ে গেছে আমার দুই চোখ, তারপরও এই বাড়ির সবকিছুই যেন পরিষ্কার দেখতে পাই। তোমাকে দেখাতে পারব। ঘুরে ফিরে দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।'

রানাকে নিয়ে আবার রওয়ানা হলেন বৃদ্ধা। মেঝেতে লাঠি ঠুকে-ঠুকে ঘুরছেন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, কখন কোন্ ঘরে যাচ্ছেন তা বুঝে যাচ্ছেন আশ্চর্য কোনও কৌশলে, রানাকে তখন বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন ওই ঘরের।

সিটিংরুমে এসে একটু থমকাল রানা।

একদিকের দেয়ালের সঙ্গে বিশাল ফায়ারপ্লেস দেখা যাচ্ছে। তবে ওটার বিশালত্ব রানার থমকানোর কারণ নয়। ফায়ারপ্লেসের একটু ওপরে, দেয়াল জুড়ে আছে ম্যান্টলপিস, আর সেটার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও।

কাঠ খোদাই করে বড় একটা দাঁড়কাক বানানো হয়েছে, তারপর সেটা কোনও এক কৌশলে আটকে দেয়া হয়েছে দেয়ালের সঙ্গে। এখন যে-কাকটা দেখতে পাচ্ছে রানা, ওটাকে, নটরডেম ক্যাথেড্রালে যেটা দেখতে পেয়েছিল সেটারই বিশাল সংস্করণ বলা যেতে পারে। খোদাইকর্মের সূক্ষ্মতার কারণে ওই কাকের পালকগুলো কাগজের মত সরু দেখাচ্ছে, নখর আর নিষ্ঠুর চঞ্চু মনে হচ্ছে জলজ্যান্ত। চুনিপাথরের মতো লাল কাচ বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওটার চোখের জায়গায়, জ্বলজ্বল করছে সেটা। মনে হচ্ছে, কাকটা তাকিয়ে আছে রানার দিকেই।

'ফায়ারপ্লেসটা কি আসল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন বৃদ্ধা। 'বাড়িটা যখন বানানো হয়েছিল, তখন থেকেই আছে ওই ফায়ারপ্লেস।'

আগে বাড়ল রানা। ওই খোদাইকর্মের নিচে, দেয়ালের-সঙ্গে-আটকানো আলগা একখণ্ড কাঠে লেখা আছে:

eyes are mind's nest

বাক্যটার মানে কী? ভাবছে রানা। চোখ মনের-বাসা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন প্যানাসেলসাস? মনের বাসার সঙ্গে ফায়ারপ্লেসের সম্পর্ক কী?

বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। হেলমুট তার নোটবুকে হয়তো নিজে থেকে ক্রো'য নেস্টের নাম লেখেনি। হয়তো প্যানাসেলসাসই তাঁর পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন নামটা। হেলমুট যেহেতু চুরি করেছিল ওই পাণ্ডুলিপি, যেহেতু সেটার একটা নকল তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, হয়তো সে-কারণে...

সেক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। নিজের পাণ্ডুলিপিতে এই বাড়ির...কিংবা ওই ফায়ারপ্লেসের উল্লেখ কেন করবেন প্যানাসেলসাস?

জবাবটা জানা নেই রানার। এদিকওদিক তাকাচ্ছে ও।

ফায়ারপ্লেসের ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে ঝুলছে একটা পেইন্টিং। ওটাতে দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধ এক লোককে। তাঁর পরনের পোশাক পুরনো আমলের। তাঁর এক হাতে বড় একটা চাবি। অন্য হাতে গোলাকার একটা ঢাল। সেটা কেমন যেন অসম্পূর্ণ—চিত্রকর হয়তো শেষ করতে পারেনি নিজের কাজ। বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি।

'তোমার নামটা জানা হয়নি, আগন্তুক,' বললেন বৃদ্ধা।

'আমার নাম মাসুদ রানা।'

'নামটা অদ্ভুত।'

মন্তব্য করল না রানা। তাকিয়ে আছে বৃদ্ধের ছবির দিকে। আনমনা হয়ে ভাবছে কিছু-একটা।

'যদি কিছু মনে না করো,' বলছেন বৃদ্ধা, 'এখন চলে যেতে হবে তোমাকে। বাসা থেকে বের হবো আমি...আমার

ছেলের কাছে যাবো, দু'দিন থাকবো ওর ওখানে। ট্যাক্সি খবর দিয়েছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে।'

'ও...ধন্যবাদ,' বলল রানা। হতাশা দেখা দিয়েছে ওর চেহারায়। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, তীরে এসে তরী ডুবল।

হাসি ফুটল বৃদ্ধার চেহারায়। নিচুগলায় বললেন, 'যা খুঁজছ তা পাবে তুমি, মাসুদ রানা।'

ক্রো'য নেস্টের বাইরে, একসারিতে জন্মে-থাকা কতগুলো গাছের আড়ালে বসে আছে রানা। তাকিয়ে আছে অনতিদূরের ওই বাড়ির দিকে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। জোরে বইতে শুরু করেছে বাতাস। পুরো আকাশ ছেয়ে-ফেলা ঘন মেঘ আরও ঘন হচ্ছে। ঝড় শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বৃদ্ধার বলা শেষ-কথাটা কেন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে রানার মাথায়। *যা খুঁজছ তা পাবে তুমি, মাসুদ রানা*। কথাটা কেন বললেন তিনি? বিশেষ কিছু বোঝাতে চেয়েছেন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে সেটা কী?

অন্ধ ওই মহিলা কি বিশেষ কিছু জানেন? সেটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে গেছেন রানার কাছে? প্যানাসেলসাসের রহস্যময় ওই বাড়িতে কি সত্যিই লুকানো আছে বিশেষ কিছু?

জবাব না জেনে এখান থেকে চলে যাবে না বলে মনস্থির করেছে রানা।

দূরে কোথাও শোনা গেল মেঘ ডাকার গুড়গুড় শব্দ। এক হাতের তালু মেলে দিল রানা, সেটাতে পড়ল এক ফোঁটা বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ল বৃষ্টির বেগ, দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই শুরু হলো মুষলধারায় বর্ষণ। বৃষ্টির চাদর ভেদ করে এগিয়ে-আসা ট্যাক্সির জ্বলন্ত হেডলাইট দেখতে একটু কষ্টই হলো রানার।

নিভে গেল ক্রো'য নেস্টের সব বাতি। ট্যাক্সির দরজা খুলে বের হলো ওটার ড্রাইভার, একটা ছাতা মেলে ধরে ছুট

লাগিয়েছে। সদর-দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে, সযত্নে নিয়ে এল বৃদ্ধাকে গাড়ির কাছে, উঠে বসতে সাহায্য করল।

তারপর একসময় চলে গেল ট্যাক্সি। ঘনায়মান অন্ধকার একসময় গিলে খেল গাড়িটার টেইললাইটের আলোদুটোকে।

উঠল রানা। বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমেছে, কিন্তু কাকভেজা হয়ে গেছে ও ততক্ষণে। ক্রো'য নেস্টের উদ্দেশে পা বাড়াল।

সীমানাপ্রাচীর ঘিরে চক্কর লাগাল একটা। আকস্মিক বিদ্যুচ্চমকে চিরে গেল আকাশটা, কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল অনতিদূরের ওই উপত্যকায়। অবিরাম বর্ষণের শব্দ কেমন ভোঁতা আওয়াজ তুলেছে বাগানের ফ্লাওয়ারবেডে। দৃষ্টি যাতে ঝাপসা হয়ে না আসে সেজন্য চোখ থেকে বৃষ্টির-পানি মুছল রানা।

মেঘে কালো হয়ে যাওয়া আকাশের কারণে উপত্যকা-সংলগ্ন এই এলাকায় স্বাভাবিক সময়ের আগে রাত ঘনিয়েছে। পকেট থেকে এলইডি টর্চলাইট বের করল রানা, ওটা জ্বেলে কামড়ে ধরল দাঁতের ফাঁকে, লাফিয়ে ধরল একদিকের তক্তা। ঝুলে পড়ল, একটু কসরত খাটিয়ে চড়ে বসল প্রাচীরের মাথায়। লাফিয়ে নামল ওপাশের বাগানে। এদিকওদিক তাকিয়ে একছুটে গিয়ে হাজির হলো বাড়ির ব্যাকডোরের কাছে।

দরজাটা ভেতর থেকে লক করা। একদিকের একটা জানালার কাছে এগিয়ে গেল রানা। ধাক্কা দিয়ে ওপরে তুলে দিল স্লাইডিং পাল্লা, মাঝখানের ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হলো ওকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টর্চলাইটটা হাতে নিল রানা। সামনে এগোল।

টর্চের সরু আলোকরশ্মি অদ্ভুত ছায়া তৈরি করছে আশপাশের দেয়ালে। ঝড়ের মাতামাতি বেড়েছে বাইরে, কান পাতলে শোনা যায় বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ। বিদ্যুচ্চমক আরও একবার চিরে দিল আকাশটাকে, বাজ পড়ার আওয়াজ

পাওয়া গেল আবারও। মনে হলো, প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি।

একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কী খুঁজতে চোরের মতো ঢুকেছে ও এই বাড়িতে, জানে না। এখানে খোঁজার মতো আদৌ কিছু আছে কি না, তা-ও জানা নেই ওর। শুধু টের পাচ্ছে, ফায়ারপ্লেসটা... বিশেষ করে ওটার ওপর কাঠের দাঁড়কাকটা যেন চুম্বকের মতো টানছে ওকে। ওর অবচেতন মন আবার যেতে চাইছে ওখানে।

ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। টর্চের আলো ফেলে ভালোমতো দেখছে ওটা।

কিছুক্ষণ পর কিচেনের দরজা খুলে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল ও। সিটিংরুমের যে-দিকের দেয়ালের সঙ্গে বানানো হয়েছে ফায়ারপ্লেস, সেটা ঘেঁষে দাঁড়াল। ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে, চিমনিটা দেখছে।

ছাদের একটা কোনা ঘেঁষে... মিটার তিনেক বেরিয়ে-থাকা চাঁদোয়া বরাবর বানানো হয়েছে চিমনি। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করল রানা। ফায়ারপ্লেসের ঠিক সঙ্গে একটা জানালা আছে; বাড়ির ভেতর থেকে ওই জানালার দিকে তাকালে মনে হয়, ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে ওটার দূরত্ব মিটার খানেক। কিন্তু এখন, বাড়ির বাইরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারছে রানা, দূরত্বটা আসলে তিন মিটারের কম নয়।

তারমানে...

দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতরে ফিরে এল রানা, উত্তেজনায় লক করতে ভুলে গেছে কিচেনের ব্যাকডোর।

বৃষ্টির বরফশীতল পানিতে আরেকদফা ভেজার কারণে ঠাণ্ডায় কাঁপছে ও। বুঝতে পারছে, ওর অনুমান ঠিক। ফায়ারপ্লেস আসলে একটা ফাঁকিবাজি; ওখানে গোপন কোনও চেম্বার বানিয়েছেন প্যানাসেলসাস, গভীরতায় যা কমপক্ষে

তিন মিটার।

ওখানে হয়তো কোনও করিডোর আছে...দ্রুত পায়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোনোর সময় ভাবল রানা...আবার কোনও কাবার্ডও থাকতে পারে। কীভাবে ঢোকা যায় ওখানে? অন্য কোনও ঘরে কি প্রবেশদ্বার আছে?

ফায়ারপ্লেসের আশপাশ ভালোমতো দেখল রানা, যা খুঁজছে সে-রকম কিছু নজরে পড়ল না ওর। অন্য আরও কয়েকটা ঘরেও খুঁজল, রহস্যময় কোনও প্রবেশদ্বার নজরে পড়ল না ওর। ওপরতলায়, বেডরুমে গেল ও। এখানকার মেঝেতে বিছানো আছে পুরু ফ্লোরবোর্ড, এবং কোথাও কোনও ফাঁকিবাজি নেই।

আবার নিচতলায় এল রানা, নিশ্চিত হলো সেলার বলতে আসলে কিছু নেই এই বাড়িতে। কোনও গোপন ঘরও নেই যেখানে সিঁড়ি বা ট্র্যাপডোরের সাহায্যে ঢোকা যেতে পারে। লিভিংরুমে ফিরে এল ও, আরেকদফা গিয়ে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের সামনে। গোপন কোনও প্রবেশদ্বার বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, এখানেই আছে।

ঝুঁকি নেবে কি না সে-ব্যাপারে কিছুক্ষণ ভাবল রানা, তারপর লিভিংরুমের লাইট জ্বালিয়ে দিল। যেদিকের দেয়ালে বানানো হয়েছে ফায়ারপ্লেস, এগিয়ে গেল সেদিকে; দেয়ালের গায়ে আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিচ্ছে। পরীক্ষা করছে, ফাঁপা কোনও জায়গা পাওয়া যায় কি না।

না, সে-রকম কিছু পাওয়া গেল না—দেয়াল সম্পূর্ণ নিরেট।

এবার একটু বাঁ দিকে সরল রানা, দেয়ালের গায়ে আগের মতো টোকা দিচ্ছে। একজায়গায় কেমন অন্যরকম শোনাল আওয়াজ। মিটারখানেক বাঁয়ে সরল ও, জোরে টোকা দিল দেয়ালের গায়ে।

ফাঁপা আওয়াজ পাওয়া গেল।

দেয়ালটা ভালোমতো দেখছে রানা। কোথাও কোনও ফাটল নেই, আলগা কোনও জয়েন্ট নেই—গোপন কোনও প্রবেশদ্বারের ইঙ্গিত নেই কোথাও।

দেয়ালের গা থেকে কাঠের প্যানেলিং খসিয়ে ফেলার চেষ্টা করল রানা, আশা করছে ওই কাজ করলে কিছু একটা বেরিয়ে পড়বে। প্যানেলিং খসাতে পারল বটে, কিন্তু আশানুরূপ কিছু পাওয়া গেল না।

উবু হয়ে ফায়ারপ্লেসের ভেতরে ঢুকে গেল ও, কালিঝুলি-মাখা চিমনির ভেতরে ঢুকিয়ে দিল একটা হাত। হয়তো ভেতরে লিভার অথবা ওই জাতীয় কোনও মেকানিযম থাকতে পারে, যা ধরে টান দিলে উন্মুক্ত হবে কোনও গোপন প্রবেশদ্বার। কিন্তু সে-রকম কিছুও পাওয়া গেল না।

চিমনির ভেতর থেকে হাত বের করল রানা, তাকাল ওটার দিকে। আলকাতরার মতো কালো হয়ে গেছে হাতটা। 'কিছু একটা আছে কোথাও না কোথাও,' বিড়বিড় করে বলল ও, তারপর হাত বুলাতে শুরু করল ফায়ারপ্লেসের ভেতরে সব জায়গায়।

লাভ হলো না।

ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা, একইসঙ্গে হতাশা আর ক্লান্তি টের পাচ্ছে নিজের ভেতরে। শুনতে পাচ্ছে, জানালার কাচে অবিরাম আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। বৃষ্টির বেগ আবার বেড়েছে মনে হয়।

কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছে ও ফায়ারপ্লেস থেকে, চিন্তার ঝড় বইছে মনে। প্যানাসেলসাসের গোপন ওই চেম্বারে ঢুকতেই হবে ওকে...যেভাবে হোক।

আবারও বাইরে বের হলো রানা, টুলশেড থেকে নিয়ে এল একটা কুড়াল—ফালি করে রাখা কিছু লাকড়ির পাশে পড়ে ছিল ওটা। কাজের সুবিধা হতে পারে ভেবে একটা টুলও এনেছে।

কুড়াল হাতে টুলে দাঁড়িয়ে ভাবল, ওর অনুমান যদি ভুল হয় তা হলে কী হবে? অপরাধী দৃষ্টিতে তাকাল কাকের মূর্তিটার দিকে, ওটার লালচে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছিল, কী মনে হওয়ায় আবার তাকাল কাকটার দিকে।

আইয আর মাইণ্ড'স নেস্ট।

চোখ হচ্ছে মনের-বাসা।

এত কাছ থেকে কেন যেন জ্যান্ত মনে হচ্ছে কাকটাকে। মনে হচ্ছে, রানার উপস্থিতি টের পেয়ে এখনই উড়াল দেবে ওটা। এত কাছ থেকে আরও হিংস্র দেখাচ্ছে ওটাকে, মনে হচ্ছে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে রানার ওপর...

টুল থেকে নামল রানা। ওটা নিয়ে গেল কাকের সেই মূর্তির ঠিক নিচে। কুড়ালটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে টুলের ওপর উঠে দাঁড়াল আবার, তাকিয়ে আছে কাকের লাল চোখের দিকে। কেন যেন দৃষ্টি সরাতে পারছে না চোখ দুটোর ওপর থেকে।

হঠাৎ...কী মনে হলো রানা নিজেও বলতে পারবে না...দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে জোরে চেপে ধরল কাকটার দু'চোখ, ওভাবেই ধরে রাখল কিছুক্ষণ।

কিছুই ঘটল না।

হাত সরাল রানা, পকেট থেকে বের করল এলইডি টর্চ। ওটা জ্বালিয়ে আলো ফেলল কাকের চোখে। সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল ওর নিজের চোখ।

প্যানাসেলসাস মামুলি কোনও কাচ বসাননি ওই কাকের চোখে, বরং বিশেষ মেকানিযমের কিছু একটা ব্যবহার করেছেন তিনি পাখিটার অক্ষিকোটরে। ফলে টর্চের আলো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। এবং...আশ্চর্য হলো রানা...যে-অ্যাঙ্গেল থেকেই আলো ফেলছে সে, প্রতিফলনটা দিক বদল করছে না—জ্যামিতিক কারসাজির কারণে শুধু

একদিকেই ঠিকরে যাচ্ছে প্রতিফলিত আলো।

টুল থেকে নামল রানা, এগিয়ে গিয়ে নিভিয়ে দিল ঘরের লাইট। আগের জায়গায় ফিরে এসে আবার আলো ফেলল কাকের চোখে। প্রতিফলিত আলো কোথায় গিয়ে পড়ছে, খেয়াল করল এবার।

উল্টোদিকের দেয়ালের সেই বৃদ্ধের পেইন্টিং এর ওপর।

ওই পেইন্টিং-এর গায়ে লাল একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে যেন; ব্যাস ইঞ্চি তিনেক হবে। এবং...আরও অবাক হওয়ার পালা রানার...ওই বৃত্ত তৈরি হয়েছে বৃদ্ধের হাতে ধরে-রাখা সেই ঢালে।

যে-অ্যাঙ্গেলেই আলো ফেলছে রানা কাকের চোখে, প্রতিফলন যেহেতু একদিকেই হচ্ছে, সেহেতু টুল থেকে নামার সিদ্ধান্ত নিল ও। টর্চ নিভিয়ে এগিয়ে গেল পেইন্টিং-এর দিকে। ওটার কাছাকাছি গিয়ে আবার জ্বালল টর্চ, আলো ফেলল কাকের চোখে।

বৃত্তটা আবারও তৈরি হলো বৃদ্ধের হাতে-ধরা ঢালে।

টর্চ নিভিয়ে দিল রানা, পকেটে ঢোকাল ওটা। দেয়ালের হুক থেকে সাবধানে নামাল বৃদ্ধের পেইন্টিং। সঙ্গে সঙ্গে যেন ধড়াস করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড।

একটা দেয়ালসিন্দুক দেখা যাচ্ছে।

কী থাকতে পারে ওই সিন্দুকের ভেতরে?

তড়িঘড়ি করে সুইচবোর্ডের দিকে এগোল রানা, লাইট জ্বালিয়ে দিল। ফিরে এল সিন্দুকের কাছে। ওটার ভেতরে তাকানোমাত্র একরাশ হতাশা আবারও গ্রাস করল ওকে।

বন্ধ ডালার ঠিক সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে একটা কম্বিনেশন লক। দুটো মাত্র ডায়াল সেই লকে; একটা বর্ণমালার—একনজরেই বোঝা যায় ওটাতে এ থেকে শুরু করে যেড পর্যন্ত ছাব্বিশটা বর্ণ আছে। অন্যটা সংখ্যার—ওটাতে আছে যিরো থেকে শুরু করে নাইন পর্যন্ত

সবগুলো সংখ্যা।

'আবারও হেঁয়ালি!' বিড়বিড় করল রানা, 'আবারও ধাঁধা!'

সিন্দুকটার কাছ থেকে সরে এল ও। চিন্তার ঝড়টা আবারও বইতে শুরু করেছে ওর মাথার ভেতরে। কী করবে এখন?

হতাশ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পেইন্টিং-এর দিকে তাকাল রানা।

বৃদ্ধের এক হাতে একটা ঢাল, অন্য হাতে বড় একটা চাবি।

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল রানা।

চাবি?

ঢালের সঙ্গে সবসময় মানায় তলোয়ার, অথচ চাবি...

পেইন্টিংটা দেয়াল থেকে সরানোর পর পাওয়া গেল একটা দেয়ালসিন্দুক। যার পেইন্টিং সরানো হয়েছে, তিনি একটা বড়সড় চাবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন...

পেইন্টিংটার ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চাবিটার দিকে।

চাবির গায়ে, ছোট ছোট অক্ষরে, ল্যাটিন ভাষায় লেখা কথাটা পড়তে তেমন অসুবিধা হলো না ওরঃ et id quod quaerere

যা খুঁজছ তা পাবে তুমি।

স্থির হয়ে গেছে রানা। প্যানাসেলসাস তাঁর দেয়ালসিন্দুকের কম্বিনেশন বলে দিয়েছেন।

কিন্তু সেটা কী?

প্রথম শব্দটা দিয়েই শুরু করা যাক।

et

কম্বিনেশন লকের সিস্টেম অনুযায়ী "ই" যদি ঠিক রাখে রানা, এবং তারপর ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী "টি"

বদল করে নেয়, তা হলে ওই শব্দের কম্বিনেশন হয় e20।

আবার দুইয়ের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে হয় দুই।

কম্বিনেশন লকে ওই "ই-টু" মেলাল রানা।

কট করে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হলো।

সিন্দুকের হাতল ধরে টান দিল রানা। কিন্তু কিছুই হলো না—দরজাটা খুলল না।

রানা বুঝে নিল, একে একে সবগুলো কম্বিনেশন মেলাতে হবে ওকে।

কম্বিনেশন লকে পর্যায়ক্রমে মেলাল ও:

i4

q4 (21, 15, 4 এর ধারাবাহিক যোগফল)

এবং

q1 (21, 1, 5, 18, 5, 18, 5 এর ধারাবাহিক যোগফল)

কট শব্দটা আরও তিনবার শুনতে পেল রানা। শেষেরবার সবচেয়ে জোরে।

পেছন থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল ও।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, অভ্যস্ত হাতটা চলে গেছে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারের বাঁটে। পাঁই করে ঘুরল ও।

না, কেউ দাঁড়িয়ে নেই রানার পেছনে।

তা হলে আওয়াজ হলো কীসের?

বুঝতে সময় লাগল না রানার।

আসলে কোনও দেয়ালসিন্দুকের না, একটা লিভারের কম্বিনেশন লক মিলিয়েছে ও। তার ফলে ওপেন-সিসিমের মতো উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে ফায়ারপ্লেসটা। চিমনি থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে একরাশ ধুলো। যান্ত্রিক কৌশলের কারণে নিজেকে একদিকে কিছুটা সরিয়ে নিয়েছে ওই ফায়ারপ্লেস, অন্ধকার যে-ফোকর দেখা যাচ্ছে সেখান দিয়ে শরীর মুচড়ে

ভেতরে ঢুকতে পারবে রানা।

পায়ে পায়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। দম নিল লম্বা করে। পকেট থেকে বের করে টর্চটা জ্বালল আবার, আলো ফেলে দেখার চেষ্টা করছে চেম্বারের ভেতরটা। চোখ পিটপিট করছে।

চেম্বারটা বর্গাকৃতির; তিন মিটারের মতো লম্বা, চওড়ায়ও প্রায় একই সমান। শেষমাথায় দেখা যাচ্ছে ওক কাঠের পুরনো আর বড় একটা টেবিল, ধুলো জমেছে ওটার ওপর। বড় একটা ধাতব পাত্র দেখা যাচ্ছে ওই টেবিলের ওপর। অত বড় কোনও পাত্র আর দেখা যায় না আজকাল, তারমানে ওটা অনেক বছর আগের। পাশেই আছে বড়সড় একটা গবলেট, ওটার ভেতরে দেখা যাচ্ছে একটা কঙ্কালের খুলি। শূন্য অক্ষিকোটর দুটো যেন চেয়ে আছে রানার দিকেই। পানপাত্র আর গবলেটকে মাঝখানে রেখে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ধাতব মোমদানি, ওগুলোর ভেতরে দেখা যাচ্ছে দুটো মোটাসোটা চার্চ ক্যাণ্ডেল।

চেম্বারে ঢুকল রানা। টর্চের আলোয় এদিকওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই কোথাও। বেরিয়ে এল ও চেম্বার থেকে, স্টোররুম থেকে খুঁজে নিয়ে এল ম্যাচবাক্স, গিয়ে দাঁড়াল ওক কাঠের ওই টেবিলের সামনে। একে একে দুটো মোমবাতিই জ্বালাল। মোটামুটি উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল চেম্বারের ভেতরটা।

কঙ্কালের খুলিটা এখন কেন যেন জ্যান্ত মনে হচ্ছে। রানা যেন অদৃশ্য একজোড়া চোখের উপস্থিতি টের পাচ্ছে শূন্য দুই অক্ষিকোটরে। দু'দিকের দেয়ালে ধুলোয়-ভরা কাঠের তাক দেখা যাচ্ছে, সেগুলোতে সারি দিয়ে সাজানো আছে পুরনো আমলের বেশকিছু বই। ধুলো জমেছে বইগুলোর ওপরও। একদিকের একটা তাক থেকে একটা বই নামাল রানা, তবে তার আগে ধুলো আর মাকড়সার জাল পরিষ্কার করতে হলো।

ওকে। ল্যাটিন ভাষায় লেখা বইয়ের শিরোনামটা পড়ল: মৃত্যুপুস্তিকা।

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। মৃত্যুপুস্তিকা? কীভাবে মানুষ মারতে হবে তার বর্ণনা আছে নাকি এই বইয়ে?

বইটা জায়গামতো রেখে দিল ও। তুলে নিল অন্য একটা বই। এটার গায়ে লেখা আছে: গুপ্তদর্শনের কথা।

আবারও এদিকওদিক তাকাল রানা। ওর মনে হচ্ছে, কারও ব্যক্তিগত স্টাডিতে হাজির হয়েছে। তবে, একনজরেই বোঝা যায়, বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে না এই স্টাডি। দ্বিতীয় বইটাও রেখে দিল জায়গামতো, জ্বলন্ত মোমসহ একটা মোমদানি তুলে নিল হাতে।

স্টাডিরুমের তিন দিকের দেয়ালে অ্যালকেমিকাল অনেক প্রতীক, চিহ্ন আর ছবি দেখা যাচ্ছে। কোনওটা আঁকা হয়েছে রঙের সাহায্যে, আবার কোনওটা আঁকা হয়েছে পেন্সিল অথবা ওই জাতীয় কিছু মাধ্যমের সাহায্যে।

বিশেষ একটা ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার। ঘনীভূত হওয়া মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে একটা হাত। বোঝাই যাচ্ছে, হাতটা ঐশ্বরিক। আজব এক তরী ভাসছে ওই মেঘের নিচে...ভাসছে না-বলে উড়ছে বললেই ভালো হয়, কারণ ডানাওয়ালা কয়েকজন ক্ষুদে পরীকে দেখা যাচ্ছে শূন্যে ধরে রেখেছে তরীটা; ঐশ্বরিক ওই হাত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে তরীর ওপর। সেটার কোনও একজায়গায় ফুটো হয়ে গেছে, আর সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে স্বর্গীয় কোনও জলধারা।

'অমৃতসুধা,' বিড়বিড় করল রানা।

মোমদানি হাতে নিয়ে একটা চক্কর দিল ও স্টাডিরুমের ভেতর। খেয়াল করল, যেখান দিয়ে ঢুকেছে এখানে সে-জায়গার ঠিক ওপরে, দেয়ালের সঙ্গে আটকানো আছে কোনও এক লোকের একটা তেলচিত্র। পোর্ট্রেটের ওই লোক

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যেন রানার দিকেই। বোঝা যায়, মানুষটা মজবুত গড়নের। জঙ্গলের মতো ধূসর দাড়ি ঢেকে দিয়েছে তাঁর চেহারার অর্ধেকটা। পাতলা হয়ে এসেছে মাথার ধূসর চুল। ঝোপের মতো ঘন ভ্রূর আড়াল থেকে তাকিয়ে আছেন তিনি নির্নিমেষে। চেহারায় কঠোরতা আছে, অথচ চোখে খেলা করছে কেমন এক কৌতুকপূর্ণ রহস্যময় হাসি।

পোর্ট্রেটের নিচের দিকে সোনালি হরফে লেখা আছে:

প্যানাসেলসাস।

'অবশেষে দেখা হলো তা হলে,' বিড়বিড় করে বলল রানা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কিংবদন্তীর অ্যালকেমিস্টের দিকে, তারপর সরে গেল তেলচিত্রটার সামনে থেকে। ধীর পায়ে আবারও চক্কর দিচ্ছে স্টাডিরুমের ভেতরে, দৃষ্টি মেঝের ওপর।

কালচে টাইলস দেখা যাচ্ছে মেঝেতে, ধুলোমাখা পুরনো আর ছোট একটা গালিচাও আছে।

কী ব্যাপার? এ-রকম একটা ঘরে গালিচার দরকার পড়েছিল কেন প্যানাসেলসাসের?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গালিচাটার পাশে। নিচু করে ধরেছে মোমদানিটা। খালি হাত দিয়ে গালিচার একটা কোনা একটুখানি ওপরে তুলল।

ওটার নিচ থেকে বেরিয়ে এল বড়সড় একটা মাকড়সা, ছুট লাগিয়েছে ঘরের অন্ধকার এক কোনার উদ্দেশে। মোমদানিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে গালিচাটা গোল করে পাকিয়ে ফেলল রানা, ঘরের আরেক কোনায় রেখে এল ওটা। বসে পড়ল মোমদানির কাছে, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

মেঝের অনেকখানি জুড়ে একটা নকশা দেখা যাচ্ছে।

দুটো বৃত্ত, একটা ছেদ করেছে আরেকটাকে, একটা অন্যটার ওপরে অবস্থান করছে। ওপরের বৃত্তটার পরিধি ছুঁয়েছে তারার ছ'টা কোণ। নিচের বৃত্তের পরিধি স্পর্শ-করা

তারার কোণের সংখ্যা পাঁচ।

দুটো বৃত্ত যে-জায়গায় একটা আরেকটাকে ছেদ করেছে, একটামাত্র ফ্ল্যাগস্টোন আছে সেখানে, লোহার একটা রিং সংযুক্ত অবস্থায় আছে ওটার সঙ্গে।

দু'হাত দিয়ে রিংটা ধরল রানা, জোরে টান দিল ওপরের দিকে।

হ্যাঁচকা টানের কারণে মেঝে থেকে আলগা হয়ে গেল ফ্ল্যাগস্টোন। রানা টের পেল, ও যেখানে হাঁটু গেড়ে বসেছে সে-জায়গার নিচে কোথাও হুশ শব্দে সরে গেল খানিকটা বদ্ধ-বাতাস। মোমদানিটা কাছে টেনে নিল ও।

কয়েক ধাপ প্যাঁচানো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের অন্ধকারে।

ছাব্বিশ

সিঁড়ি বেয়ে যত নামছে রানা, ওর কানে তত স্তিমিত হয়ে আসছে ঝড়ের গর্জন।

ধাপগুলো শেষ হয়ে গেল হঠাৎ। মোমের আলোয় এদিকওদিক তাকিয়ে রানা দেখল, একটা প্যাসেজওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের নিচে পাথুরে মেঝে। অনুজ্জ্বল আলোর কারণে আশপাশের অন্ধকার আরও ঘন দেখাচ্ছে যেন।

মেঝের সঙ্গে ছাদের ব্যবধান সাড়ে ছ'ফুটের মতো, তাই সোজা হয়ে দাঁড়াতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ওর। মাটির নিচে এই প্যাসেজওয়ে বানাতে কত সময় লেগেছিল

প্যানাসেলসাসের, ভেবে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারল না ও।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্‌দিকে গেছে এই প্যাসেজ? এবং কেন গেছে?

এগিয়ে চলল রানা। বর্গাকৃতির একটা চেম্বারে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না ওর।

দশ-বারো গজ দূরে, নিজের মুখোমুখি, চেম্বারের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা বেদি দেখতে পাচ্ছে রানা। পাথর কেটে বানানো হয়েছে ওটা, খাঁটি সোনার পাত দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছে তিনদিকে। ওই বেদি কীভাবে নিয়ে আসা হলো এখানে, ভেবে তাজ্জব হয়ে গেল ও।

বেদির ওপর দেখা যাচ্ছে খাঁটি সোনার একটা ক্রুসিফিক্স, চকচক করছে মোমের আলোয়। রানা বুঝতে পারল, মধ্যযুগীয় কোনও একটা চার্চে হাজির হয়েছে আসলে।

বেদির দু'পাশে বড় বড় মোমদানিতে মোমবাতি রাখা আছে, দুটো জ্বালাল রানা। বেশ আলোকিত হয়ে উঠল চেম্বারটা।

একদিকের দেয়ালের সঙ্গে সাঁটিয়ে রাখা হয়েছে পাথর-কেটে-বানানো বেশ কয়েকটা বাক্স। প্রতিটা বাক্স মোটামুটি বর্গাকৃতির; উচ্চতায় রানার হাঁটুর কাছাকাছি, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এক মিটারের মতো। ওগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ও। কাছে পৌঁছে আরও একবার থমকাতে হলো ওকে।

প্রতিটা বাক্স বোঝাই হয়ে আছে সোনা দিয়ে—সোনার-কয়েন, সোনার-তাল, রিং আর কবচ।

'ক্যাথারদের গুপ্তধন,' বিড়বিড় করল রানা।

বেদির দিকে ঘাড় ঘুরাল ও। বেদির ওপর পাথরের একটা গোলাকৃতির বেসিন দেখা যাচ্ছে, ব্যাস ছয় ফুটের মতো হবে। জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে বেদির ওপর উঠে পড়ল রানা, এগিয়ে যাচ্ছে বেসিনটার দিকে।

কালচে পানি দেখা যাচ্ছে বেসিনের ভেতরে, মোমের

আলোয় কেমন চকচক করছে। বেসিনের একদিকে ল্যাটিন ভাষায় লেখা আছে:

বিশ্বাস করে কেউ যদি এই পানি খায়, অমরত্ব পাবে সে।

বেসিনের কাছেই আছে সোনার একটা পেডেস্টাল। সেটার ওপর রাখা আছে চামড়ার লম্বা একটা টিউব...খুব সম্ভব ওয়াটারপ্রুফ। ওটা হাতে নিল রানা, ভেতর থেকে বের করল রোল-করা পুরনো একটা পাণ্ডুলিপি। হাঁটু গেড়ে বসল, রোল খুলে পাণ্ডুলিপিটা বিছাল মেঝেতে, কাছে নিল মোমদানি।

কোনও সন্দেহ নেই, এই পাণ্ডুলিপি মধ্যযুগীয়। কিন্তু এত চমৎকার কায়দায় সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, একটুও নষ্ট হয়নি। মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স আর ল্যাটিনের সংমিশ্রণে কী-যেন লেখা আছে, ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

চোখ পিটপিট করল ও। একটা সত্য যেন হঠাৎ করেই উদ্ভাসিত হয়েছে ওর সামনে।

এটাই কি প্যানাসেলসাসের সেই পাণ্ডুলিপি যার পেছনে লেগেছে এতগুলো লোক?

যদি তা-ই হয়, মানতে হবে, সাশার কাছ থেকে যেসব কাগজ চুরি করেছিল হেলমুট, সেগুলো প্যানাসেলসাসের ব্যক্তিগত নোট ছাড়া আর কিছু ছিল না। নিজের নোটবুকে যা লিখেছিল হেলমুট, সেগুলোও হয়তো প্যানাসেলসাসের অন্য কোনও নোটের সাংকেতিক অনুলিপি।

তারমানে, ভাবছে রানা, ক্রো'য নেস্ট যখন বানান অথবা কেনেন প্যানাসেলসাস, তখনই তাঁর মাথায় কাজ করছিল, কোথায়-কীভাবে লুকাবেন নিজের পাণ্ডুলিপি। কোনও অনুসন্ধানী কীভাবে খোঁজ পেতে পারে সেই পাণ্ডুলিপির, সেটা লিখে রাখেন অন্য কোথাও...কোনও নোটে।

পাণ্ডুলিপিটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। এটার জন্য যুগে যুগে কত মানুষের জীবন গেল! ওটা রক্ষা করতে চেয়েছে কেউ, আবার কেউ ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। মেঝেতে বিছানো ওই পাণ্ডুলিপি সামান্য কাগজ ছাড়া আর কিছুই না, অথচ কী ক্ষমতা ওটার!

খারাপ লোকেরা ধরেই নিয়েছে, অনন্যসাধারণ কিছু-একটা আছে এই পাণ্ডুলিপিতে...সে-রকম কথা প্রচার করা হয়েছে আসলে। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? সত্যিই কি অনন্যসাধারণ কিছু বহন করছে এই পাণ্ডুলিপি?

চামড়ার টিউবটা আবার হাতে নিল রানা, উপুড় করল ওটা। ভেতর থেকে ভাঁজ-করা একখণ্ড কাগজ পড়ল মেঝেতে। কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলল রানা।

একটা চিঠি।

এবং হাতের-লেখাটা রানার পূর্বপরিচিত।

সম্ভবত প্যানাসেলসাসের লেখা শেষ চিঠি।

বন্ধু,

খুঁজতে খুঁজতে আমার গুপ্তবিদ্যার সন্ধান পেয়ে গেছ তুমি। তোমাকে অভিনন্দন। কিছু কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি তোমাকে।

আমার এই গুপ্তবিদ্যা, যা এখন তোমার হাতে, মানবসভ্যতার শুরু থেকেই অত্যন্ত গোপন বিষয়। আমি অনেক ভেবেছি এটা নিয়ে, এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, এই বিদ্যা যদি প্রকাশিত হয় কখনও, মানবসভ্যতার উপকার হওয়ার চেয়ে অপকার হবে বেশি। কারণ যাদের গায়ে জোর আছে, তারা সবসময়ই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে এই বিদ্যা। ফলে মানুষে-মানুষে হানাহানি হবে, খুনোখুনি হবে।

কাজেই তোমার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ: যা

আবিষ্কার করেছ তার কথা ভুলে যাও এবং মুখ বন্ধ রাখো।

হেনরিখ প্যানাসেলসাস।

পাথরের বেসিনটার দিকে তাকাল রানা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর, কালচে ওই পানি যে পান করবে, সে অমরত্ব লাভ করবে। তারপরও, গত কিছুদিন ধরে যা খুঁজছিল ও তা পেয়ে গেছে। ওর খোঁজা শেষ। এবার ওই পানি নিয়ে ফিরতে হবে পিয়েরে উইনিং-এর কাছে।

উঠে দাঁড়াল রানা, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। কীসে করে নেয়া যায় ওই পানি, ভাবছে। চামড়ার টিউবটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে ভালোমতো দেখল ভেতরে কিছু আছে কি না।

নেই।

বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল ও। ওটার ভেতরে ডুবিয়ে দিল টিউবটা, পানি দিয়ে ভর্তি করল। পানি থেকে বের করল জিনিসটা, মুখ আটকাল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝবার চেষ্টা করল, টিউবের ভেতর থেকে পানি পড়ছে কি না। না, পড়ছে না।

একটুখানি থমকাল রানা। নিজেকে প্রশ্ন করল মনে মনে, যা করছি আমি, তা কি ঠিক হচ্ছে? টিউবের ভেতরে যে-পানি আছে, আসলেই কি সর্বরোগ সারানোর ক্ষমতা আছে সেটার?

একটুখানি পানি চেখে দেখার ইচ্ছা হলো ওর। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাতিল করে দিল চিন্তাটা। বলা হয়েছে, ওই পানি যদি বিশ্বাস করে কেউ খায়, অমরত্ব পাবে। রানার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা।

গাছপালা, পশুপাখি কোনওকিছুই অমর নয়...হওয়া সম্ভব না...

বজ্রপাতের মতো একটা আওয়াজ হলো চেম্বারের ভেতরে।

ভীষণ চমকে উঠল রানা, টিউবটা আরেকটু হলে পড়ে গিয়েছিল ওর হাত থেকে।

গুলি করেছে কেউ রানার পেছনে। দু'টুকরো হয়ে গেছে বেসিনটা, পানি গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল রানা। কিন্তু ওটার দিকে হাত বাড়ালে, ওর পিঠ যে ছ্যাঁদা করে দেবে পেছনের লোকটার পরের বুলেট, বুঝতে পারছে।

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা।

সেই দানব দাঁড়িয়ে ঠিক দশ হাত তফাতে। একান-ওকান হয়ে গেছে শয়তানী নিঃশব্দ হাসি।

'চমকে দিয়েছি, না?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল ফ্র্যাযো। 'নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছ আমাকে দেখে?'

জবাব দিল না রানা।

'শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা বের করো,' আদেশ দিল ফ্র্যাযো। 'সাবধান...তাড়াহুড়ো করবে না। আমাকে গুলি করার কোনও সুযোগ দিয়ো না।'

কথামতো কাজ করল রানা।

'এবার ওটা ছেড়ে দাও হাত থেকে।'

ওয়ালথারটা ছেড়ে দিল রানা। ওর পায়ের কাছে খটাং করে পড়ল ওটা, গুহার ভেতর জোর আওয়াজ হলো।

'দুই হাত মাথার ওপর তোলো এবার।'

আবারও আদেশ পালন করল রানা।

'ভালো,' বলল ফ্র্যাযো। 'পরিস্থিতিটা তা হলে এ-রকম: আমার হাতে বুলেটভর্তি একটা পিস্তল আছে। আর তোমার কাছে কিছু নেই। তোমার জীবন এখন আমার হাতের মুঠোয়।'

'সম্ভবত,' মুখ খুলল রানা।

'সম্ভবত?' হা-হা করে হাসল ফ্র্যাযো। 'তোমাকে যে

নিজের কব্জার ভেতরে পেয়ে গেছি আমি, সে-ব্যাপারে এখনও সন্দেহ আছে তোমার?'

জবাব দিল না রানা।

'তোমাকে খুন করার পর কী করবো আমি, জানো? তোমার সেই জানের জানকে খুঁজে বের করবো। ওর সঙ্গে মজা নেয়া বাকি আছে আমার।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল রানা। 'ওকে খুঁজে পাবে না তুমি।'

'তা-ই?' চুকচুক আওয়াজ করল ফ্র্যাযো। 'কেন?'

'ও নেই এখানে।'

'কোথায় আছে তা হলে?'

উত্তর দিল না রানা, প্রয়োজন বোধ করছে না।

হা-হা করে আবার হেসে উঠল ফ্র্যাযো। 'মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়। তাতেই মেয়েটাকে এত ভালো লেগে গেছে তোমার যে, সিনেমার হিরোদের মতো মুখ বন্ধ রেখে রক্ষা করতে চাইছ ওকে?' দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর, হাসতে হাসতে পকেট থেকে বের করল সেলেনার সেই অ্যাড্রেসবুক। ওটা নাচাল একটুখানি। 'তোমাকে শেষ করে কানাডার উদ্দেশে রওনা হবো। কীভাবে খুঁজে পেতে হবে ওই বেশ্যাটাকে, তা আমাকে জানিয়ে দেবে এটা।'

তলপেটের ভেতরে মোচড় অনুভব করল রানা। অ্যাড্রেসবুকটা নষ্ট করে ফেলতে বলেছিল ও সেলেনাকে। কথা শোনেনি মেয়েটা। ওকে কিডন্যাপ করার পর ওর ব্যাগের ভেতর থেকে ওটা হাতিয়ে নিয়েছে ফ্র্যাযো।

'মেয়েটা খুন হওয়ার আগে আমার পক্ষ থেকে একটা ট্রফি পাবে। সেটা কী, জানো? তোমার কাটামাথা।' আবারও হা-হা করে হাসল ফ্র্যাযো।

অদ্ভুত একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে ফ্র্যাযোর পেছনে, চেম্বারের একদিকের দেয়ালে। লোকটার সমস্ত মনোযোগ

রানার ওপর বলে ব্যাপারটা খেয়াল করছে না সে।

আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ছায়াটা।

কেউ একজন সাবধানে এগিয়ে আসছে।

'প্রথমে গুলি করবো তোমার এক হাঁটুতে,' বলছে ফ্র্যাযো, 'চুরমার করে দেবো মালাইচাকি। পরের গুলিতে চুরমার হয়ে যাবে অন্য পায়ের মালাইচাকিটা। তারপরের দুই গুলিতে অচল করে দেবো তোমার দুই হাত...যেমনটা তুমি করেছ আমার বাঁ হাতের বেলায়। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে যখন ছটফট করতে থাকবে তুমি, তখন পিস্তল রেখে ছুরিটা বের করবো আমি। সময় নিয়ে জবাই করবো তোমাকে, এখানেই। তারপর তোমার কাটামাথা আর ওই পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে যাবো এখান থেকে।'

চেম্বারের ভেতরে ঢুকল তৃতীয় একজন মানুষ।

সেই অন্ধ বৃদ্ধা।

কিছু একটা দেখা যাচ্ছে তাঁর হাতে, সেটা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলছেন তিনি।

ফ্র্যাযো যাতে কিছু টের না পায় সেজন্য ওর ওপর থেকে চোখ সরায়নি রানা।

রানার ডান হাঁটুর দিকে নিজের পিস্তল তাক করছে লোকটা।

তাড়াহুড়ো করলেন বৃদ্ধা, টিপে দিলেন ট্রিগার।

বজ্রপাতের আওয়াজ আবারও শোনা গেল চেম্বারে। গুলি করা হয়েছিল ফ্র্যাযোকে নিশানা করে, বুলেট আঁচড় কেটেছে ওর একদিকের কাঁধে।

প্রস্তুত ছিল রানা, কিন্তু বৃদ্ধার উপস্থিতি টের না পাওয়ায় ভীষণ চমকে উঠল ফ্র্যাযো। যেহেতু লোকটার পেছন থেকে করা হয়েছে গুলিটা, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় রানার ওপর থেকে মনোযোগ সরে গেল ওর, ঘাড় ঘুরাল সে। নিশানাও সরে গেছে রানার ওপর থেকে।

ঝট করে বসে পড়ল রানা, পায়ের কাছে পড়ে থাকা ওয়ালথার তুলে নিল মুহূর্তের মধ্যে, পরমুহূর্তে গড়ান দিয়ে সরে গেল দূরে।

ততক্ষণে আবারও গুলি করেছেন বৃদ্ধা ফ্র্যাযোকে, এবং আবারও মিস করেছেন।

জঘন্য একটা গালি বেরিয়ে এল ফ্র্যাযোর মুখ দিয়ে, বৃদ্ধাকে গুলি করার জন্য পিস্তল তুলছে।

ওয়ালথারের ট্রিগারে পর পর দু'বার টান দিল রানা। প্রথম বুলেট খুলি ভেদ করল ফ্র্যাযোর। দ্বিতীয়টা ঢুকল লোকটার একদিকের কান দিয়ে, বেরিয়ে গেল কপাল ফুটো করে।

একটা মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ফ্র্যাযো, হাত থেকে খসে পড়েছে পিস্তল। তারপর জোরালো শব্দ তুলে ওর মৃতদেহ আছড়ে পড়ল চেম্বারের মেঝেতে। ছিটকে উঠল একরাশ ধুলো।

সাবধানে উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা, তাকিয়ে আছে বৃদ্ধার দিকে, পিস্তলের নল মেঝের দিকে।

কালো সানগ্লাসটা উধাও হয়ে গেছে বৃদ্ধার চোখ থেকে। চোখ দুটো যেন বাজপাখির চোখের মতো ঝকঝক করছে মোমবাতির আলোয়।

'আপনি আসলে কে?' জিজ্ঞেস করল রানা, কিছুটা থতমত খেয়ে গেছে।

জবাব দিলেন না বৃদ্ধা। ধীরেসুস্থে পিস্তল তাক করছেন রানার বুক বরাবর। বললেন, 'প্রশ্ন করবো আমি, তুমি না। পিস্তল ফেলে দাও হাত থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তোলো।'

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা। ইচ্ছা করলেই গুলি করতে পারে সে বৃদ্ধাকে, কিন্তু ওই মহিলার সঙ্গে কেন যেন সংঘর্ষে জড়াতে ইচ্ছা করছে না ওর। বৃদ্ধার কথামতো কাজ

করল।

একদিকে একটুখানি সরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। 'বলেছিলে, তোমার কারবার নাকি ইতিহাস নিয়ে...পুরনো বাড়িঘরের প্রতি আগ্রহ আছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তুমি আসলে একটা চোর।'

'না, আপনার বাড়িতে চুরি করার জন্যে ঢুকিনি আমি।'

'বিনা অনুমতিতে ঢুকেছ আমার বাড়িতে, হাজির হয়ে গেছ ব্যক্তিগত প্রার্থনা-ঘরে, তারপরও বলছ চুরি করার জন্য ঢোকোনি?' ইঙ্গিতে ফ্র্যাযোকে দেখালেন বৃদ্ধা। 'এই লোকটা কে? তোমার স্যাঙাত? ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বনিবনা হচ্ছিল না তোমাদের?'

'ভালোমতো দেখুন লোকটাকে। আমার স্যাঙাত বলে কি মনে হয়?'

'তোমাকেও তো প্রথম দেখায় চোর বলে মনে হয়নি।'

'এবং আপনিও প্রথমে অন্ধের ভান করেছেন।'

কাঁধ ঝাঁকালেন বৃদ্ধা। 'আমি অন্ধের ভান করবো, নাকি বোকার ভান করবো, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ...তোমার ব্যাগের ভেতরে কী? কাঁধ থেকে খসাও ওটা। চেইন খুলে উপুড় করো, ভেতরে যা যা আছে সব পড়ুক মেঝেতে। দেখি কী কী চুরি করলে।'

আবারও বৃদ্ধার কথামতো কাজ করল রানা। মেঝেতে পড়ল হেলমুটের সেই নোটবুক আর প্যানাসেলসাসের দিনলিপি।

'ওগুলো ছুঁড়ে দাও আমার দিকে,' আদেশ দিলেন বৃদ্ধা।

আরও একবার বৃদ্ধার কথামতো কাজ করল রানা।

কোনওটাই লুফে নেয়ার চেষ্টা করলেন না তিনি, তাঁর পায়ের কাছে পড়তে দিলেন। রানার দিকে পিস্তল তাক করে রেখে বসে পড়লেন হাঁটুতে ভর দিয়ে। উল্টেপাল্টে দেখছেন ওই নোটবুক আর দিনলিপি। কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করেই

কেমন আনমনা হয়ে গেলেন, মাথা ঝাঁকালেন।

বৃদ্ধার অমনোযোগিতার সুযোগ নিতে পারে রানা ইচ্ছা করলেই। ইচ্ছা করলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে মেঝেতে, ওয়ালথার কুড়িয়ে নিয়ে একগুলিতে শুইয়ে দিতে পারে বৃদ্ধাকে। কিন্তু কাজটা করল না সে, করার কথা ভাবলও না। বৃদ্ধাকে কেন যেন খারাপ মানুষ বলে মনে হচ্ছে না ওর।

একসময় নোটবুক আর দিনলিপিটা একপাশে সযত্নে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা, নামিয়ে নিয়েছেন পিস্তলের নল। 'দুঃখিত...ওভাবে বলাটা উচিত হয়নি আমার।'

'আপনি কে আসলে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার নাম আমান্তিয়া মানযিনি। প্যানাসেলসাসের নাতনি।' ইশারায় ব্র্যাযোর লাশটা দেখালেন বৃদ্ধা। 'বিস্তারিত কথা পরে হবে। আগে এই শয়তানটার কোনও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ...এসো আমার সঙ্গে।'

রানাকে পথ দেখিয়ে পাথুরে দেয়ালে বানানো একটা দরজার সামনে নিয়ে এলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'অনেক বছর ধরে বন্ধ অবস্থায় আছে ওই দরজা, খুলবে কি না জানি না। চেষ্টা করে দেখো খুলতে পারো কি না।'

'ওটা খুললে কোথায় যাওয়া যাবে?'

'উপত্যকার গহীনে এক জায়গায়।'

দরজাটা খুলতে বেশ বেগ পেতে হলো রানাকে, সময়ও লাগল অনেক, তবে একসময় খুলতে পারল ওটা।

হুশ শব্দে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়ল চেম্বারের ভেতরে। দৃষ্টিপথ আড়াল করে দিয়েছে লতাগাছের ছোট্ট একটা জঙ্গল।

বাইরে মাতামাতি থেমে গেছে ঝড়ের, মেঘ কেটে গেছে, এখন উজ্জ্বল আলো বিলাচ্ছে চাঁদ। সে-আলোর কিছুটা ঢুকে

পড়েছে লতাগাছগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে। প্রবহমান পানির কুল-কুল আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, তারমানে অনতিদূর বয়ে চলেছে কোনও খাঁড়ি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

'ওই লতাগাছগুলোর সঙ্গেই আছে খাঁড়িটা। শয়তানটার লাশ বয়ে এনে ছুঁড়ে ফেলে দাও নিচে। কেউ কখনও খুঁজে পাবে না ওকে আর।'

এবারও বৃদ্ধার কথামতো কাজ করল রানা। ফ্র্যাযোর ভারী লাশটা বয়ে আনতে যারপরনাই বেগ পেতে হলো ওকে। দরজার গোবরাটে, একদিকের পাল্লার সঙ্গে ভর দিয়ে দাঁড় করাল ও লাশটা; তারপর জোরে একটা লাথি মারল ফ্র্যাযোর কোমরে। লতাগাছের জঙ্গল ভেদ করে উড়াল দিল লাশটা, কয়েক মুহূর্ত পরই শোনা গেল একটা ঝপাৎ আওয়াজ।

দরজাটা আগের মতো লাগিয়ে দিল রানা।

'ফিরে চলো এবার,' বললেন আমান্তিয়া।

ইটালির রোম শহরে একটা বাড়ি অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে ফেলেছে সাদা পোশাকের পুলিশ। তাদের কোনও গাড়িতেই "পুলিশ" শব্দটা লেখা নেই, তবুও তাদেরকে দেখলে বোঝা যায় তারা ওই বাহিনীরই লোক। ব্যস্ত ভঙ্গিতে তারা বের হচ্ছে গাড়ির ভেতর থেকে, সুবিধামতো জায়গায় পজিশন নিচ্ছে।

বাড়ির তিন তলার একটা জানালা থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে উসবিলিয়ানো মাতিমাসি, অসহায়ের মতো দেখছে কীভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার খেলা।

মাসুদ রানা নামের লোকটা ধ্বংস করে দিয়েছে তার এত সাধের গুপ্তসংঘ। নিখাদ ঘৃণা অনুভব করছে সে ওই লোকের প্রতি। লোকটা কী অবলীলায় ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে

দিল ঈশ্বরের তরবারিকে!

কেউ বলে না দিলেও মাতিমাসি জানে, রানার কারণেই পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে এনযো, এবং এনযোর কাছ থেকেই এই বাড়ির সন্ধান পেয়েছে পুলিশ।

মাতিমাসি আরও জানে, সারা ইউরোপে ঈশ্বরের তরবারির এজেন্টদের খোঁজে চিরুনি অভিযানে নেমেছে ইন্টারপোল। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে, ধরা পড়ছে বিভিন্ন এজেন্ট। তাদের কেউ কেউ পুলিশের কবল থেকে পালাতে গিয়ে অথবা পুলিশের ওপর হামলা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরছে।

মাতিমাসিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা।

সিঁড়িতে একাধিক লোকের পায়ের-আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে মাতিমাসি। ওকে এখন পুরো বাড়িতে তন্নতন্ন করে খুঁজবে লোকগুলো।

পালানোর কোনও উপায় নেই ওর। আত্মসমর্পণের কোনও বিকল্প দেখছে না সে।

কে বা কারা যেন জোরে লাথি মারছে বন্ধ দরজায়। জানালার কাছ থেকে সরার প্রয়োজন বোধ করল না মাতিমাসি। একসময় ভেঙে ফেলা হলো দরজাটা। তবুও নড়ল না মাতিমাসি।

ওর দিকে এগিয়ে এল পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন সদস্য পিস্তল উঁচিয়ে, ঘিরে ধরল ওকে। একজন হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল ওর হাতে। কিছুই বলল না মাতিমাসি, বাধাও দিল না।

ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু একটা নাম।

মাসুদ রানা!

ক্রো'য নেস্টের সিটিংরুমে ফিরে এসেছে রানা।

ফায়ারপ্লেসটা "লাগিয়ে দিলেন" আমান্তিয়া। তারপর রানাকে নিয়ে গেলেন কিচেনে। হাতে আর জামায় লেগে-

থাকা রক্ত পরিষ্কার করল রানা। টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'এবার যেতে হবে আমাকে।'

'জানতে চাওয়ার মতো কোনও প্রশ্ন নেই তোমার মনে?'

'আছে। কিন্তু জেনে কোনও লাভ আছে কি?'

'কেন, গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছ, তোমার কৌতূহলের তো সীমা থাকার কথা না।'

'ওসবে তেমন কোনও আগ্রহ নেই আমার। যদি থাকত, পাথরের ওই বাক্সগুলোর সামনেই আমাকে পেতেন আপনি, অন্য কোথাও না।'

'রাশি রাশি ওই সোনাই ওই চেম্বারের একমাত্র গুপ্তধন নয়।' মুচকি হাসছেন আমান্তিয়া। এগিয়ে গেলেন কাবার্ডের দিকে, খুললেন ওটা। ভেতরে অলিভ অয়েল, ভিনেগারসহ আরও কিছু হাবিজাবি তেলের বেশ কয়েকটা বোতল দেখা যাচ্ছে। ওগুলো সরিয়ে মাটি দিয়ে বানানো একটা বোতল বের করলেন সাবধানে, নিয়ে এলেন রানার কাছে। 'এটাই খুঁজছিলে তুমি, না?'

'কী আছে এটার ভেতর?'

'অমৃতসুধার একমাত্র নমুনা। নানার বানানো।'

কিছু বলছে না রানা, তাকিয়ে আছে আমান্তিয়ার দিকে।

'এবার কি আমার গল্প শোনার আগ্রহ হচ্ছে তোমার?'

প্রথমে নিজের কথা বলল রানা।

শুরু করল পিয়েরে উইনিং-এর সঙ্গে পরিচয় হওয়া দিয়ে, শেষ করল কীভাবে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছে ক্রো'য নেস্টে তা দিয়ে। অল্প কিছু কথা চেপে গিয়ে প্রায় সবই বলল ও আমান্তিয়াকে।

এরপর মুখ খুললেন বৃদ্ধা। বলতে লাগলেন, 'আনসেল যখন আমার নানার বিশ্বাস ভাঙল, তারপর সবকিছু ঘটতে শুরু করল দ্রুত। নাৎসিরা ঢুকে পড়ল নানার সেই বাড়িতে,

গুপ্তবিদ্যার খোঁজে তছনছ করে ফেলল সবকিছু। বাধা দিতে গিয়েছিলেন আমার নানী, তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হলো সেখানেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন নানা, সঙ্গে নিলেন আমার মাকে।'

'আনসেলের কী হলো?'

'বোকামি করেছিল লোকটা। ভেবেছিল, বিজ্ঞানের মস্ত উপকার করছে। কিন্তু যখন দেখল কত বড় সর্বনাশ ডেকে এনেছে, যখন বুঝল ওকে আসলে ঠকানো হয়েছে, আর সহ্য করতে পারল না। নানা পালিয়ে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আত্মহত্যা করল সে গলায় দড়ি দিয়ে।'

'এই বাড়ির ভেতরে এত কারিগরি ফলালেন কখন আপনার নানা?'

'কেনার পর পরই। নিজের বিদ্যা আর ক্যাথারদের সম্পদ গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। ক্যাথারদের উত্তরাধিকারী এক আর্কিটেক্টের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর। ওই লোক খুব শ্রদ্ধা করতেন নানাকে, আর নানাও খুব বিশ্বাস করতেন তাঁকে। দু'জনে মিলে প্ল্যান করে গড়ে তুলেছেন এই বাড়ির গোপন ব্যাপারগুলো।'

'ক্যাথারদের ওই গুপ্তধন...ওগুলো কোথায় পেলেন আপনার নানা?'

'কোথায় পেয়েছেন তা কখনও বলেননি তিনি। এত লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে কীভাবে নিয়ে গিয়েছিলেন ওগুলো ওই চেম্বারে, সেটা আমার কাছেও এক রহস্য। আমি শুধু জানতাম, ক্যাথারদের গুপ্তধন সংরক্ষিত অবস্থায় আছে ওই চেম্বারের ভেতরে।'

'আপনার আর আপনার মা'র সঙ্গে এখানেই থাকতেন প্যানাসেলসাস?'

'মাকে পড়ালেখার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল সুইটযারল্যাণ্ডে। সেখানেই আমার বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়

মা'র, তাঁরা দু'জনে ভালোবেসে বিয়ে করেন। বাবাকে নিয়ে এখানে ফিরে আসেন মা...উনিশ শ' ত্রিশ সালের দিকে। ততদিনে নানা বুঝে গেছেন, শত্রুরা তাঁর চিহ্ন হারিয়ে ফেলেছে...অর্থাৎ তাঁকে খুঁজে বের করা আর সম্ভব না ওই লোকগুলোর পক্ষে। মা'র কাছে এই বাড়ির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে একদিন স্রেফ গায়েব হয়ে যান নানা। তিনি কোথায় গেছেন, এখনও বেঁচে আছেন কি না, সেসবের কিছুই জানা নেই আমার।'

'কোনও ধারণাও নেই?'

কাঁধ ঝাঁকালেন আমান্তিয়া। 'খুব সম্ভব মিশরে...মানে অ্যালকেমির জন্মস্থানে চলে গিয়েছিলেন নানা। হয়তো অন্য কোনও গুপ্তবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা ছিল তাঁর।'

'ততদিনে তাঁর বয়স কত হয়েছিল?'

'পঁচাশির কম না। অথচ...বিশ্বাস করো বা না করো...তাঁকে দেখতে নাকি পঁয়ষট্টি বছর বয়সের কোনও লোকের মতো লাগত। ...চেম্বারে তাঁর একটা পোর্ট্রেট দেখেছ না? স্থানীয় এক চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়ে নেন তিনি ছবিটা, এবং তার কয়েকদিন পরই লাপাত্তা হয়ে যান। ওই ঘটনার কয়েক বছর পর, উনিশ শ' চল্লিশ সালে জন্ম হয় আমার।'

'তারমানে আপনার বয়স আশির কাছাকাছি? অথচ...'

'আমার বয়সও অনেক কম দেখায়, না?' হাসলেন আমান্তিয়া। 'বড় হয়ে উঠতে লাগলাম আমি, আস্তে আস্তে বুঝে নিতে লাগলাম এই বাড়ির দায়িত্ব।'

'আপনার মা কোথায়?'

'অন্য এক জায়গায় চলে গেছেন। এখন তাঁর বয়স এক শ'র কাছাকাছি। অথচ শক্তসমর্থ আছেন, দিব্যি হেঁটেচলে বেড়ান।'

'প্যানাসেলসাসের সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি

আপনাদের? তাঁর ব্যাপারে আর কিছু শোনেননি কখনও?'

'না। আসলে আমার মনে হয় নাৎসিদের কাজ দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি। হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পরিচিত মানুষদের সঙ্গে দেখা করবেন না আর কখনও। আমরাও তাঁর খোঁজ জানার চেষ্টা করিনি কোনওদিন।'

'তিনি বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন তা-ও জানেন না?'

রহস্যময় হাসি দেখা দিল আমান্তিয়ার চেহারায়। 'অমরত্ব সুধা আবিষ্কার করেছেন যিনি, তিনি কি এত জলদি মারা যেতে পারেন?'

'তারমানে উনি এখনও বেঁচে...'

'আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সবকিছুর জবাব নেই, রানা। এমন অনেককিছু এখনও আছে এই পৃথিবীতে, যা বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। ...কেন, তুমি বিশ্বাস করো না?'

'এতদিন করিনি। এখন করি। যা-হোক,' নোটবুক, প্যানাসেলসাসের পাণ্ডুলিপি, আর বিশেষ সেই খঞ্জরটা ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখল রানা, 'এগুলো এখন আপনার। আপনিই এগুলোর ন্যায্য উত্তরাধিকারী। ওঠার আগে আর একটা কথা: মাটির বোতল থেকে খানিকটা কি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি আমি?'

'ওই বাচ্চা মেয়েটার জন্যে তো? পারো।'

একই রকম দেখতে, কিন্তু আকারে অনেক ছোট আর একটি মাটির পাত্রে কিছুটা সুধা ঢাললেন আমান্তিয়া। বললেন, 'তোমার নিজের জন্যে কিছুটা দিই?'

'না,' হাসল রানা। 'কোনও লাভ নেই। ওসব খেলেও আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই গুলি বা ছুরি খেয়ে মরতে হবে আমাকে। বিপজ্জনক কাজ করি, শত্রু দিন দিন বাড়ছে। আমি খেলে যেটুকু খাব, সেটুকুই বরবাদ।'

উত্তরটা তাজ্জব করে দিল বৃদ্ধাকে। রানার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'বিশ্বাস করোনি আমাকে?'

'করেছি...হানড্রেড পার্সেন্ট। নইলে মিনতির জন্যে চাইতাম না ওটা। তবে আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন বিশ্বাস করছেন অজানা-অচেনা একজন লোককে?'

'আমিও করেছি...হানড্রেড পার্সেন্ট। তুমি যদি খারাপ লোক হতে, সোনার বাক্সগুলো সরানোর চেষ্টা করতে। সবটুকু অমৃত কেড়ে নিতে চাইতে আমার কাছ থেকে। তা ছাড়া ওই শয়তান যা যা বলছিল তোমাকে, তার বেশিরভাগই কান এড়ায়নি আমার। কে ভালো আর কে খারাপ, বুঝতে কষ্ট হয়নি। যে-মানুষ একটা বাচ্চা মেয়ে আর একজন উঠতি অ্যালকেমিস্টকে বাঁচাতে পিস্তলের মুখে দাঁড়াতে ভয় পায় না, সে আবার খারাপ হয় কী করে?'

'তারমানে আমাকে ফাঁকা হুমকি দিয়েছিলেন তখন?'

একগাল হাসলেন আমান্তিয়া। 'তোমাকে বাজিয়ে দেখতে চাইছিলাম আসলে।'

সাতাশ

হাসপাতালের সরু বেডে শুয়ে আছে এমা, একটা বই কোলের ওপর রেখে পড়ছে। কারও উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। রানাকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হলো মেয়েটার চোখমুখ, মিষ্টি করে হাসল।

এমার পেছনের জানালায় খেলা করছে রোদ। কে বা কারা যেন হলুদ, সাদা আর লাল গোলাপের আলাদা আলাদা তিনটে গুচ্ছ রেখে গেছে ওর বিছানার পাশের টেবিলে। সুগন্ধ আসছে ওগুলো থেকে। ড্রেসিং করা হয়েছে মেয়েটার ডান দিকের গালে।

সঙ্গে করে আনা একগুচ্ছ ফুল এমার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি সেরে উঠছ দেখে ভালো লাগল,' বসল বিছানার পাশে, চেয়ারে।

'তোমাকে দেখে আমারও ভালো লাগছে, রানা। তুমি যে আমার খোঁজ নেয়ার জন্য হাসপাতালে আসবে, ভাবিনি।'

'এমা, সে-রাতে যা ঘটেছে, তার জন্য আমি আসলেই দুঃখিত। আমার ভুলের কারণেই...'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল এমা। 'শুধু শুধু নিজেকে দোষী ভেবো না তো। তুমি এসেছিলে সে-রাতে সেজন্যেই বেঁচে আছি এখনও। আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ।'

'তবুও...আর একটু আগে পৌঁছতে পারলে ভাল হতো।'

'হুঁ...কিন্তু আর একটু যদি দেরি হতো? কে ওই লোকটা? ধরা পড়েছে?'

'না, মারা পড়েছে।'

এমা কিছু বলল না।

'এখন তোমার প্ল্যান কী?' জানতে চাইল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এমা। 'ফ্রান্সের ওপর থেকে মন উঠে গেছে আমার। মন বলছে, ফ্লোরেন্সে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে আমার। ইউনিভার্সিটির চাকরিতে ফিরে যেতে চাই আবার। একটা বই লিখছিলাম, হয়তো কোনও একদিন শেষ করবো ওটার কাজও।'

'তোমার সেই বই বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম,'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমাকে যেতে হবে, এমা।'

রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল এমা। 'একটা-বার...একটু কাছে আসবে?'

ইতস্তত করল রানা, তারপর ধরল এমার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা। মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হাত ধরে টেনে রানাকে আরও কাছে নিল এমা, ওর গালে আলতো একটা চুমু দিল। নিচু গলায় বলল, 'ইটালিতে কি কখনও যাওয়া হবে তোমার?'

'জানি না। হয়তো হবে...কিন্তু সেটা কবে, বলতে পারছি না।'

'কথা দাও,' হঠাৎ করেই ছলছল করে উঠল এমার চোখ, 'যদি কখনও ফ্লোরেন্সে যাও, ফোন করবে আমাকে?'

'করবো। কথা দিলাম।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পিয়েরে উইনিংকে ফোন করল রানা। জানিয়ে দিল, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় ও। বলল, যে-কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল, সেটা সফলভাবে সেরেছে।

'অ্যাঁ? সত্যিই? কোথায় আপনি?'

পরদিনই দেখা করবে বলে লাইন কেটে দিল রানা।

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, এমন সময় বেজে উঠল ওটা।

স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা।

রানা এজেন্সি, লণ্ডন শাখা থেকে ফোন করা হয়েছে।

'হ্যালো?' কল রিসিভ করল ও।

ও-প্রান্ত থেকে যা বলা হলো, তা চুপচাপ শুনবার পর 'থ্যাঙ্কিউ,' বলে লাইন কেটে দিল রানা।

রানাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন পিয়েরে উইনিং।

'আবার দেখা হয়ে কী যে ভালো লাগছে, মিস্টার রানা, বুঝিয়ে বলতে পারবো না। গত রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমি...'

'মিনতি কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওর ব্যাপারে শুধু এইটুকু বলতে পারি, বেঁচে আছে। দিন দিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে ওর অবস্থা। যা-হোক, পাণ্ডুলিপিটা এনেছেন?'

'না।'

'না?'

'ওটা আসলে কোনও কাজে লাগবে না আপনার, তাই আনিনি।'

'অ্যাঁ? বুঝলাম না।'

একটুখানি হাসল রানা, একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে জ্যাকেটের ভেতরে। বের করে আনল মাটির বোতলটা। 'ওই পাণ্ডুলিপি কাজে লাগিয়ে অমৃতসুধা বানাতে চেয়েছিলেন তো আপনি? সেটাই আছে এই বোতলে।'

কিছু বলছেন না উইনিং, তাকিয়ে আছেন বোতলটার দিকে। তাঁর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না, রানার কথা বিশ্বাস করেছেন কি না।

নিজেকে সামলে নিতে বেশ কিছুটা সময় লাগল তাঁর। 'অমৃতসুধা? ওই বোতলে?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্যানাসেলসাস নিজের হাতে বানিয়েছিলেন এটা।'

বোতল উদ্ধারের কাহিনী ভেঙে বলল রানা উইনিংকে।

এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে বোতলটা নিলেন উইনিং। 'হাজারবার ধন্যবাদ দিলেও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না, মিস্টার রানা। এখনই এটা নিয়ে যাচ্ছি আমি মিনতির কাছে। রাতদিন ওর দেখাশোনা করছে আমার মেয়েটা।' ঘুরতে গিয়েও কী মনে করে আবার

তাকালেন রানার দিকে। 'আজ আমার সঙ্গেই ডিনার করুন? বুঝতে পারছি অনেক ধকল গেছে আপনার ওপর দিয়ে।'

'ঠিক আছে। তবে আমার একটা প্রশ্ন ছিল।'

একটা ভ্রূ উঁচু করলেন উইনিং।

'হেনরিখ প্যানাসেলসাসের ব্যাপারে এতকিছু জানলেন কী করে আপনি?'

'আমি অনেক আগে থেকেই অ্যালকেমির ভক্ত। এ-বিষয়ে প্রচুর বই পড়েছি। সংখ্যাটা এতই বেশি যে, বুকে হাত রেখে বলতে পারি, আমার মতো অ্যালকেমির অত বই পড়েনি কোনও অ্যালকেমিস্টও। যা-হোক, অমৃতসুধার ব্যাপারে খোঁজখবর করছিলাম অনেক বছর আগে থেকে...সত্যি বলতে কী, সেটা নিজের জন্য, মিনতির জন্য নয়। কিন্তু অত খোঁজখবর করে কোনও লাভ হয়নি শেষপর্যন্ত, কিছুই খুঁজে বের করতে পারিনি। আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু একদিন প্রাগে হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল এক বইবিক্রেতার সঙ্গে। প্যানাসেলসাসের ব্যাপারে আমাকে অনেক কথা বলল সে। নতুন করে বইপত্র ঘাঁটতে শুরু করলাম তখন, জানতে পারলাম আরও অনেককিছু।'

কোনও মন্তব্য করল না রানা, তাকিয়ে আছে উইনিং-এর দিকে।

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, প্যানাসেলসাসের গুপ্তবিদ্যার খোঁজ পাওয়াটা কঠিন কোনও কাজ হবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো আমার ধারণা। যাদেরকে ভাড়া করেছিলাম ওই কাজের জন্য, তাদের বেশিরভাগই আমার টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছে। কেউ-কেউ অজানা শত্রুর গুলি খেয়ে মরেছে।'

চুপচাপ শুনছে রানা উইনিং-এর কথা।

'বুঝতে পারলাম, সাধারণ কোনও ইনভেস্টিগেটর বা গবেষককে দিয়ে কাজ চলবে না আমার। আরও দক্ষ, আরও

ঝানু কাউকে দরকার এ-কাজে...যে-লোক মার খেলে সেটার উপযুক্ত জবাব দিতে জানে। খোঁজখবর করতে শুরু করলাম। ততদিনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমার নাতনি। আর আমার লোকেরাও সন্ধান পেয়ে গেছে আপনার।'

উইনিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। শান্ত গলায় বলল, 'আপনার কোনও মেয়ে নেই, নাতনিও নেই। আমি জানি, আপনি বিয়েই করেননি। আমার সঙ্গে মিথ্যা বললেন কেন?'

স্থির হয়ে গেলেন উইনিং, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। রানার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'আমার নাতনি নেই, বিয়ে করিনি—জানলেন কীভাবে?'

'খবরটা বের করা কি খুব কঠিন কিছু?'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উইনিং বললেন, 'নিজের মৃত্যু নিজেই ত্বরান্বিত করলেন, মিস্টার রানা। আপনাকে এমনিতেও মেরে ফেলতাম, কারণ আমারও সন্দেহ ছিল আজ নয়তো কাল সত্যটা জানতে পারবেন আপনি।' কোটের পকেট থেকে ছোট্ট যন্ত্র বের করলেন তিনি, চাপ দিলেন ওটাতে।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল তাঁর স্টাডিরুমের দরজা। হাতে একটা চকচকে কোল্ট রিভলভার নিয়ে ভেতরে ঢুকল অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো।

'এবার বলুন,' রানাকে বললেন উইনিং, 'আমার যে কোনও নাতনি নেই, জানলেন কীভাবে?'

'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, লণ্ডন শাখা,' বলল রানা। 'বিশেষ কয়েকটা তথ্য জোগাড় করতে বলেছিলাম ওদেরকে। কাজটা করেছে ওরা।'

'ক্যাটেলো,' রানার ওপর থেকে চোখ সরাননি উইনিং, 'এই লোককে আর দরকার নেই আমাদের। একে মেরে

ফেলো।'

'আপনার আসলে একটা বাহানার দরকার ছিল, তা-ই না?' বলে উঠল রানা। 'আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে গিয়ে মিনতির ঘটনাটা জানতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, ওই মেয়েকে যদি কোনওভাবে জড়ানো যায় এই কেসের সঙ্গে, আমাকে দিয়ে কাজ করানো যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালেন উইনিং। 'ঠিক।'

'অ্যালকেমির ব্যাপারে যখন পড়াশোনা করছিলেন আপনি,' বলছে রানা, 'অমৃত সুধার ব্যাপারটা জানতে পারেন। আর তখনই একরকমের মোহ জন্মায় আপনার ভেতর। আপনি আসলে আরও অনেক বছর বাঁচতে চান, আর সেজন্যেই মিনতির মিথ্যা গল্প বানিয়ে আমাকে জড়িয়েছেন।'

'আপনাকে খুন করাটা এখন আমার কর্তব্য, মিস্টার রানা। ...ক্যাটেলো!'

'আপনার কাছ থেকে আরেকটু প্রফেশনালিযম আশা করেছিলাম আমি,' বলল রানা।

থমকে গেলেন উইনিং। 'মানে?'

'আপনি ভাবতে পারলেন কী করে, আপনার ধোঁকাবাজি জানার পরও আসল জিনিস তুলে দেবো আপনার হাতে?'

'কী বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি, আপনার হাতের ওই মাটির বোতলটা আসল, কিন্তু ওটার ভেতরের পানি নকল। ওটার ভেতরে যা আছে, তা অমৃতসুধা নয়।'

হতভম্বের মতো বোতলটার দিকে তাকালেন উইনিং। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুখ তুলে বললেন, 'তা হলে কী আছে এর ভেতরে?'

'কলের পানি। আপনার স্টাডিরুমে ঢোকার আগে

বাথরুমে গিয়েছিলাম আমি। সেখান থেকে ভর্তি করেছি বোতলটা।'

'আসল অমরত্ব সুধা তা হলে কোথায়?'

হাসল রানা। 'সযত্নে রাখা আছে আমার কাছে। কোথায়, তা বলব না আপনাকে।'

রাগে লাল হয়ে গেল উইনিং-এর চেহারা। 'ক্যাটেলো, এই লোককে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। কোথাও নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখো। যতক্ষণ ওর পেট থেকে কথা বের না হয়, ততক্ষণ নির্যাতন চালাতে থাকো।'

একচুল নড়ল না ক্যাটেলো।

'কী হলো, ক্যাটেলো?' খেঁকিয়ে উঠলেন উইনিং। 'কথা কানে যায়নি?'

কোল্টের নিশানা রানার ওপর থেকে সরাল ক্যাটেলো, ধীরেসুস্থে নিশানা করল উইনিংকে।

'কী হচ্ছে এসব?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে উইনিং-এর। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

'না, ক্যাটেলোর মাথা খারাপ হয়নি,' বলল রানা। 'ও আসলে একজন এজেন্ট...ঈশ্বরের তরবারির।'

বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে গেছেন উইনিং।

রানা বলে চলল, 'ক্যাটেলো এতদিন ধরে গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করছে আপনার এখানে। আমি আপনার হয়ে কাজ শুরু করার পর থেকেই আমার প্রতিটা মুভমেন্টের খবর জানিয়ে দিয়েছে তার গুরু উসবিলিয়ানো মাতিমাসিকে। আর সে-কারণেই প্রতি পদে এত বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে।'

প্রচণ্ড ভয়ের স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে উইনিং-এর চেহারায়, মৃত্যুকে যমের চেয়েও বেশি ভয় পান তিনি। ঠোঁট কাঁপছে তাঁর, কী বলবেন সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন হয়তো।

‘আমি যে চ্যাভিস লরেমের সঙ্গে দেখা করেছি,’ বলছে রানা, ‘তা জানত না এমনকী জে ফক্সও। অথচ মাতিমাসির দলের কেউ একজন লরেমের নাম করে ফোন করেছিল আমাকে। ...লরেমের সঙ্গে দেখা করে কী কথা হয়েছে, তিনি আমাকে কী দিয়েছেন...ইত্যাদি শুধু আপনাকে জানিয়েছিলাম আমি, মিস্টার উইনিং। কাজেই গুপ্তচরটা কে, তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি আমার।’

পিছাতে শুরু করলেন উইনিং। তোতলাতে শুরু বললেন, ‘ক্যাটেলো, যা চাও তুমি...যত টাকা চাও...দেবো তোমাকে। আমাকে মেরো না।’

‘আমি আর তোমার হয়ে কাজ করি না, পিয়েরে উইনিং,’ যন্ত্রচালিতের মতো বলল ক্যাটেলো। ‘আমাদের গুপ্তসংঘ ধ্বংস করে দিয়েছে এই লোক। তাই সুযোগ পাওয়ামাত্র তোমাকে আর মাসুদ রানাকে একই দিনে একই সময়ে শেষ করে দিতে বলেছেন মাতিমাসি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ফ্র্যাযোকে যদি হারাতে পারে মাসুদ রানা, একদিন না একদিন দেখা করতে আসবেই তোমার সঙ্গে।’ ট্রিগারে টান দিল সে...পর পর দু’বার।

বুকের বাঁ পাশে বড় একটা রক্তাক্ত গর্ত নিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লেন উইনিং।

বুড়োকে যখন গুলি করছে ক্যাটেলো, তখন অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় শোল্ডার হোলস্টারে থাবা চালিয়েছে রানা; বের করে এনেছে নিজের ওয়ালথার। ডাইভ দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে, একবার গড়ান দিয়েই উপুড় হয়েছে।

রানার দিকে রিভলভারের নল তাক করতে যাচ্ছিল ক্যাটেলো, ঠিক তখনই ওয়ালথারের ট্রিগার টানল রানা।

একটা ফুটো তৈরি হলো ক্যাটেলোর দুই ভ্রূর মাঝখানে। ধীরে ধীরে উল্টে পড়ে গেল সে।

গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে একইসঙ্গে ভীত ও

কৌতূহলী হয়ে দোতলায় উঠে এসেছে বাড়ির লোকজন। স্টাডিরুমের দরজায় জড়ো হচ্ছে তারা একে একে। তাদেরকে পুলিশে খবর দিতে বলল রানা।

স্টাডিরুমের একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল রানা। এবার আর পালিয়ে যাবে না ও। এবার ও মুখোমুখি হবে পুলিশের। ওদেরকে বলার জন্যে লম্বা একটা কাহিনী আছে ওর কাছে।

আটাশ

মাস সাতেক পর।

সবে একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করেছে রানা। এবার মাত্র পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। কানাডায় চলে এসেছে ও। প্লেনের দরজা দিয়ে বের হয়েই দেখল, তুষারবৃষ্টি হচ্ছে।

মাল-সামান তেমন একটা নেই ওর সঙ্গে, তাই কাস্টমসে সময় নষ্ট করতে হলো না। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিল।

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

ইউনিভার্সিটির নাম বলল রানা।

'এখন তো ক্রিসমাসের সময়, স্যর,' বলছে ড্রাইভার। 'কাজ সেরে সবাই চলে যাচ্ছে ছুটিতে যে-যার বাড়ি। ইউনিভার্সিটিতেও বোধহয় আজই শেষ ক্লাস হচ্ছে ভ্যাকেশনের আগে।'

কিছু বলল না রানা, ট্যাক্সির জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। ঝর ঝর ঝরছে তুষার। ঠাণ্ডা!

ইউনিভার্সিটির ওয়েস্টিং সাইন্স অডিটোরিয়ামে যখন পৌঁছাল রানা, ততক্ষণে প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে ঘরটা। একেবারে পেছনের দিকে নিজের জন্য একটা আসন খুঁজে নিতে একটু কষ্টই হলো রানার। প্রাণীকোষের শ্বসনক্রিয়ার ওপর দুর্বল ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাব নিয়ে আজ এখানে লেকচার দেয়ার কথা অধ্যাপক ডক্টর মার্টিন বেল ও সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর সেলেনা বার্নহার্টের।

অডিটোরিয়ামে চাপা গুঞ্জন চলছে। ইউনিভার্সিটির বায়োলজি বিভাগের সব ছাত্রছাত্রী জড়ো হয়েছে এখানে, অনুমান করল রানা। কেউ কেউ খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে—নোট নেবে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা স্টেজ। সেটার ওপর আছে একটা মাইক্রোফোন স্ট্যাণ্ড, একটা স্লাইড প্রজেক্টর আর পেছনে বড়সড় একটা স্ক্রিন।

এখনও এসে পৌঁছায়নি বক্তারা।

যে-বিষয়ের ওপর লেকচার দেয়া হবে, তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রানার। ও শুধু একটাবার...শেষবার চোখের-দেখাটা দেখতে চায় মেয়েটাকে। দেখবে, কেমন আছে ও।

একসময় হাজির হলো সেলেনা ও সৌম্য-দর্শন, পক্বকেশ ডিপার্টমেন্টাল হেড ড. মার্টিন বেল।। বসল ওরা ওদের জন্য সংরক্ষিত আসনে। মাইক্রোফোন স্ট্যাণ্ডের সামনে হাজির হলো একজন তরুণী ভলান্টিয়ার, বক্তাদের পরিচয় দিল শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে। তারপরই নিজের লেকচার শুরু করল সেলেনা।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। দেখছে, লাল চুল পনিটেইল করেছে সেলেনা। খুব সুন্দর লাগছে। ওর কথা শুনে আর বাচনভঙ্গি লক্ষ করে ওকে সিরিয়াস একজন

বিজ্ঞানী ছাড়া আরকিছু মনে হচ্ছে না রানার।

ওর আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা চুপ হয়ে গেছে। মনোযোগ দিয়ে শুনছে সেলেনার লেকচার। কেউ কেউ নোট নিচ্ছে তুমুল বেগে।

বুকের ভেতরে অদ্ভুত এক ছটফটানি টের পাচ্ছে রানা। সিট ছেড়ে উঠে সেলেনার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে ওর। মেয়েটাকে একটাবারের জন্য জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে: কেমন আছ, সেলেনা?

কিন্তু সে-সবের কিছুই করল না রানা। বরং আরেকটু সেঁধিয়ে গেল সিটে, যাতে ওকে খেয়াল করতে না পারে সেলেনা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে।

মেয়েটা যে বেঁচে আছে, সুস্থ আছে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে—সেটাই নিজচোখে দেখতে চাইছিল রানা আসলে। সেলেনার সেই ঠিকানা লেখা অ্যাড্রেসবুকটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, ওটা একটা এনভেলপে ভরে জমা দিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল রিসেপশন ডেস্কে, কিন্তু মেয়েটাকে দেখে সিদ্ধান্ত বদল করল ও। বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই মেনে নিয়েছে মেয়েটা এতদিনে, ওর সেই ক্ষতস্থানে নতুন করে লবণ ছিটানোর কোনও মানে হয় না। নোটবুক পেলেই মেয়েটা বুঝে যাবে, কে এসেছিল ওটা দিতে; তখন হয়তো পাগলের মত খুঁজতে শুরু করবে রানাকে। তা-ই কি ও চায়?

হয়তো নিকট ভবিষ্যতে উপযুক্ত কোনও বিজ্ঞানমনস্ক লোককে ভালবাসবে মেয়েটা, স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে। ওদের হয়তো ছোট্ট কিন্তু গোছানো একটা সংসার হবে...যা কোনও মেয়েকে উপহার দিতে পারবে না রানা কোনওদিন।

তবে কোনও মেয়ের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে নতুন জীবন গড়ার সুযোগ নিশ্চয়ই দিতে পারে ও। দেখা তো হলো, এইবার কেটে পড়তে হয়।

'...এ-পর্যন্ত ক্লিয়ার? এবার আমরা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক

ওয়েভফর্মের বায়োলজিকাল এফেক্ট দেখব স্ক্রিনে।’ বলে লেকচার পডিয়াম থেকে একটা লেযার পয়েন্টার তুলে নিয়ে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরল সেলেনা।

চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে দু’সারির মাঝের আইল-এর দিকে চলল রানা। ঠিক এমনি সময়ে পিছনের সিটে বসা এক সিরিয়াস ছাত্রী হাত তুলে ডেকে উঠল, ‘ডক্টর বার্নহার্ট?’

‘হ্যাঁ, বলুন,’ অডিয়েন্সের দিকে ঘুরল সেলেনা, খুঁজছে হাত-তোলা ছাত্রীটাকে। ওর দৃষ্টি স্থির হলো কোঁকড়া চুলের মেয়েটার ওপর, ‘বলো, মেরি, কী জানতে চাও?’

‘রাইযিং এনডরফিন লেভেল আর শিফটিং টি-লিম্ফোসাইট সেল সাইকেলের মধ্যে সম্পর্কটা একটু বুঝিয়ে বলবেন, ম্যাডাম?’

রানা পৌঁছে গেছে দরজার কাছে, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল অডিটোরিয়ামের বাইরে। বেরিয়েই ডাইনে বাঁক নিয়ে চলল কাচের দরজার দিকে।

‘ডক্টর বার্নহার্ট...’ প্রশ্নটা আবার করল কোঁকড়া মেয়েটা।

কিন্তু একটি কথাও শুনতে পেল না সেলেনা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে সে অডিটোরিয়ামের দরজার দিকে। এইমাত্র ওখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে কেউ একজন!

‘আমি...আমি দুঃখিত,’ বিড়বিড় করে বলল ও, তারপর দুই হাতে চেপে ধরল মাইক্রোফোনটা। জোরালো খড়মড় আওয়াজে চমকে চাইল শ্রোতৃবৃন্দ। ‘ডক্টর বেল, আপনি দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলবেন?’

অবাক হয়ে উঠে এলেন প্রৌঢ় প্রফেসর। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। স্টেজ থেকে লাফিয়ে আইলে নেমেছে ড. সেলেনা বার্নহার্ট, নেমেই ছুট দিয়েছে দরজার দিকে। ছাত্র-ছাত্রীরা ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছে সেলেনাকে। হাঁ হয়ে গেছেন ডক্টর মার্টিন বেল, তিনিও চেয়ে দেখছেন প্রিয়

ছাত্রীর ঊর্ধ্বশ্বাস-দৌড়।

দরজা দিয়ে বেরিয়েই ভয়ানক ঠাণ্ডার জোর ধাক্কা খেল রানা। কোটের কলার তুলে দিয়ে ঘাড় ঢাকল। তুষারবর্ষণ আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে। ওর অপেক্ষায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিটার দিকে হাঁটছে। মিনিট দশেক লাগবে এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে, তারপর পরের ফ্লাইটের জন্যে অপেক্ষা। কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে বুকটা। হাঁটার গতি বাড়ছে ওর। ওই অডিটোরিয়াম থেকে যত দূরে সম্ভব চলে যেতে হবে ওকে। জানে, আর কোনওদিন দেখা হবে না ওই মিষ্টি মেয়েটার সঙ্গে—যে ছুটন্ত ট্রেনের ধাক্কায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল ওকে—নিজের জীবন বিপন্ন হলেও পরোয়া করেনি।

কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সেলেনা তুষারের মধ্যে। দূরে দেখতে পেল চলে যাচ্ছে রানা। আর কয়েক কদম গেলেই পৌঁছে যাবে ট্যাক্সির কাছে। ড্রাইভার ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে পেছনের দরজাটা খুলতে যাচ্ছে। টের পেল সেলেনা, একবার গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলে আর কোনওদিন দেখা হবে না মানুষটার সঙ্গে।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকল সেলেনা রানার নাম ধরে। ঠিক সেই সময়ে মাথার ওপর দিয়ে এয়ার কানাডার একটা বোইং উড়ে গেল বলে কিছু শুনতে পেল না রানা। দৌড়াতে শুরু করল মেয়েটা। পা পিছলে যাচ্ছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। হতাশায় দিশেহারা বোধ করছে ও। টের পাচ্ছে, তীব্র শীতে মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ওর চোখের পানি। আবার ডাকল ও রানার নাম ধরে।

'যেয়ো না, রানা! চলে যেয়ো না!' দেখল দূরের চলন্ত মূর্তিটা হঠাৎ থমকে থেমে দাঁড়াল। পিছন ফিরল।

এবার পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রানা। দেখতে পেয়েছে ওকে।

সেলেনার দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। ক্রমে গতি বাড়ছে। ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। ওকে শূন্যে তুলে একপাক ঘুরে নামিয়ে দিল রানা। শীতে কাঁপছে সেলেনা। নিজের কোট খুলে জড়িয়ে দিল রানা ওর গায়ে।

'এলেই যখন,' বলল সেলেনা, 'দেখা না করে পালাচ্ছিলে যে? ভেবেছিলে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরব তোমাকে? কখ্খনও না! আমি তো মেনেই নিয়েছি তোমার শর্ত।'

'তা হলে আমরা বন্ধু চিরকাল?'

'এ-জীবনেও, পরের জীবনেও!'

***

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

রেজোয়ান জনি
rezoanzony2@gmail.com

প্রিয় স্যর,

জানি না এই বারতাটুকু আপনি পড়বেন কি না, তবুও মন থেকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পাঠালাম আপনার জন্যে। সেই ১২/১৩ বছর বয়স থেকে পড়ি আপনার লেখা আর প্রকাশ করা বইগুলো। বয়স এখন ২৯। মাসুদ রানা, তিন গোয়েন্দা, ওয়েস্টার্ন, কিশোর উপন্যাস আর অনুবাদ–কোনওটাই বাদ যায়নি। তবে সময়ের সাথে ভালবাসা এসে শুধু যেন মাসুদ রানাতেই আটকে গেল। সেই 'ধ্বংস-পাহাড়' থেকে শুরু করে 'শার্প শুটার' পর্যন্ত প্রায় সব (৯৫%) বই-ই পড়েছি, সেটা নতুন, পুরনো আর রিপ্রিন্টই হোক।

এরপর কেন যেন আর পড়া হয়ে ওঠেনি। হয়তো জীবনের চাপে, জানি না কেন!!

কিন্তু গত দু'দিন আগে বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে 'নরপশু' শেষ করলাম।

এককথায় মন ভরে গেল। অসাধারণ, স্যর!

অনেক দিন পর কেন যেন আবার কিশোর হতে মন চাইছে, দিনের পর দিন সেবার বই নিয়ে পড়ে থাকতে মন চাইছে।

জানি, হবে না, তবু ভাবতে দোষ কী?

বইটি চমৎকার লেগেছে, ধন্যবাদ আপনাদের দু'জনকেই।

ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রইল।

ভাল থাকুন, বেঁচে থাকুক মাসুদ রানা আজীবন।

❋ সেই ছোট্ট পাঠকটির জন্য রইল আমার অশেষ ভালবাসা। সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি হোক, এই দোয়া করি।

অবস্কিয়োর আরিফা

obscuremeem@gmail.com

শ্রদ্ধেয় স্যর,

কেমন আছেন? সবাই আপনাকে কাজীদা বলেই ডাকে, তবে আমি স্যর ডাকলাম। কেন ডাকলাম পরে বলছি। সেই ২০০৭ 'থেকে অনেকবার ভেবেও লেখা হয়নি, সাহসেই কুলাতে পারছিলাম না। জায়গামত যাবে কি না তা নিয়েও সংশয়ে ছিলাম। তবে ফোন দিয়েছি অনেকবার, যদিও ঠিকভাবে কথা বলতে পারিনি!

স্যর, আপনি যে বাংলাদেশী কিশোরদের জীবনটা কত রঙিন বানিয়েছেন সেটা কি জানেন?

হয়তো জানেন, কিন্তু তা কতখানি, সেটা কি জানেন?

সেবা প্রকাশনীর বই...আলাদা করে বলতে গেলে 'তিন গোয়েন্দা' আর 'মাসুদ রানা' সিরিজ জীবনটা যেমন রঙিন করেছে, তেমনি অনেক অনেক কিছু শিক্ষাও দিয়েছে। স্যর, জীবনের এই পর্যায়ে এসে দেশপ্রেম, বন্ধুত্ব, কর্তব্যবোধের মত মানবীয় গুণাবলি যেটুকু ধারণ করি, তার বেশিরভাগটাই সেবার জন্য পেয়েছি!

স্যর বলার কারণটা আশা করি বুঝতে পারছেন?

মাঝের কিছুদিন সত্যিই একটু খারাপ লাগছিল সেবার বইয়ের মান কমে যাচ্ছে এটা ভেবে, তবে এখন আর তা মনে হচ্ছে না, বিশ্বাস করুন। আল্লাহর কাছে তিনটা দোয়া চাওয়ার আছে। এক—সেবা প্রকাশনী এভাবেই থাকুক যুগের পর যুগ। দুই—আল্লাহ আপনাকে আরও অনেক বছর সুস্থভাবে বাঁচার তাওফিক দিন। আর তিন—জীবনে একবার আপনার সাথে দেখা করে ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগটা যেন পাই।

আচ্ছা, আপনার সাথে দেখা করতে চাইলে কী করতে হবে?

দয়া করে একটু জানাবেন।

ভাল থাকুন, কাজীস্যর, কাজীদা! ভাল থাকুন, চিরকিশোর কাজী আনোয়ার হোসেন! ভাল থাকুক ভালবাসার সেবা প্রকাশনী!

❋ এই যে আপনার চিঠির প্রতিটি ছত্রে আন্তরিক ভালবাসার প্রকাশ, দেখা করে এর বেশি আমাকে আর কী দেবেন বলুন তো? আমার যতটুকু পাওনা, তার চেয়ে সুদে-আসলে অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছেন আপনারা সবাই মিলে। আরও বেশি হলে তো রীতিমত বিব্রত বোধ করব। আপনাদের ভালবাসাই আমাকে টিকিয়ে রেখেছে এত বছর, এখন পা দিয়েছি তিরাশিতে। আপনাদের কাছে যা পেয়েছি, তাতেই আশা করি আর দু'একটা বছর পার হয়ে যাবে। তারপর পাঠক-পাঠিকা সবার কাছে অনেক ঋণ রেখে কৃতজ্ঞচিত্তে চলে যাব হাসতে হাসতে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৩/৯/১৮ কোয়ান্টাম হাজারো প্রশ্নের জবাব-৩ (আত্ম-উন্নয়ন) মহাজাতক

বিষয়: আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম। সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি। কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাখো মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন আপনার জীবন।

আরও আসছে

২৯/৯/১৮ রহস্যপত্রিকা (৩৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা) অক্টোবর, ২০১৮

১/১০/১৮ রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্য চর্চা
(আত্ম-উন্নয়ন) নাহার আল বোখারী

৮/১০/১৮ ডক্টর থার্ন (অনুবাদ)
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/তৌফির হাসান উর রাকিব